খেলারাম খেলে যা

সৈয়দ শামসুল হক

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

১. বাসাটা খুঁজে পেল বাবর 3
২. লতিফা........61
৩. উল্কার মত গাড়ি চালিয়ে........70
৪. মিসেস নাফিস........95
৫. উদ্দেশ্যবিহীন কিছুক্ষণ 112
৬. বাবলি........128
৭. একজন আসবে বলেও 142
৮. সারা দুপুর সুরাপান........205
৯. পতেঙ্গা এয়ারপোর্ট 250
১০. রাতের আকাশ........263
১১. জাহেদা 295
১২. আরিচার পর বাঘাবাড়ি 338
১৩. ডাক বাংলোয়........368

১৪. বাতি নিভিয়ে 388
১৫. হেডা, ও হেডা 402
১৬. আকাশটা লাল 435
১৭. শীত করছে 460
১৮. খেলারাম, খেলে যা 473
১৯. দুপাশে আখের খেত 478
২০. হাসু, হাসনু, হাসুরে 496
২১. ভালবাসতে চাই 507
২২. শুধু ভালবাসব 529
২৩. সারাপথ 533

১. বাসাটা খুঁজে পেল বাবর

দু একজনের কাছে জিগ্যেস করতেই বাসাটা খুঁজে পেল বাবর। কাজী সাহেব তাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

আরে আপনি! কখন এলেন? কীভাবে এলেন? আসুন, আসুন।

চলে এলাম। ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ এমন কী দূর! গাড়ি চালিয়ে চলে এলাম।

পরীক্ষণেই বাবরের মনে হলো আসবার কারণ কিছু না বললে উপস্থিতিটা শোভন হচ্ছে না। তাই সে যোগ করল, এখানে একটা কাজ ছিল।

দুহাত নেড়ে কাজী সাহেব বলে উঠলেন, কাজ পরে হবে, আগে বিশ্রাম করুন। কতদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা, আগে ভাল করে গল্প-টল্প করি।

আজ সেরেই এসেছি। এখন আর কাজ নেই। ভাবছি আজই ঢাকায় ফিরে যাব।

যেতে দিলে তো! কাল যাবেন।

কাল?

হ্যাঁ কাল। অসুবিধো কী!

না, অসুবিধে কিছু নেই।

আলাদা বিছানার ব্যবস্থা আছেই। শুধু পেতে দিলেই হলো। একটু বসুন, ভেতরে খবর দিয়ে আসি। সিগারেট খান। আপনার তো এ ব্র্যাণ্ড চলে না বোধহয়। আচ্ছা, আমি এক্ষুণি আনিয়ে দিচ্ছি।

সে-কী! না, না।

আপনি বসুন তো। চা না কফি? দুটোই আছে।

চা।

কাজী সাহেব ভেতরে চলে গেলেন। বাবর পা জোড়া সামনে ঠেলে আরাম করে বসল। কয়েক ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে পা যেন জমে গিয়েছে। মাথায় কয়েকটা চুলের গোঁড়া ব্যথা করছে, পেকেছে বোধহয়। বয়স তো কম হলো না। গত মার্চে আটত্রিশ পেরিয়ে উনচল্লিশে। চুল উঠতেও শুরু করেছে কিছু কিছু। পরাজিত সৈন্যদলের মত কপাল থেকে ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছে তারা। গত সপ্তাহে মেকাপম্যান কামাল তার মুখে রং লাগাতে লাগাতে বলছিল, একটু যত্ব নিন স্যার। চুলের গোঁড়ায় কালো পেন্সিল বুলিয়ে আর কতকাল চালাবেন? গত সপ্তাহে তার টেলিভিশন প্রোগ্রামটা বেশ ভাল হয়েছিল।

সবাই খুব প্রশংসা করেছে। কাগজেও লিখেছে। প্রোগ্রামটা কি লতিফা দেখেছে? এ বাসায় ঢোকার আগে দেখা উচিত ছিল বাড়ির মাথায় এন্টেনা আছে কি-না। ময়মনসিংহে তো টেলিভিশনের ছবি ভালই আসে সে শুনেছে। কী বোকা সে! এতক্ষণ তার চোখেই পড়েনি টেলিভিশন সেটটা। বসবার ঘরে এক কোণায় স্যাতস্যাতে আঁধারিতে কার্পেটের ওপর সামনের দুপা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটটা। তাহলে প্রোগ্রামটা লতিফা নিশ্চয় দেখেছে।

লতিফা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। পরনে কালো পাজামা, শাদার ওপরে কালো সবুজ বর্ডার আঁকা কামিজ। লতিফার সতের সুন্দর একজোড়া স্তন নিঃশব্দে ওঠানামা করছে, প্রায় বোঝা যায় কী যায় না।

নিঃশব্দে হাসল বাবর। কিন্তু লতিফা হাসল না। বাবর তখন একটু অপ্রতিভ হলো।

একদৃষ্টে বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে লতিফা।

কাজী সাহেব এসে মেয়েকে বললেন, যা চা-টা নিয়ে আয়।

লতিফা চলে গেল।

একটা চেয়ার টেনে জুৎ করে তার সামনে বসলেন কাজী সাহেব। বললেন, আজ তো যাওয়া হবে না। কালও যেতে দিই কি-না সন্দেহ।

কাল না গেলে অসুবিধে হবে খুব।

কী এমন অসুবিধে? আমাদের মত তো চাকরি করতে নেই আপনার।

তা নেই। সত্যি।

বেশ আছেন। আপনার প্রোগ্রাম মাঝে মাঝে টেলিভিশনে দেখি! খুব ভাল লাগে। চমৎকার হয়।

ধন্যবাদ।

শুধু টেলিভিশন নিয়েই আছেন, না অন্য কিছু?

ব্যবসা আছে।

কীসের?

ইনডেনটিং। ভাবছি, আমিও চাকরি থেকে রিটায়ার করে একটা ব্যবসা-ট্যাবসা করব। বড় ছেলেটা আর্মিতে এখনও সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট। তারপরে লতিফা। ওর বিয়েটা দিলেই থাকে আরেক ছেলে।

আপনার আর চিন্তা কী তবে? বেশ গুছিয়ে এনেছেন।

কই আর? আপনার ছেলেমেয়ে কটি?

বাবর অবাক হলো কাজী সাহেব জানেন না যে সে বিয়েই করেনি। লতিফার একবার কলেজের ছাত্রীদের প্রোগ্রাম করতে টেলিভিশনে এসেছিল, সেখানে আলাপ। তখন ঢাকায় ছিলেন কাজী সাহেব। তারপর বদলি হয়ে এলেন ময়মনসিংহে। ঢাকার বাড়িতে বেশ কয়েক দিন গিয়েছিল বাবর। দু একবার রাতে খেয়েছেও। না, সেই আলাপে বাবরের নিজের কথা কিছু ওঠেনি। বাবরকে প্রায় চল্লিশ ছুঁই ছুঁই দেখে কাজী সাহেব ধরেই নিয়েছেন তার সংসার আছে।

বাবর মিথ্যে করে বলল, ছেলেমেয়ে দুটি।

তবে যে লতিফার কাছে শুনেছিলাম তিনটি।

বাবর ভাবল, দুষ্ট মেয়ে, কীভাবে মিথ্যে কথা বলেছে দেখ। মুখে সে বলল, ভুল করেছে, এক ছেলে এক মেয়ে।

লতিফা আপনাকে কিন্তু খুব শ্রদ্ধা করে। বলে বাবর চাচার মত মানুষ হয় না।

বাড়িয়ে বলে।

কী যে বলেন। আপনারা হলেন আমাদের গৌরবের বস্তু। আর মেয়েকে আমি আজীবন সেই শিক্ষাই দিয়েছি, মানীজনকে সম্মান দেওয়া। সতের বছর বয়েস হলে কী হবে লতিফার, বুদ্ধিতে, বিবেচনায়, নিজের মেয়ে বলে বলছি না, যে কারো সাথে পাল্লা দিতে পারে। আমি জানি। এবার তো আই.এ দিল।

হ্যাঁ, দিয়েছে। ভাবছিলাম বি.এ পর্যন্ত পড়াব।

তা কী হলো?

একটা বিয়ের সম্বন্ধ এসে গেল।

বিয়ে দিচ্ছেন লতিফার?

অবাক হয়ে গেল বাবর। এজন্যেই কি তাকে কোনো খবর না দিয়ে ঢাকা থেকে চলে এসেছে লতিফা? ওভাবে তার হঠাৎ অন্তর্ধানের কোনো কারণ খুঁজে না পেয়েই বাবরের এতদূর আসা। আসার ঝুঁকিটাও কম ছিল না। যদি কাজী সাহেব সহৃদয় ব্যবহার না করেন? যদি তিনি কিছু সন্দেহ করে বসেন? কিম্বা লতিফাই যদি কঠিন হয়?

লতিফা চা নিয়ে এলো। চায়ের সঙ্গে নানা রংয়ের পাঁপড় ভাজা।

ভাল আছেন বাবর চাচা?

তার অপূর্ব সেই উজ্জ্বল মুখখানা সৃষ্টি করে লতিফা বলল। বলে মাথা কাৎ করে চা বানাতে লেগে গেল। কোনো কিছুতে মনোযোগ দিলেই লতিফার মাথাটা কাৎ হয়ে আসে। ভঙ্গিটা বাবরের ভারি চেনা।

হ্যাঁ, ভাল আছি। তুমি? তুমি কেমন?

ভাল। চায়ে কতটা চিনি?

এই ছলনাটুকু ভাল লাগল বাবরের। লতিফা জানে বাবর চায়ে কতটা চিনি খায়।

এক চামচ। ব্যাস। ওতেই হবে।

বাবা, তোমাকে কতটা চিনি?

বাড়িতে তো থাকিস না জানিসও না। চায়ে আমি চিনি খাই না।

ও, মনে ছিল না।

কাজী সাহেব প্রীত মুখে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, জানেন বাবর সাহেব, আমার এই মেয়েটাকে আমি কত ভালবাসি।

যেন তোমার আরো দুপাঁচটা মেয়ে আছে। ঠোঁট গোল করে লতিফা বলল। বাবর জিগ্যেস করল, তুমি চা খাচ্ছ না?

না, এইমাত্র খেয়ে উঠেছি।

বিকেল চারটায় ভাত খেয়েছ?

আর বলবেন না, মেয়টা যদি কোনো কথা শোনে। শুধু অনিয়ম করবে। এইতো সারা দুপুর বাথরুমে বসে বসে পানি ঢেলেছে।

বলেছে তোমাকে!

তা নয়তো কী?

আচ্ছা। আপনিই বলুন বাবর চাচা, চুল ঘষতে, শ্যাম্পু করতে সময় লাগে না? বাবা কিছু বুঝে না।

কিন্তু ঠাণ্ডা লাগতে পারে। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হতে পারে।

জ্বর আমার হয় না।

সে-কী!

জিজ্ঞেস করে দেখুন না বাবাকে, কবে আমার জ্বর হয়েছে।

কেন, ৬৬ সালে দেশে গিয়ে এক ঝুড়ি কাঁচা আমি খেয়ে যে জ্বর বাধালি। সেটা বুঝি জ্বর না!

মফঃস্বলে আমন রোদে গায়ে করে তা অভ্যোস নেই। তাই গা গরম হয়েছিল একটু।

হা হা করে হেসে উঠলেন কাজী সাহেব। বললেন, লতিফার সঙ্গে কারো পারবার উপায় নেই।

সত্যি কথা বলি বলেই পার না।

লতিফার গলায় একটু ঝাঁঝ, একটু তিক্ততা টের পেল বাবর। কেন? কেন এই উষ্মা? কার ওপর? একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে, হঠাৎ কাপ পিরীচের শব্দে জেগে উঠল। লতিফা ট্রে গুছিয়ে ভেতরে যাবার উদ্যোগ করছে।

বাবর বলল, বাপ মায়ের কাছে এসে তোমার স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে।

ছাই হয়েছে।

তুই কী বুঝিস? অ্যাঁ তুই বুঝিস কী। কাজী সাহেব হাসতে হাসতে তিরস্কার করে উঠলেন মেয়েকে। বুঝলেন বাবর সাহেব, হোস্টেলে থেকে থেকে খাওয়া দাওয়াই ভুলে গেছে। মেয়েটা। এক টুকরোর বেশি দুটুকরো মাংস দিলে তেড়ে ওঠে এখন।

হ্যাঁ খাইয়ে খাইয়ে আমাকে একটা হাতি বানাও।

শুনছেন, কথা শুনছেন ওর। রাতদিন এই বলবে। আর না খেয়ে থাকবে। আচ্ছা বলুন তো কী এমন মোটা ও?

মোটেই না।

আপনাদের ও দুটো চোখ, না বোতাম? বলে লতিফা হাসতে হাসতে ট্রে নিয়ে চলে গেল। তার পেছনটা দুলে উঠল। নরোম একটা ছোট্ট শাদা জন্তুর মত। ময়মনসিংহে এসে স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে লতিফার। গাল দুটো লাল হয়েছে। শরীরে একটা তরঙ্গ এসেছে।

আপনার মেয়েটি চমৎকার। অসাধারণ বুদ্ধিমতি। মাথা অত্যন্ত পরিষ্কার। ওর সায়েন্স পড়া উচিত ছিল। ডাক্তার হতে পারত। কিন্তু অংকে বড্ড কাঁচা বলেই তো দিইনি।

অংকে কাঁচা নাকি?

ম্যাট্রিকে মাত্র চল্লিশ পেয়েছিল। তাছাড়া কী জানেন, আমিও আগেই বুঝেছি লেখাপড়া বিশেষ ওর হবে না।

এটা আমি স্বীকার করলাম না।

কাজী সাহেব বলে চললেন, আমি ওকে শুধু ভাল হাউস-ওয়াইফ হতে যা দরকার তাই করে দিচ্ছি। যেন কোনো অবস্থাতেই অপ্রতিভ না হয়।

অবশ্যি এটা একটা দৃষ্টিভঙ্গি; কিন্তু আমি সমর্থন করি না।

মৃদু হাসছিলেন কাজী সাহেব তখন থেকে। এবার হাসিটা আরো স্পষ্ট দেখাালে! বোধহয় কিছু বলতে চান। বাবর উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইল। তাঁর দিকে।

কই, সিগারেট খান।

কাজী সাহেব তার ব্র্যাণ্ড বাড়িয়ে দিলেন।

আপনার ব্র্যাণ্ড আনতে দিয়েছি।

কেন আবার কষ্ট করতে গেলেন?

না, না, কষ্ট কীসের। আপনি এসেছেন, কত যে খুশি হয়েছি। মনে মনে আপনার কথাই ভাবছিলাম কদিন থেকে। আপনি খুব ভাল সময়ে এসেছেন। খুব ভাল হয়েছে।

কী ভাল হয়েছে জানতে পারার আগেই কাজী-গৃহিণী এলেন। চট করে একটা ধোয়া শাড়ি পরে মাথার চুল গুছিয়ে গাছিয়ে এসেছেন।

উঠে দাঁড়াল বাবর।

আদাব ভাবী। ভাল আছেন।

জি ভাল। বসুন। ছেলেমেয়ে সব ভাল?

ভাল।

কাজী-গৃহিণী হাসলেন।

মিথ্যেটার জন্যে বাবর একটু অস্বস্তি বোধ করল। বিয়ে সে করেনি, এই কথাটা এদের আর জানাবার উপায় নেই।

আপনাকে টেলিভিশনে মাঝে মাঝে দেখি।

বিজ্ঞানের এই এক অবদান! নিজে না আসতে পারলেও কেমন দেখা হয়ে যাচ্ছে।

স্বামী স্ত্রী উভয়েই অনাবিল উপভোগ করলেন রসিকতটুকু।

আজ থেকে যেতে হবে কিন্তু।

কাজী ভাইকে তো বলেছি থাকব।

কাজী সাহেব ভাই সম্বোধনে খুব প্রীত হলেন, উৎসাহ পেলেন, কৃতার্থ বোধ করলেন। বললেন, কয়েক দিন থাকলে সত্যি খুব খুশি হতাম।

আরেকবার এসে না হয় থাকব।

তখন তো বাড়ি খালি হয়ে যাবে। বিষণ্ণ স্বরে কথা কটি উচ্চারণ করলেন কাজী সাহেব।

বাবর ঠিক বুঝতে পারল না অর্থটা। জিজ্ঞেস করল, মানে?

লতিফার বিয়ে দিচ্ছি যে।

কানে শুনেও যেন কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারল না। বাবর।

বিয়ে দিচ্ছেন?

হ্যাঁ। একটা ভাল ছেলে পেয়ে গেলাম।

শুকনো গলায় বাবর জিজ্ঞেস করল, কবে?

দিন তারিখ ঠিক হয়নি। তবে খুব শিগগির। পাকা দেখা হয়ে গেছে।

ছেলে কী করে?

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়তে বিলেতে যাচ্ছে এ বছরে। লতিফাকে নিয়ে যাবে।

বিলেত যাবার এতদিনের স্বপ্নটা তাহলে সত্যি হবে লতিফার— ভাবল বাবর। চুপ করে রইল সে।

কাজী গৃহিণী বললেন, পাত্র আমারই খালাতো বোনের ছেলে। লতিফাকে দেখে ওর খুব পছন্দ। আমি পড়ানোর পক্ষে। ছেলে বলল, বিয়ের পরেও তো পড়তে পারে। বিলেতে পড়াশুনা আরও ভাল হবে।

তা হবে।

মনটা যেন কোথায় এক চিলতে খারাপ লাগছে। কিন্তু কেন, বাবর তা বুঝতে পারল না। বাহ লতিফার কোনোদিন বিয়ে হবে না নাকি? সে নিজেই তো কতদিন লতিফাকে বিয়ের কথা বলেছে। বলেছে, বিয়ে হলে তার বাড়িতে যাবে। কী খেতে দেবে লতিফা? থাকবার জন্যে জোর করবে না? স্বামীর সঙ্গে কী বলে আলাপ করিয়ে দেবে তাকে?– আরো কত কী! আর, লতিফার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে এদিকে, অথচ কিছুই সে জানে না। এ জন্যেই কি হঠাৎ ঢাকা থেকে সে চলে এসেছে কোনো খবর না রেখে? কই লতিফার সঙ্গে তার যখন শেষ দেখা হয়েছে তখন তো কিছুই বোঝা যায় নি। অথচ কতদিন বাবরকে বলেছে, কোনো কিছুই তার কাছে সে গোপন করে না।

কাজী-গৃহিণী বললেন, সন্ধ্যে হয়ে এলো। আমি রান্না ঘরে যাই।

ভাল করে রান্না করো কিন্তু।

সে তোমাকে বলতে হবে না। ওঁর মত লোক আসা ভাগ্যের কথা।

কী যে বলেন। সলজ্জ শোভন হবার চেষ্টা করল বাবর। কী এমন মানুষ আমি।

বাপরে বাপ! টেলিভিশনে এত সুন্দর প্রোগ্রাম করেন। আপনার ধাঁধার আসরগুলো এত মজার হয়। লোকজনকে যখন বলি উনি আমাদের চেনা, তারা বিশ্বাসই করে না।

মনে করে আমরা গল্প করছি। গৃহিণীর সঙ্গে যোগ করলেন কাজী সাহেব।

ভাল কথা, উনি তো শিল্পী মানুষ–কাজী-গৃহিণী স্বামীকে বললেন, লতিফার গয়নার ডিজাইনগুলো ওঁকে দেখাও না। বাবরকে বললেন, আপনি দু একটা পছন্দ করে দিন, কেমন? আমি ডিজাইনের বইটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কবিতা লেখে না, গল্প লেখে না, অভিনয় করে না, ছবি আঁকে না, গান গায় না– টেলিভিশনে শুধু ধাঁধার আসর পরিচালনা করে বাবর। আর এরা কি-না তাকে শিল্পী বলছে। মনে মনে হাসল বাবর। নিজের সম্বন্ধে অহেতুক উচ্চ ধারণা কোনো সময়েই তার ছিল না। তবু কেমন যেন খুশিও হলো শিল্পী বিশেষণটা শুনে।

হ্যাঁ, পাঠিয়ে দাও। না, আমি নিজেই নিয়ে আসছি।

বাবর আরো খানিকক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখল। লতিফার চেহারাটা ঠিক মনে করতে পারছে না সে। মনে করতে পারলে কল্পনায় মিলিয়ে নেয়া যেত কোনটা তাকে মানাবে। ছোট ছোট আয়তক্ষেত্র একটা করে আংটা দিয়ে ঝুলানো–এমনি একটা নকসা চোখে ধরল। বাবরের। তাকিয়ে দেখল কাজী সাহেব উন্মুখ হয়ে আছেন চশমার ভেতর দিয়ে।

বাবর বলল, এটা কেমন?

এইটা?

হ্যাঁ। কিম্বা। আরো দেখতে পারি। দাঁড়ান দেখছি।

আরো কয়েকটা পাতা ওল্টাল বাবর। আবার প্রথম থেকে দেখল। কিন্তু কোনো নকসা চোখে ধরল না। তার। তখন সে প্রথমে যেটা পছন্দ করেছিল সেটাই আবার বের করল।

আমার মনে হয় এটাই ওকে মানাবে। চমৎকার। খুব আধুনিক। অথচ জমকালো নয়।

বলেই বই থেকে চোখ তুলে দেখে কাজী সাহেবের পেছনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে লতিফা। ঠাণ্ডা স্থির চোখে তাকে দেখছে। বেড়ালের মত সরু তার চোখের তারা।

এক মুহুর্ত কোনো কথা বলতে পারল না। বাবর। টেলিভিশনে অমন তুখোর অমন সপ্রতিভ কথা বলিয়ে যার খ্যাতি সেই বাবর একেবারে বোবা হয়ে গেল। তার চোখে শুধু অর্থহীনভাবে খেলা করতে লাগল লতিফার ভিজে ভিজে চুল যা ঘাড়ের উপর মৃদু হাওয়ায় উড়ছে। একটু লালচে। গোঁড়ার দিকে একটু কুঞ্চিত। ঢাকাতে এ রকম খোলা চুল কখনো দেখেনি সে লতিফার। নিত্য নতুন বাঁধনে আবদ্ধ তার চুল বাবরকে প্রীত করেছে। আজকের এই খোলামেলা ছেড়ে দেওয়া চুলের রাশ লতিফাকে যেন কন্যারূপে তুলে ধরেছে।

কিন্তু টেলিভিশনে আসর পরিচালনা করে বাবর খ্যাতিমান। যে কোনো অবস্থায় সপ্রতিভ হয়ে থাকাটা তার প্রতিভা। এখনও তার প্রমাণ পাওয়া গেল। মুহুর্তে সপ্রাণ হয়ে উঠে সে। বলল, বাতিটা জ্বালো লতিফা। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

হ্যাঁ, আরে তাইতো, বাতি জ্বল মা, কখন সন্ধ্যে হয়েছে। কাজী সাহেব ব্যস্ত গলায় বললেন। মেয়ের সামনে মেয়ের গয়নার নকসা তাকে অপ্রস্তুত করে ফেলেছে।

বাবার মত আপনিও একটা চশমা নিন না। বাতিটা জ্বালাতে জ্বালাতে লতিফা বলল।

চমশাতে কি আর অন্ধকার আলো হয়?

তা হয় না, তবে বয়স হলে চশমাটা মানায়।

ও-কী কথা! কাজী সাহেব শাসন করেন মেয়েকে।

বাবর হেসে বলল, পাগল মেয়ে একটা।

হঠাৎ লতিফা বাবার কাঁধে হাত রেখে বলল, বাবা, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, তুমি এখনো ঘরে! কী যে বুড়ো হয়েছ, যাও একটু বেড়িয়ে এসো।

বারে, তোর বাবর চাচা এসেছেন যে!

তা তাকেও নিয়ে যাও। তাকে কি রেখে যেতে বলছি! আর আসবার পথে একটা টম্যাটো কেচাপের বোতল নিয়ে এসো।

আচ্ছা, আচ্ছা।

গৃহিণীর সাথে সাথে কাজী সাহেবও ভেতরে চলে গেলেন।

ভেতরে একা একা লতিফা কী করছে? কেন সে আসছে না? বাবরের কপাল কুঞ্চিত হলো। লতিফা কী তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে? অসুখী হয়েছে সে আসতে? হয়ত সেজন্যেই কথায় অত ঝাঁঝ ছিল তার। বাবার উপরেও নিশ্চয়ই খুব চটে যাচ্ছিল তাঁর অমন সহৃদয়তা দেখে। লতিফার সঙ্গে দেখা হলে ভাল হতো। বাবর তাকে জিগ্যেস করত। এভাবে ঢাকা থেকে হঠাৎ তার গা ঢাকা দেবার অর্থটা কী? সে কেন সেদিন কথা দিয়েও আসেনি? বাবর তার জন্যে সারা দিন বসবার ঘরের পর্দা টেনে টেপ রেকর্ডার ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করেছিল।

অপেক্ষাটা এখনো বড় অসহ্য মনে হচ্ছে। সামান্যক্ষণের জন্য দেখা দিয়ে লতিফা গোল কোথায়? কাজী সাহেবকে জিজ্ঞেস করবে বাঁ ডেকে দিতে বলবে, কেমন সঙ্কোচ হলো। এমনিতেই এভাবে এসে পড়ে অবধি অপরাধ বোধটা যাচ্ছে না। পাছে ওরা কেউ টের

পেয়ে যায়। ময়সনসিংহে আদতেই তার কোনো কাজ ছিল না এক লতিফার খোঁজ নেয়া ছাড়া।

গয়নার একটা ছোট বই আর চশমা নিয়ে কাজী সাহেব ঘরে এলেন। বসলেন চেয়ার টেনে ঘন হয়ে। মেলে ধরলেন বই।

আপনি চশমা ব্যবহার করেন নাকি? সলজ্জ হেসে কাজী সাহেব উত্তর করলেন, ঐ পড়ার সময়। বয়স তো কম হলো না।

কত আর হবে?

এই নভেম্বরে চুয়াল্লিশ পড়বে।

বেশ অল্প বয়সেই তাহলে বিয়ে করেছিলেন।

অল্প আর কোথায়? আমার তখন বাইশ কী তেইশ। বড় খোকা এখন কুড়িতে। ছেলেবেলায় বাবা মারা গিয়েছিলেন তো, তাই ঝটপট সংসারী হতে হয়েছিল।

আমার চেয়ে মাত্র চার সাড়ে চার বছরের বড়, ভাবল বাবর। তার মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, দুদিন বাদে নানা হবেন, আর সে এখনও বিয়েই করল না। সময় হলো না সংসারী হবার। বিলেতে একবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। বছরখানেক জয়েসির সঙ্গে বাস

করেছে। মাখনের মত রং সেই তার নগ্ন শরীরটা এখনো চোখে ভাসে বাবরের। বিছানায় চমৎকার সাড়া দিত মেয়েটা। বিয়ের জন্যে শেষ দিকে বড্ড ঝুল ধরেছিল। তাকে কোনোক্রমে সোবহানের ঘাড়ে এবং ঘরে চাপিয়ে দিয়ে কেটে পড়েছিল সে। বিয়ের কথা কিছুতেই ভাবতে পারত না। কল্পনা করতে পারত না স্বামী হিসেবে। মানুষ কী করে সংসার করে, বাবা হয়, শ্বশুর হয়, নানা-দাদা হয় কে জানে?

প্রথমে গলার হার দেখুন। এইটেই জরুরি। এর সঙ্গে মিলিয়ে কানে আর হাতে। দেখুন। ডিজাইনের চলচ্চিত্র সরে যেতে থাকে বাবরের চোখের সম্মুখে। পাতার পর পাতা উল্টে যান কাজী সাহেব।

কোনটা পছন্দ?

আপনারা কোনটা পছন্দ করেছেন?

আগে আপনি পছন্দ করুন, তারপর বলব।

লতিফা বাবরের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে ভেতরে চলে গেল। চলে গেলে কাজী সাহেব হেসে বললেন, বুঝলেন না মেয়ের লজ্জা হয়েছে।

কেন?

বিয়ের গয়না পছন্দ করছি যে আপনাকে নিয়ে।

হুঁ, তাই। বাবর যোগ করল, মেয়েদের এই লজ্জাটা স্বাভাবিক।

কাজী সাহেব উত্তরে বললেন, আজকাল অবশ্য অনেক নির্লজ্জ মেয়ে দেখবেন। আমার মেয়েকে আমি সব রকম আধুনিকতা শিখিয়েছি, কিন্তু তাই বলে কোনোদিন নির্লজ্জ হবার শিক্ষা দিই নি।

আপনি অনেক ভাবেন দেখছি।

হ্যাঁ ভাবি। অনেকের অনেক রকম উচ্চাশা থাকে। আমার একটি মাত্রই অ্যাম্বিশন, আর তা হচ্ছে ছেলেমেয়েদের মানুষ করা। তারা শিক্ষিত হবে, আধুনিক হবে, আবার ভয়ভক্তি থাকবে। গোঁড়া হবে না।

আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, আপনি সফল।

লতিফাকে দেখে বলছেন তো? তবুও বেয়াড়া, মেজ কি-না তাই। দেখতেন। আমার ছেলেটাকে।

কী যেন নাম?

ডাকি বড় খোকা বলে। ভাল নাম কাজী আসাদুল্লাহ। ওর কম্যাণ্ডিং অফিসার ভারি পছন্দ করে খোকাকে। কুমিল্লা ক্যান্টে আছে। যদি কখনো যান খোঁজ করবেন।

হ্যাঁ, নিশ্চয় করব। আমি সব সময়েই ঘুরে বেড়াই। যেমন আজ এই হঠাৎ ময়মনসিংহে আসতে হলো।

এসেছেন খুব খুশি হয়েছি। কুমিল্লায় গিয়ে বলবেন ব্রিগেডিয়ার সাহেবের এডিসি-র কথা। আমার ছেলেই এখন এডিসি। দেখলে আলাপ করলে বুঝতে পারবেন। ছেলেমেয়েকে কোন শিক্ষায় আমি মানুষ করেছি।

হ্যাঁ, আলাপ করব। বোধহয় সামনের মাসে যাব কুমিল্লায়।

এটাও একটা মিথ্যে। এক মিথ্যের জন্য কত মিথ্যে যে বলতে হয়। ময়মনসিংহে আসাটা যে নেহাতই ব্যবসার কাজে সেই মিথ্যেটার সমর্থনে এখন কুমিল্লা যাবার প্রতিশ্রুতি এমনকি সম্ভাব্য সময়ও দিতে হলো।

চলুন বেরই। ময়সনসিংহে এসেছেন কখনো এর আগে?

না।

তাহলে প্রথমে শহরটা একবার ঘোরা যাক, কী বলেন।

না, না এসেছি কাজে, কাজ শেষ হয়েছে, আপনাদের দেখা পেলাম। শহর দেখার চেয়ে আপনাদের সাথে বসে দুটো কথা বলার ইচ্ছে। মনের মত মানুষই আজকাল পাওয়া যায় না যে কথা বলবেন।

চলুন তাহলে ক্লাবে যাওয়া যাক। সেখানে বসে গল্প হবে। কাজী সাহেব গাড়ি বের করলেন। বাবর বলল আমার গাড়িটাই নিতাম।

সারাদিন চালিয়ে এসেছেন ঢাকা থেকে। এখন বিশ্রাম দরকার।

আমার না। গাড়ির? বাবর একটু রসিকতা করল।

দুজনেরই। তাছাড়া আপনাকে নিয়ে যাব এত আমার সৌভাগ্য।

খাঁটি ভদ্রলোক কাজী সাহেব। বোধহয় খুব একা থাকেন। একা থাকলে অনেক সময় মানুষ এ রকম আগ্রহ হয়ে উঠে কারো উপস্থিতিতে। বাবর লক্ষ করল, কাজী সাহেব গাড়ি খুব চালান না। তার একটু ভয়ই করল। যখন তিনি গেট দিয়ে গাড়ি বের করার সময় দেয়ালের সঙ্গে প্রায় লাগিয়ে দিচ্ছিলেন। ওদিকে পথে পড়েই একটা রিকশাকে বাচাতে গিয়ে এমন জোরে ব্রেক করলেন যে বাবরের মাথাটা উইণ্ডশিল্ডে প্রায় ঠুকে গেল।

কাজী সাহেব অপ্রস্তৃত হয়ে একটু হাসলেন। বললেন, ব্রেকটা একটু ট্রাবল দিচ্ছে।

বাবর ভাবছিল লতিফার কথা। একটু অন্যমনস্ক ছিল।

কী ভাবছেন?

না, কিছু না।

নিশ্চয়ই কোনো প্রোগ্রামের কথা।

প্রোগাম মানে টেলিভিশন প্রোগ্রাম। বাবর ভাবল, এরা বাইরে থেকে মনে করেন আমরা একেকটা প্রোগ্রামের জন্য সারাক্ষণ চিন্তা করি। ভুলটা সংশোধন করবার লোভ হলো তার, কিন্তু করল না। বাবর তার প্রোগ্রাম নিয়ে কখনোই আগে থেকে কিছু ভেবে রাখে না। সে মুহূর্তের প্রেরণায় বিশ্বাসী। প্রোগ্রাম রেকর্ড করবার ঘণ্টাখানেক আগে খানিকটা সুরা পান করে এবং একা থাকে। তার যা কিছু করণীয় বাঁ বক্তব্য সেই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বের করে ফেলে সে। তারপর সোজা চলে যায় ক্যামেরার সামনে রেকর্ড করবার জন্যে। যতক্ষণ রেকর্ড না হচ্ছে অস্বাভাবিক রকমে গম্ভীর থাকে। বাবর। আয়েশা বলে যে মেয়েটা, সে একবার বলেছিল, বাবর যখন সঙ্গম করে তখন এত গম্ভীর থাকে যে মনে হয়। অংক করছে। নিন, সিগারেট নিন।

আপনি শুধু শুধু কিনলেন। আমিই নিতাম।

ও একই কথা। কোনদিকে যাব বলুন?

যেদিকে ইচ্ছে।

শহর দেখবেন?

না। ক্লাবে যাবেন বলছিলেন।

ঘড়ি দেখলেন কাজী সাহেব। বললেন, ক্লাব খোলার এখনো মিনিট কুড়ি বাকি আছে। আচ্ছা চলুন।

গাড়ি ক্লাবের দিকে ঘোরালেন কাজী সাহেব।

বাবর বলল, আমার কিন্তু ঐ ডিজাইনটা ভারি পছন্দ। লতিফাকে মানাবেও। ওটারই একটা সেট বানিয়ে দিন।

লতিফা অন্য একটা পছন্দ করেছিল।

কোনটা?

ঐ যে একটার মধ্যে ছোট ছোট সার্কল-ক্রমে বড় হচ্ছে যত নিচে নামছে, – ঐটা, মাঝে পাথর বসানো।

মনে পড়েছে। ওটাও ভাল।

আসলে বাবরের মনে পড়েনি। কোন ডিজাইনের কথা কাজী সাহেব বলছেন কে জানে। বাবর বলল, বানাতে দেয়া হয়ে গেছে?

না, হয়নি। আজকেই দোকানে যাবার কথা ছিল। আপনি এলেন-।

আমার জন্যে কী ছিল। তাহলে আমিও যেতাম।

কাল যাওয়া যাবে। কাজী সাহেব একটু পর আবার বললেন, আপনি যেটা পছন্দ করছেন সেটাও খুব ভাল। আমারও খুব মনে ধরেছে। ভাবছি, ওটাও এক সেট বানিয়ে দেব।

হ্যাঁ, একই মেয়েতো আপনার।

হ্যাঁ, ঐ একটাই মেয়ে। বড় আদরে যত্নে ওকে মানুষ করেছি। বাবর সাহেব। মেয়ের বাপ হবার ট্রাজেডি কী জানেন? নিজ হাতে মানুষ করে তাকে অন্যের কাছে দিতে হয়। এই যে এত আপন, সব মিথ্যে, পর হয়ে যাবে। আপনার মেয়ে বড় হোক তখন বুঝবেন।

বাবর চুপ করে রইল।

আপনার মেয়ের নাম কী রেখেছেন? চমকে উঠল বাবর। আরো একটা মিথ্যে কথা বলতে হবে তাকে। সে বলল, বাবলি।

বাবলির কথাই একটু আগে সে ভাবছিল।

বাহ, ভারি সুন্দর নাম। ভাল নাম কী?

বাবলি বাবর।

অবলীলাক্রমে সে বানিয়ে ফেলল। নামটা। বানিয়ে ভারি পছন্দ হয়ে গেল! তাই আবার সে উচ্চারণ করল, বাবলি বাবর। আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে রেখেছি।

খুব সুরেলা নাম। কবছর যেন বয়েস হলো?

এখন পাঁচ।

যাক, আরো অন্তত বছর পনের কাছে পাবেন। তার পরই মেয়ে আপনার পর।

বিয়ে দিলেই মেয়ে পর হয়?

কী জানি, আমার যেন তাই মনে হয়। আমি কিন্তু আপনার পছন্দ ঐ ডিজাইনেরও একটা সেট বানিয়ে দেব।

নিশ্চয়ই।

ক্লাবের সামনে এসে পড়ল তারা। কাজী সাহেব গাড়ি একটা মনমত কোণে রাখতে রাখতে বললেন, সাধারণত ক্লাবে আসি না। অনেকদিন পরে আজ আসছি। তা প্রায় মাস তিনেক হবে।

শুধু শুধু তাহলে এসে কী দরকার ছিল?

শুধু শুধু কেন? আপনি আছেন যে। মনের মত লোক না পেলে এখানে এসে দুদণ্ড বসা যায় না। ছোট শহর। বসলেই পরিচর্চা আর চাকরির গল্প, ভাল লাগে না সাহেব। পরিচর্চার মত সুস্বাদু আর কিছু নেই যে।

খুব ভাল বলেছেন পরিচর্চা যারা করে তাদের আমি এক মুহূর্ত সহ্য করতে পারি না।

ক্লাবটা ভারি সুন্দর। নিচু একতলা লম্বা দালান। সামনে পেছনে বাগান। খেলার জায়গা। বসবার কোণ।

বাইরে বসবেন, না ভেতরে?

বাইরের বসি।

বাইরে বেশিক্ষণ বসা ঠিক হবে না।

কেন?

ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে যে! ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

আপনাদের বাথরুমটা কোথায়?

এতক্ষণ একবারও যাবার সুযোগ হয়নি। পেটটা ফুলে রয়েছে। লতিফাদের বাসাতেই লেগেছিল। কিন্তু ভদ্রতা করে বলেনি।

ঐ তো বাঁ ধারে, সোজা চলে যানে। সুইচ ঠিক দরোজার বাইরেই আছে। যান।

বাবর গেল। বাতি জ্বলিয়ে ভেতরে ঢুকল। আয়নায় নিজেকে দেখল। খানিক। অহেতুক মাথায় পাকা চুলের সন্ধান করল সে। থাকলেও রাতে তা চোখে পড়ল না। গালের দুপাশে ডলল কয়েকবার। সেভ ঠিকই হয়েছে। ট্রাউজারের বোতাম খুলল সে! ঘণ্টা

সাতেক প্রস্রাব করা হয়নি। হলুদ হয়ে গেছে রং। যন্ত্রটাও বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রায় ভীমাকার ধারণ করেছে। ভারমুক্ত হবার পর এত আরাম লাগল যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে সে একটা হাসি উপহার দিল। তারপর দ্রুত বেরিয়ে এলো বাইরে।

এদিকে আসুন। বলে একটা দরোজার দিকে হাত তুলে ইশারা করলেন কাজী সাহেব। বাবর চোখ তুলে দেখল দরোজার মাথায় সবুজ রংয়ে লেখা BAR.

সে-কী!

অভ্যোস আছে তো?

তা আছে।

তবে আর কী? আসুন, আসুন। অনেকদিন আমি নিজেও বসি না।

কী দরকার?

রেখে দিন তো দরকার। আসুন।

কাজী সাহেব তাকে ঠেলে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। এক কোণে কাউন্টার। কাউন্টারের সামনে উঁচু কয়েকটা টুল। ওদিকে কয়েকটা নিচু চেয়ার। হালকা বাতি জ্বলছে। কাজী

সাহেব বললেন, বার খোলার সময় হয়নি। বেয়ারাকে ধরে এনে খোলালাম। একটু না হয় অপেক্ষাই করতাম।

কী খাবেন?

আপনি?

আপনার পছন্দ বলুন।

হুইস্কি।

আমারও ঐ। দাও, দুটো বড়। সোডা?

না, সোডা না, পানি।

আমি আবার সোডা ছাড়া পারি না।

সোডা শেষ পর্যন্ত আপনার পেটের ক্ষতি হবে।

তাই নাকি? তাহলে আমি পানি দিয়েই।

দুটো গেলাশ সামনে রাখল বেয়ারা। ওরা টুলে পা ঝুলিয়ে কাউন্টারে ঠেস দিয়ে বসল। চিয়ার্স।

চিয়ার্স। আপনাকে যেন মাঝে মাঝে পাই।

ধন্যবাদ।

কিছু বলুন না? বাবর নীরবতা ভঙ্গ করল।

আপনি বলুন। আপনাদের কাছ থেকে দুটো ভালমন্দ শোনা তো ভাগ্যের কথা।

হঠাৎ কেমন রাগ হলো বাবরের। লোকটা নিজেকে এত হীন ভাবতে ভালবাসে কেন? এ কোন ধরনের আনন্দ। অথচ সত্যি সত্যি আমি যদি তাকে বলি, আপনি তুচ্ছ, আপনি সাধারণ, আমার কথা শুনুন, আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাহলে বোমা বিস্ফোরণ হবে। এই অতি ভদ্র অতি বিনয়ী লোকটাই হিংস্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। মানুষ কেন এ অভিনয় করে?

ভাবতেই চমকে উঠল বাবর। সে নিজেও কি একজন শক্তিশালী অভিনেতা নয়? না, না ও কথা থাক। ও কথা এখন ভাবতে চায় না। বাবর। ভাবনাটাকে ভাসিয়ে দেবার জন্য সে ঢাক ঢক করে এক সঙ্গে বেশ খানিকটা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিল।

আপনি যে হঠাৎ এভাবে আসবেন, তা ভাবতেই পারিনি।

আমিও না।

ভাবছিলাম, আজকের সন্ধ্যেটা খুবই খারাপ কাটবে। দৈবের কী কাজ দেখুন, আজকের সন্ধ্যেটাই এমন হলো যে আমার অনেকদিন মনে থাকবে।

আমারও।

আপনাকে অনেকে তাকিয়ে দেখছে।

দেখছে নাকি?

দেখবে না? আপনাকে টেলিভিশনে দেখে। ওরা অবাক হয়ে গেছে, আপনি কী করে এখানে এলেন।

আর বলবেন না, ঢাকাতেও এই কাণ্ড। কোনোখানে যেতে পারি না, বসতে পারি না, একটু একা থাকতে পারি না–লোকে চিনে ফেলে।

লতিফার কাছে শুনেছি। ঢাকায় খুব পপুলারিটি আপনার। ও তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বলে বাবর চাচার মত প্রোগ্রাম আর কেউ করতে পারে না।

বলে নাকি?

বলে। আপনি আছেন বলে আমার ভরসাও কম নয়। মেয়েটা একা একা ঢাকায় থাকে। জানি, কিছু একটা হলে আপনি আছেন, দেখতে পাবেন, খবর পাব।

তাতো নিশ্চয়ই।

তাছাড়া আমি জানি, আপনিও ওকে খুব স্নেহ করেন। আপনার ওখানে যায় তো মাঝে মাঝে? যায় না?

হ্যাঁ, যায়।

আমি ওকে বলে দিয়েছিলাম, ঢাকায় কোথাও যেতে হলে বাবার সাহেবের বাসায় যাবি। আর কোথাও না। বোঝেন তো বার-বাড়ন্ত মেয়ে। সব জায়গায় যেতে দিতে নেই। আমার নিকট সম্পর্কেরও দুজন আত্মীয় আছেন, আমি তাদের বাসায় পর্যন্ত লতিফাকে যেতে দিই না।

কেন?

নিজের মেয়ে বড় হোক তখন বুঝবেন। ভাবছি হোস্টেলে গিয়ে আপনার নাম ভিজিটারদের খাতায় তুলে দিয়ে আসব।

কিন্তু যে বললেন লতিফার বিয়ে দিচ্ছেন। বিলেত যাচ্ছে।

ওহো! এই দেখুন। একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। বলে হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসতে লাগলেন কাজী সাহেব। বাবর বুঝতে পারল হুইস্কি কাজ করতে শুরু করেছে। কাজী সাহেব নেশার আমেজে কী বলতে কী বলছেন। কাজী সাহেব বললেন, আমার জামাইটা খুব ভাল হচ্ছে।

নিশ্চয়ই।

নিজের জামাই বলে বলছি না।এ-কী আপনার গ্লাস খালি, বেয়ারা জলদি দাও।

আপনি?

আমিও নেব। কী বলছিলাম?

বলছিলেন। আপনার হবু জামাইয়ের কথা।

দুটো ছোট ছোট দ্রুত চুমুক দিয়ে কাজী সাহেব বললেন, হবু বলছেন কেন? জামাই হয়েই গেছে। বড় ভাল ছেলে। অমন ব্রিলিয়েন্ট ছেলে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। আমার অনেকদিন থেকেই চোখ ছিল ছেলেটার ওপর।

আপনার তো আত্মীয়ের মধ্যেই?

জি, আমার এক কাজিন শালীর একমাত্র ছেলে। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়তে যাচ্ছে। লতিফাকেও নিয়ে যাবে।

বাবর অত্যন্ত সাবধান কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, লতিফা কী বলে।

ওতো বিলেত যাবার নামে ওড়ে।

না, বিলেতের কথা বলছি না।

তবে?

এত অল্প বয়সে–মাত্র তো সতের–বিয়ে হচ্ছে, তাই বলছিলাম।

তা বিয়ের জন্যে বয়েসটা একটু কম। সেজন্য আমিও ঠিক সাহস পাচ্ছিলাম না। কামাল ওর মাকে বলেছিল–

কামাল কে?

কেন, আমার জামাই!

ও, বলুন।

কামাল ওর মাকে বলেছিল বিয়ে করলে লতিফাকেই করবে। ওর মা বিলেত যাবার আগে ছেলের বিয়ে নিয়ে চাপাচাপি করেছিলেন কি-না তাই।

তারপর?

কাজী সাহেব আরেকটা বড় চুমুক দিলেন গ্লাসে। মুখটা মুছলেন। তারপর চোখ স্তিমিত করে বললেন, অনেকদিন পরে খাচ্ছি কি-না তাই কেমন কেমন লাগছে।

সে-কী, মাত্র দুপেগ তো খেয়েছেন।

আমি খাই-ই কম। আপনি নিন।

নেব। এটা খালি হোক। এখানে চিপস-টিপস কিছু—

বেয়ারা, চিপস।

সে বলল, চিপসের তো ব্যবস্থা নেই।

যেখান থেকে পার ব্যবস্থা কর। প্রায় হুংকার দিয়ে উঠলেন কাজী সাহেব। তার এ মূর্তি বাবর দেখেনি। উনি যে কাউকে ধমক দিতে পারেন সেটা একেবারে অচিন্তনীয়। অপ্রস্তুত হয়ে গেল বাবর। বলল, থাক না, আমি এমনি বলেছিলাম।

না, থাকবে কেন? ড্রিংসের সঙ্গে চিপস নেই। সেক্রেটারীর কাছে কমপ্লেন করব। আবার কেমন বেয়াদপ, মুখের উপর কথা বলে। তুমকো হাম দেখা লেগা।

আরে, করছেন কী?

এই তুমহারা বাড়ি কাঁহা? কাজী সাহেব ধমক দিয়ে উঠলেন আবার।

জি, রাজশাহী।

রাজশাহী।

রাজশাহী কাহাঁ?

চাঁপাই নবাবগঞ্জ, হুজুর।

চল, তব ঠিক হ্যায়। বলে তাকে রেহাই দিলেন কাজী সাহেব এবং মুখ ফিরিয়ে বাবরকে বললেন, আমার দেশেরই লোক কি-না, তাই ছেড়ে দিলাম।

বেশ করছেন। আপনারা তাহলে রাজশাহীর?

হ্যাঁ। আপনি?

বর্ধমান।

পাটিশনের পর ঢাকায় এসেছেন?

ঠিক পার্টিশনের পর নয়। ১৯৫৪ সালে।

খুব অবাক কাণ্ড।

অবাক কীসের?

আরে, চাকরি নিয়ে আমার প্রথম পোস্টইং যে ছিল বর্ধমানে।

তাই নাকি?

তবে আর বলছি কী! খোকার জন্ম হয়। বর্ধমানে।

আর লতিফার?

চাঁটগায়ে।

আর ছোটটি?

মন্টুর কথা বলছেন? ওটি খাস ঢাকাইয়া। আপনি বিয়ে করেছেন কোন ডিস্ট্রীক্টে?

সত্যি মিথ্যের চাষ যাকে বলে আজ তাই হচ্ছে। বাবর একটু স্মিত হেসে সলজ্জ হবার অভিনয় করে সময় নিল। তারপর বলল, ঢাকাতেই।

তাহলে এক হিসেবে আপনিও ঢাকাইয়া। কী বলেন?

ভারি আমোদের একটা কথা যেন তিনি বলেছেন এমনিভাবে দুলে দুলে হাসতে লাগলেন কাজী সাহেব। বেয়ারা তার গ্লাশটা ভরে দিল। আর সে বকুনি খাবার ঝুঁকি নিতে রাজি নয়।

কিন্তু বাবরের এখনও জানা হলো না, বিয়েটা ঠিক হলো কী করে? আর লতিফার প্রতিক্রিয়াই বাঁ কী? বাপ মা কি তাকে জোর করে বিয়ে দিচ্ছে? খুব সম্ভব। তাই। কারণ, লতিফা এই সেদিনও বলছিল, বিয়ে সে জীবনে করবে না। এই এক মাসের মধ্যে এমন কী হয়ে গেল?

কথাটা কীভাবে তোলা যায়। ভাবতে লাগল বাবর। চারদিকে তাকাল সে। একেবারে নীরব নিঝুম সারা ক্লাব। ভেতরে শুধু তারা দুজন। বাইরেও কেউ নেই। বাবর জিজ্ঞেস করল, বিশেষ কাউকে দেখছি না।

দেখতেন। আগে এলে দেখতেন। কী জমজমাট থাকে।

এখন কী হয়েছে?

চারদিকে যেমন আন্দোলন চলছে সাহেব, সবাই সন্ধ্যের পর ঘর থেকে আর বেরোয় না। বিশেষ করে সরকারি কর্মচারীরা। তাদের কীর্তির তো অন্ত নেই সাহেব। ভয়ে, স্রেফ ভয়ে বাসায় বসে থাকে।

ও।

হাসল বাবর। লতিফার কথাটা তোলা যায় কী করে? একটু পর সে আবার চেষ্টা করল, মেয়েরা আসে না ক্লাবে?

ব্যবস্থা তো আছে। মেয়েদের জন্যে আলাদা একটা কামরাও রাখা আছে। কিন্তু সপ্তাহে এক আধাদিন ছাড়া আসে না। আর সময় কই বলুন? ঘর সংসার ছেলে মেয়ে সবারই তো এক অবস্থা।

এবারে আশার আলো দেখতে পেল বাবর। বলল, ছেলেমেয়েদের আপনি খুব ভালবাসেন, না?

ছেলেমেয়েরাই আমার সব। লতিফাকে তো চেনেন, ওকে দেখলেই বুঝতে পারবেন, কী আদরে ওদের বড় করেছি আমি।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন কাজী সাহেব। তারপর গ্রাশের দিকে চোখ রেখেই তন্ময় কণ্ঠে বললেন, বিয়ে দিলেই মেয়ে পর হয়ে যায়। তবুও বিয়ে দিচ্ছি। ভাবতে এখনই আমার খারাপ লাগছে।

আর কিছু দিন পর না হয় বিয়ে দিতেন। ছেলেটা ভাল। তাছাড়া, কদিনই বাঁ বাঁচব। বেঁচে থাকতে থাকতে সব বিলিব্যবস্থা করতে পারলে শান্তিতে মরতে পারব।

এটা স্বার্থপরের মত বলছেন।

তা। আপনি বলতে পারেন।

তাহলে কেন দিচ্ছেন?

আমাকে স্বার্থপর বললেন, না?

আপনি ভুল বুঝবেন না।

না, না ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমার কেন যেন কিছুদিন থেকে কেবল মনে হচ্ছিল লতিফার বিয়ে দেওয়া দরকার।

হঠাৎ গলার কাছে কেমন দলা পাকিয়ে এলো বাবরের। অত্যন্ত সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল সে, কেন এ রকম মনে হচ্ছিল?

জানি না। ঠিক আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। গত ছুটিতে দিন কয়েকের জন্য বাড়িতে এসেছিল লতিফা—

বাবরের মনে পড়ল, সে তাকে গাড়িতে করে ইস্টিশনে দিয়ে গিয়েছিল। শখ করে লতিফা সেদিন একটা শাড়ি পরেছিল গাঢ় নীল রংয়ের। বাবর বলেছিল, সকাল বেলার এই চড়া রদ্দুরে গাঢ় নীলটা চোখে লাগছে, তার উত্তরে লতিফা বলেছিল, চোখে লাগাবার জন্যেই তো পরা।

দিন কয়েকের জন্যে বাড়িতে এসেছিল লতিফা। ও যখন আসে। আমি তখন অফিসে। বাসায় ফিরে দেখি মেয়েটা শুয়ে আছে। ঘুমুচ্ছে। সেই তখনই কথাটা চমক দিয়ে গেল মনে। লতিফার বিয়ে দেওয়া দরকার।

তবু স্পষ্ট বুঝতে পারল না বাবর। সে আরো কিছু শোনার প্রত্যাশায় উৎকর্ণ হয়ে রইল। তার মাথাতেও সুরার ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কাজী সাহেব অনেকক্ষণ আর কিছু বললেন না বলে বাবরই সরব হলো।

তখনই বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেললেন বুঝি?

সুস্থ অবস্থায় থাকলে এ রকম একটা হাস্যকর কথা না বক্তা বলতে পারত না শ্রোতা শুনতে পারত। গাম্ভীর্য না হারিয়ে। কাজী সাহেব উক্তিটা বিবেচনা করে উত্তর দিলেন, না ঠিক তখনই ব্যবস্থা করা যায় নি। তবে ওর মাকে সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলাম।

ভাবী কী বললেন?

তিনি বললেন মেয়ের বয়স কম। আমি বললাম, রাখি বয়স। আগের দিনে সতের বছরে চার ছেলের মা হতো। আমার মা পনের বছরে আমাকে পেয়েছিলেন। আপনার মা?

সুরাপানে বাবর অভ্যস্ত। তাই সে অবিরাম এতক্ষণ পান করার পরও কোনোক্রমে বুঝতে পারল কাজী সাহেবের বেশ নেশা হয়েছে। শেষ প্রশ্নটা তার প্রমাণ।

আপনার মায়ের কত বছরে আপনি হয়েছিলেন বলুন তো? কাজী সাহেব এবারে বিশদভাবে প্রশ্নটা করলেন।

আমার মনে নেই।

হাঃ হাঃ হাঃ। আপনার মনে থাকবে কী করে? আরে, আপনার তো তখন জন্মই হয়নি। হাঃ হাঃ হাঃ!

বাবর হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, বলল নয়, বলে টের পেল সে বলে ফেলেছে, লতিফাকে আমি পছন্দ করি।

লতিফাও বলে বাবর চাচা আমাকে খুব স্নেহ করে।

বলেছে আপনাকে?

কতবার বলেছে। বিশ্বাস না হলে বাসায় ফিরে আপনার সামনেই জিজ্ঞেস করব। নিজ কানে শুনে যাবেন।

আপনার মেয়ের মত মেয়ে আমার চোখে পড়েনি, জানলেন কাজী ভাই।

দোয়া করবেন।

তা সব সময়েই করি।

বাপের মনতো, বেশি প্রশংসা শুনলে মনটা ভয় পেয়ে যায়।

না, না কী যে বলেন ও সব কুসংস্কার।

আপনি আরো নিন। বেয়ারা!

আপনি?

ব্যাস, আমি আর না।

সে হয় না।

আচ্ছা বলছেন যখন, আরেক পেগ নিচ্ছি। বেয়ারা, সাবকে দুটো দাও। দাও, দাও এক সঙ্গে ঢেলে দাও।

স্যার, দশটা বাজে, এখন বন্ধ করতে হয়।

চুপ হারামজাদা।

স্যার, সেক্রেটারী সাহেবের অর্ডার।

ফের কথা।

বেয়ারা চুপ করল।

বাবর বলল, চলুন, গ্লাশটা শেষ করেই উঠা যাক। ভাবী ওদিকে রান্না করে বসে আছে।

আরে আপনি আছেন বলে আমি নিশ্চিন্তে আছি। যত রাতই করি না কেন, কিছু বলতে পারবে না। হাঃ হাঃ। তবে ঐ মেয়েটাকে নিয়ে ভয়।

লতিফা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ একটাই তো আমার মেয়ে। ওর মা বুঝলেন কোনোদিন আমাকে শাসন করে জুৎ করতে পারেনি, আর সেদিনের মেয়ে, আমারই পেটে হলো, আরে কী বলছি, আমারই ইয়েতে, মানে আমারই মেয়ে, বুঝতেই পারছেন কী বলছি–

হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।

সেই মেয়ে আমাকে এমন শাসন করে–হাঃ হাঃ। আপনার মেয়ে আছে তো, বুঝবেন, নিজেই বুঝতে পারবেন, মাশআল্লা বড় হোক। কী যেন নাম আপনার মেয়ের?

তাইতো কী যেন একটা বানিয়ে বলেছিল বাবর ভারি মুশকিল হলো তো! কিন্তু বানিয়ে কথা বলা আর কথা বিক্রি করে খাওয়া বাবরের পেশা। সে পাল্টা বলল, লতিফার বিয়ে তাহলে আপনিই ঠিক করলেন। কী করে কথাটা পারলেন ওর কাছে?

আরে বাবার সাহেব, সেই কথাই তো বলছি। মেয়ে আমার বাড়িতে এসেই মাকে বলে, বিয়ে টিয়ে দেবে না আমাকে? শুনুন কথা।

লতিফা নিজে বলেছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনে দেখবেন আপনার ভাবীর কাছে।

অবাক হয়ে গেল বাবর। লতিফা নিজে বলেছে, যেন বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। তার মুখ দিয়ে একটা শব্দ গড়িয়ে পড়ল।

আশ্চর্য।

জানি, জানি, আপনি অবাক হবেন। কিন্তু মেয়েকে আমি সে শিক্ষা দিইনি যে, মনের কথা মনে পুষে রাখবে। আমরা বাবা মা চিরদিন ওকে বুঝিয়েছি যে আমরা তোর বন্ধু, সবচে

ভাল বন্ধু। তাই যে কথাটা আর দশটা মেয়ে বলতে লজ্জায় হার্টফেল করত, সে কথা আমার মেয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই বলতে পেরেছে।

তারপর?

তারপর আর কী? বিয়ে দেবার কথা আমিও ভাবছিলাম। ঐ যে বললাম, তাছাড়া আপনি বললেন, আমি স্বার্থপর। মেয়েকে পর করে নিশ্চিন্ত হতে যাচ্ছি। সেটাও আছে। লিখে দিলাম কামালের মাকে চিঠি। আপনাকে দাওয়াত করব। আসতেই হবে। আপনি না এলে লতিফার বিয়েই হবে না।

আসব, আসব।

আসব বললে হবে না, আসতেই হবে।

আসব। কেন আসব না? এই যে না বলে না কয়ে হঠাৎ চলে এলাম।

সত্যি কী যে খুশি হয়েছি।

এক চুমুকে গ্লাশ শেষ করল বাবর। কিছুতেই এ বিস্ময় তার যাচ্ছিল না যে লতিফা নিজে বিয়ে করতে চেয়েছে। চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে লতিফার মুখ। লম্বা

ডিমের মত। লাল লাল ফর্সা। একটা নীল শিরা, কোথায় যেন সুন্দর একটা কাঁথায় নীল সুতার মত। লতিফাকে একবার চোখে দেখতে ভারি ইচ্ছে করছে বাবরের।

বাবর বলল, চলুন।

আর একটু খান।

আর না। সত্যি একটু বেশিই হয়ে গেছে।

এই বলে বাবর পকেট থেকে টাকা বের করল। খপ করে তার হাত ধরে ফেললেন কাজী সাহেব।

আরে, আরো করছেন কী? মাথা খারাপ? এখানে সব সাইয়ের কারবার বলে বেয়ারার হাত থেকে মেমো নিয়েই সই করে দিলেন কাজী সাহেব। বললেন, চলুন।

বাইরে বেরিয়ে তিনি বললেন, ভাবছেন, মাতাল হয়ে গেছি, না? গাড়ি চালাব কী করে?

কী যে বলেন?

চলুন, এমন আরামে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব যে, জানতেও পারবেন না। তারপর হঠাৎ আচমকা অপ্রাসঙ্গিকভাবে কাজী সাহেব বললেন, আমার জীবনটা খুব কষ্টে গেছে, জানেন? খুব দুঃখে মানুষ হয়েছি।

আর কিছু বললেন না। তিনি। বাবর কোনো উৎসাহ পেল না যে প্রশ্ন করে। তার মাথায় এখন লতিফার নাম, আর চোখে লতিফার ছবি। লতিফা নিজে বিয়ের কথা বলেছে, আশ্চর্য।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি স্টার্ট নিল। অ্যাকসেলেটারে হঠাৎ বেশি চাপ পড়ে গিয়েছিল বোধহয়। বাবর সে কথা তুলে তাকে আর লজ্জা দিল না। পরে হঠাৎ বাবরের মনে পড়ল তার মেয়ের নাম সে বলেছিল বাবলি বাবর। নিজের কাছেই খুব মিষ্টি লাগছে নামটা। বাবলির সাথে নিজের নাম যোগ করার ফলে সুন্দর একটা সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে যেন। বাবলি বাবর। ঢাকায় ফিরে বাবলির সঙ্গে দেখা করতে হবে। অনেক দিন দেখা হয় না। নাকি সেও এব। মধ্যে লতিফার মত না কয়ে ঢাকা ছেড়ে চলে গেছে? আজকাল এই সব তরুণী মেয়েদের তাল বুঝতে পারে না সে। বয়সের দুযুগ ব্যবধান। কুড়ি বছর। কুড়ি বছর আগে কলকাতায় ছিল। সে আরেক জীবন। আর এক জগৎ।

এর আগে এতটা কোনোদিন ভাবেনি বাবর। লতিফার হঠাৎ চলে আসা তাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে। কেমন একটা কষ্ট হচ্ছে কোথায়। না, ও কিছু না, সে ভাবল। আমি আজ খানিকটা বেশিই সুরা পান করে ফেলেছি। অতিরিক্ত সুরা পান করলে কখনো কখনো এ রকম রিক্ত পরাজিত মনে হয় নিজেকে।

ভাবনাটাকে পাশ কাটাবার জন্য কাজী সাহেবের দিকে মনোযোগ ফেরাল বাবর। দেখল, মিটমিট করে হাসছেন তিনি, চোখ পথের উপর স্থির নিবদ্ধ।

হাসছেন যে।

এমনি। আজি সন্ধ্যেটা বেশ কাটল।

চমৎকার।

আপনাকে খুব ভাল লাগে আমার। ঢাকায় আসুন না ছুটি নিয়ে। জমিয়ে গল্প করা যাবে কয়েকদিন।

আসব। এলে আপনাকেই প্রথম ফোন করব।

আপনি তখন আমার মেয়ের নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কী যেন নাম?

বাবলি বাবর।

বাসার কাছে এসে গেল তারা। সদর ফটক বন্ধ। বাবর বলল, দাঁড়ান, আমি নেমে খুলে দিচ্ছি।

হাতঘড়ি আলোর দিকে ধরে কাজী সাহেব শীস দিয়ে উঠলেন।

এ-গা-র-টা বাজে। আমার আবার ভোরে অফিস কি-না। তাই দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ার অভ্যেস।

সন্তর্পণে ফটকের ভেতর দিয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে গ্যারেজে রাখলেন কাজী সাহেব। বাবর সেখানে দাঁড়িয়েছিল। কাজী সাহেব কাছে এলে বারান্দার দিকে এগুলি তারা। ওঠার সিড়িতে পা দিতেই নিশ্চল হয়ে গেল বাবর।

লতিফা দরোজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঢিলেঢালা জামা পাজামা পরনে। আধা স্বচ্ছ নীল রং। চোখে ঘুমের ভাব। রোঁয়া ফোলান আদুরে বেড়ালের মত দেখাচ্ছে মুখটা। দৃষ্টিতে ভ্রকুটি। বাবর নিঃশব্দে একটু হাসল। তার কোনো জবাব দিল না লতিফা। তখন সে বলল, এই যে, জেগে আছ।

কাজী সাহেব বললেন, তোর মা কোথায়?

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে একরোখা গলায় জিজ্ঞেস করল, তোমরা গিয়েছিলে কোথায়?

বাবর সাহেবকে শহর দেখিয়ে আনলাম। অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিলাম, তাই না বাবর সাহেব?

জি।

দরোজা ছেড়ে দিল লতিফা। ওরা ভিতরে ঢুকল। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। এখানে একটা বড় শেড দেয়া বাতি জ্বলছে মৃদু আলো ছড়িয়ে। ঐ কোণে চৌকি পাতা হয়েছে। তাতে কালো শাদা নকসা করা বেড কভার। বাবরের ভাবতে ভাল লাগল বিছানাটা লতিফা নিজ হাতে করেছে। সেদিকে তাকিয়ে সে বলল, অনেক কষ্ট দিলাম তোমাকে।

বিছানা আমি করিনি, মা করেছেন। বলে লতিফ বাবাকে বলল, খাওয়া হয়েছে তোমাদের?

নাহ্। বলে একটা সোফার ওপর ধাপ করে বসে কাজী সাহেব জুতো খুলতে লাগলেন।

কেমন একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা সরসর করে যনে হেঁটে বেড়াচ্ছে। সেটাকে ঘায়েল করার জন্য বাবর একবার হাসবার চেষ্টা করল। গলা দিয়ে শব্দ বেরুল জং ধরা একটা মেশিনের মত।

নাক সরু করে লতিফা বাবার মুখের কাছে মুখ এনে ঘ্রাণ নিল।

তোমরা মদ খেয়েছ?

নাতো। না। এই একটুখানি। বলে অনাবিল হাসবার ভঙ্গি করলেন কাজী সাহেব।

লতিফা বলল, তোমাদের ভাত দেয়া আছে। খাবে এসো।

লতিফাকে দেখে মনে হচ্ছে বাবর যেন এ ঘরে নেই।

খাওয়া শেষে লতিফা জিজ্ঞেস করল, এতক্ষণ পর এই প্রথম বাবরকে, চা খাবেন? না, খেলে আপনাদের নেশা ছুটে যাবে?

সে যে একটা কথা অন্তত বলেছে এতে বড় স্বচ্ছন্দ বোধ করল বাবর। বলল, রাতে তো একবার চা খাওয়া আমার অভ্যোস কিন্তু তোমার যে কষ্ট হবে।

নিঃশব্দে চায়ের পানি গরম করতে গেল লতিফা।

কাজী সাহেব বললেন, আপনি কিন্তু বিয়েতে আসবেন।

আসব, আসব না কেন? লতিফার বিয়েতে আসব।

বাবর নিজেই টের পেল হুইস্কির ওজনে স গুলো সব শ হয়ে যাচ্ছে জিভেয়। চোর চোখে একবার সে তাকাল লতিফার দিকে। কিন্তু তার মনোযোগ কেতলি কাপের দিকে।

নিঃশব্দে চা খেলো ওরা। কাজী সাহেব মাঝখানে কী একটা প্রসঙ্গ তুলতে গেলেন। কিন্তু নিজেই কী বুঝে আর তুললেন না।

লতিফা বাবরকে দ্বিতীয়বার কথা বলল, আপনি তো ক্লান্ত, শুয়ে পড়ুন।

বাবা ঘরে চল।

হ্যাঁ, যাচ্ছি। এত তাড়া দিচ্ছ কেন?

রাত কত তার খেয়াল আছে?

আছে, আছে। বলতে বলতে কাজী সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আচ্ছ। আপনি ঘুমোন তাহলে। সকালে দেখা হবে। বাঁ পাশের দরোজা দিয়ে বাথরুম।

আর লতিফা যেতে যেতে তাকে বলল, শোবার সময় বাতি নেভাতে ভুলবেন না।

শূন্য ঘরে একবার মনে হলো বাবরের, লতিফা কথায় এত বিষ ব্যবহার করছে কেন? তারপর ভারি ক্লান্ত উদ্যমহীন মনে হলো নিজেকে। সে শুয়ে পড়ল।

শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। ঘরের শ্যাওলা পড়া ছাদ, শেড দেয়া বাতি থেকে উর্ধমুখে বেরুনো আলোর চক্র, পর্দা টানা জানালাগুলো। কানের ভেতরে অতি উচ্চগ্রামের কিছু শব্দ তোলপাড় করতে লাগল অবিরাম। এ শব্দ কীসের? কোথেকে আসছে? ও, লতিফা বাতির কথা বলছিল। বাবর বাতি নিভিয়ে দিল।

একবার মনে হলো তখন, সে জাহাজে করে কোথাও যাচ্ছে, যেমন গতবার চাটগাঁ থেকে করাচি গিয়েছিল। আরেকবার ভাবল সে ঢাকায় তার নিজের ঘরেই আছে। কোনটা সত্যি ভালো করে স্থির করার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল সে। ঘুমিয়ে পড়ল না। চৈতন্য হারাল সেটাও বিতর্কের বিষয়।

২. লতিফা

জাহাজে করে কোথাও যাচ্ছিল বাবর। জাহাজটাই ডুবে গেল। নিঃশব্দে। নিমেষে। সে এখন পানির অতলে অবিরাম নামছে, নামছে।

নামতে নামতে গতিটা হঠাৎ থেমে গেল। স্থির হয়ে রইল বাবর। আর তার চারদিক দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। নীল শীতল অগাধ পানি। একটা বড় রূপালি মাছ এলো কোথা থেকে। সে তার ঈষৎ গোলাপি লেজ দিয়ে মৃদু চাপড় মারতে লাগল বাবরের তলপেটে।

তখন চোখ মেলে তাকাল বাবর।

দেখল, অন্ধকারে তার কোলের কাছে মৃদু সুগন্ধ ছড়ান একতাল সাদা। স্পর্শ করতেই মনে হলো তা কোমল এবং উষ্ণ।

বাবর উচ্চারণ করল, লতিফা? তারপর আবার বলল, লতিফা তুমি? এবং উঠে বসতে চেষ্টা করল সে।

লতিফা তার কনুইয়ের উপর চাপ দিয়ে বলল, আস্তে চুপ, কেউ জেগে উঠবে।

বাবর অবাক হয়েছিল। অবাক হয়েছিল। এভাবে চোরের মত মাঝ রাতে লতিফা এসেছে বলে নয়। মনের কোনো এক কোণে যেন মনে হচ্ছিল লতিফা আসবে এবং সেটা এখন বাস্তবে মিলে যাচ্ছে।

তার হাত মুঠো করে ধরল বাবর। ঠাণ্ডা নরম স্বাস্থ্যভরা পাঁচটা আঙুল। এমনকি শুধুমাত্র স্পর্শ দিয়ে তার এক পিঠে গোলাপি আরেক পিঠে বাদামি রংটা টের পাওয়া যাচ্ছে। আঙুলগুলো পরমুহূর্তে ছেড়ে দিয়ে লতিফার কাঁধে হাত রাখল বাবর। তরুণ একটা গাছের ডালের মত নিটোল নমনীয় সেই কাঁধ। কাঁধের পরেও স্থায়ী হলো না। হাতটা সে পাঠিয়ে দিল লতিফার পিঠে। দীর্ঘস্থায়ী একটা সুখস্বপ্নের মত পিঠ। মাঝখানে মেরুদণ্ডের নদী। সেই নদীপথে হাতটা একবার খেলা করল। তারপর স্থায়ী হলো কোমরের ওপরে, যেখানে বিরাট একটা বর্তুলের মত স্পন্দমান নিতম্বের শুরু। বাবরের আরেকটা হাত তৎক্ষণাৎ আবরিত করল লতিফার বাম স্তন। এবং নিজের কাছে নিবিড়তর করতে চাইল সে তাকে।

ধাক্কা দিয়ে লতিফা তাকে সরিয়ে দিল। যেন এতক্ষণ বাবর একটা সুদৃশ্য চকচকে বৈদ্যুতিক যন্ত্র লাগাচ্ছিল, এখন সুইচ টিপতেই শক দিয়েছে।

কী হলো? খসখসে গলায় প্রশ্ন করল বাবর। এবং উঠে বসে লতিফাকে চুমো দেবার জন্যে গলা জড়িয়ে ধরল। তার। লতিফা মুখ সরিয়ে নিতেই একরাশ শ্যাম্পু করা সুগন্ধ জড়ান অশান্ত চুল ছেলেবেলার ঝড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে আচ্ছন্ন করে দিল বাবরের সারা চেহারা। অবাক হয়ে গেল সে। লতিফা তো কোনোদিন এমন করে না।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

লতিফা পরীক্ষণে মুখ ফিরিয়ে হিসহিস করে বলল, কেন তুমি এসেছ?

কেন এসেছি জান না? তোমার জন্যে।

মিথ্যেবাদী।

শোন লতিফা। বলে বাবার আবার তাকে চুমো দিতে চেষ্টা করল।

না শুনব না। কেন তুমি এসেছ?

বললাম তো, তোমার জন্যে।

মিথ্যুক।

লতিফা শোন। বাবর তার পিঠে হাত রেখে সুদক্ষ সেনাপতির মত তড়িৎবেগে আরেকটা হাত গুঁজে দিল লতিফার দুই উরুর ভেতর। দপ দপ করে উঠল সেখানে। প্রবল দুহাতে লতিফা তার মুঠি সরিয়ে কোনোক্রমে কেবল বলতে পারল, না।

না কেন? আমি এর জন্যে মরে যাচ্ছি।

তুমি তো এই-ই চাও।

চাই। আগেও তো দিয়েছ।

না।

দাওনি?

লতিফা চুপ।

বাবর তখন বলল, কতদিন না চাইতেই দিয়েছ। আসবার কথা ছিল না। হঠাৎ সকালে স্কুটারের শব্দ শুনে উঠে দেখেছি, তুমি। সকালে কী ওসব করা যায়? তবু তুমি চেয়েছ বলে তৈরি করেছি নিজেকে। আজ না কেন?

বলে আবার সে হাতটা লতিফার ঊরুর ওপরে রাখল। সেখান থেকে একটা আঙুল কেন্দ্রের ওপর চেপে ধরল। আর্তনাদ করে উঠল লতিফা।

পশু, একটা পশু তুমি।

নিঃশব্দে হাসল বাবর। বলল, তুমি বড় রাগ করেছ।

রাগ করব তোমার ওপর? তুমি কী বোঝ রাগের? একটা পশু হলেও সে বুঝতো। তুমি তাও নও।

বাবরের এবার রাগ হলো হঠাৎ। কিন্তু মুহূর্তে সেটা কবর দিয়ে হাসল। বলল, অথচ একটু আগেই তুমি বলেছিলে আমি নাকি পশু।

বলেছি, বেশ করেছি। আবার বলব। একশ বার বলব। তোমার সঙ্গে আমার কীসের সম্পর্ক?

সম্পর্ক নেই?

না, নেই।

নেই?

হ্যাঁ, নেই। তুমি মনে করেছ। আমি তোমার জন্য মরে যাব, না?

তোমার আগে যেন আমার মরণ হয়। বাবর বলল। বলেই ভাবল, এ রকম কথা নভেলে লেখা থাকে, স্ত্রী বলে স্বামীকে। কথাটা কী মেয়েলি শোনাল? সন্দেহে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইল বাবর। পরে বলল, বল, আর কী বলবে?

তোমাকে কিছু বলতে চাই না। তুমি এত বড়– এতবড় ভণ্ড।

পশু থেকে ভণ্ড? প্রমোশন দিলে না। ডিমোশন করলে? বলতে বলতে সন্ধানী তর্জনীটাকে আরো খানিকটা এগিয়ে দিল বাবর। লতিফা বাধা দিল না। কিম্বা বাধা দেবার কথা মনে হলো না তার। তখন আরেকটা হাত বাবর রাখল লতিফার নিতম্ব বেষ্টন করে। ক্রমসঞ্চারিত বাসনা এবং সাহসে তার হাত ফুলে উঠতে লাগল। লতিফা হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে বলল, তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না। কিন্তু তোমাকে চাই। কাছে চাই। সারাক্ষণ চাই।

মিথ্যে কথা।

সত্যি। তুমি নিজেই জান যে সত্যি।

মিথ্যুক।

একেবারে নিজের কাছে আমার করে তোমাকে চাই।

ভণ্ড।

কোনোদিন তোমাকে হারাতে চাই না।

আমি জানি।

জান?

জানি, জানি, তুমি কী চাও।

বাবর তাকে টেনে বুকের মধ্যে লুকিয়ে খাটো চুলের নিচে গোলাপি ঘাড়ের ওপর চুমো দিল। চুমোটা শুকনো লাগল। তখন মুখের ভেতরটা ভিজিয়ে সেই জিভ দিয়ে নিজের ঠোঁট চাটল এবং আবার চুমো দিল। মনে হলো শিশির ভেজা একটা ছোট্ট পাতা ছাপ রেখে গোল লতিফার শরীরে।

লতিফা সেভাবেই পড়ে থেকে বলতে লাগল, তুমি যদি আমাকে ভালবাসতে তাহলে—তাহলে—তাহলে–

বাবর তাকে ছেড়ে দিল।

কী তাহলে, বল?

লতিফা মাথা ঝাঁকিয়ে চুলের রাশ বশে আনতে আনতে উত্তর দিল, তাহলে তুমি বাবার সঙ্গে বসে গহনার ডিজাইন পছন্দ করতে পারতে না।

বাবর নিঃশব্দে হাসল।

হ্যাঁ পারতে না। অমন দাঁত বের করে বাবাকে খোশামোদ করতে পারতে না।

বাবর আবার তেমনি হাসল।

আমার কাছে এসেছে কেন? যাও বাবার কাছে যাও।

বাবর বলল, আমি কোথায় এলাম, তুমিই তো এসেছ।

না, আসিনি। বলে চট করে উঠে দাঁড়াল লতিফা। তারপর কী ভেবে বলল, হ্যাঁ এসেছি। কেন এসেছি–একটা—একটা—

বলতে বলতে, হাঁপাতে হাঁপাতে লতিফা বাবরের গালে তীব্র একটা চড় বসিয়ে দিল।

লাফ দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বাবর চাপা গলায় চিৎকার করে উঠল, লতিফা! লতিফা, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

তার মনে হলো লতিফাকে সে খুন করে ফেলে, দুহাতে গলা টিপে তার শেষ নিঃশ্বাস নিংড়ে বের করে নেয়। মনে হলো, লতিফাকে চড় মারতে মারতে অবসন্ন করে নিজের পায়ের নিচে নেতিয়ে ফেলে দেয়। কিন্তু তার বদলে বাবর লতিফাকে একটা নিষ্ঠুর চুমো

দিল। চুমোটা উত্তেজনায় নাকের নিচে প্রোথিত হলো। তারপর তাকে ছুঁড়ে দিল বিছানায়। এবং নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। এক হাতে পাজামার ইলাস্টিক ব্যাণ্ড আলগা করে টেনে নাবিয়ে আনল হাঁটু পর্যন্ত এবং একই সঙ্গে নিজের পাজামার সমুখের পথ ছিঁড়ে প্রসারিত করে বিদ্যুদ্বেগে প্রচণ্ড একটা চাপ দিল।

ভুল হলো। গন্তব্যে পৌঁছল না সে। হাঁপাতে লাগল। আর তার নিচে জাহাজের একটা মোটা কাছির মত অতিদ্রুত পাকাতে লাগল লতিফার শরীর। আবার লক্ষ্যস্থান সন্ধান করার জন্যে বাবর ধনুকের মত বাঁকা হতেই লতিফা তাকে ঝটিকা দিয়ে ফেলে দিল। অর্ধ উলঙ্গ বাবর দেখল। লতিফা ঘরের মাঝখানে দড়িয়ে হিসহিস করে বলছে, শয়তান, জোচ্চোর, পশু।

লতিফার হাঁটু পর্যন্ত নাবানো পাজামা। তাকে হঠাৎ এমন হাস্যকর মনে হলো বাবরের যেন একটা কার্টুন দেখছে সে। চলে যাবার জন্যে লতিফা এক পা ফেলতেই নিজের নাবানো পাজামায় বাধা পেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, এক মুহুর্তে সামলে নিল, সরসর করে টেনে তুলল পাজামা। তখন আরো হাসি পেল বাবরের।

লতিফা চলে গেলে বাবর একা অন্ধকার ঘরে হাসল। বিছানার ওপর হিজ মাস্টারস ভয়েসের কুকুরের মত বসে থেকে হাসল বাবর।

৩. উল্কার মত গাড়ি চালিয়ে

পরদিন উল্কার মত গাড়ি চালিয়ে ঢাকায় ফিরল বাবর। পরদিন লতিফার সঙ্গে আর দেখা হয়নি তাঁর। ভোর রাতে ক্রমবর্ধমান অথচ অপূর্ণ, প্রতিহত সেই বাসনাকে নিজ হাতেই বইয়ে দিতে হয়েছে। সেই থেকে কোথায় যেন একা জ্বালা, একটা আক্রোশ, একটা প্রায় দৃশ্যমান স্তব্ধতা বড় হতে হতে জগৎ সংসার গ্রাস করবার উপক্রম করেছে।

ঢাকায় ফিরে ঘরের তালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সে শুনতে পেল ভেতরে টেলিফোন বাজছে। অদ্ভুত যোগাযোগ তো! আর এক মিনিট পরে পৌঁছলেই টেলিফোনটা সে পেত না। কে হতে পারে?

হ্যালো। হ্যালো। কে?

চিনতে পারছেন না?

তারপর হাসির একটা তরঙ্গ।

বাবর ভেবে পেল না কে হতে পারে? মেয়েদের হাতের লেখার মত তাদের কণ্ঠস্বরও সবার কেমন এক মনে হয় বাবরের। চট করে ঠাহর করতে পারে না। কারো চিঠি এলে ওপরে ঠিকানা দেখেও এ রকম হয় তার। অনেক সময়, যখন মেজাজ খুব ভাল থাকে, নিজের সঙ্গেই বাজি ধরে সে-- যদি অমুক হয় তাহলে আজ আবার দেবব্রতের রেকর্ডটা

বাজাব আর না হলে শাস্তি হিসেবে বাথরুমের বালবের দিকে তাকিয়ে থাকিব যতক্ষণ না চোখে পানি আসে।

টেলিফোনে বাবর সপ্রতিভ সুরে বলল, পারছি, নিশ্চয়ই চিনতে পারছি।

পারছেন?

হ্যাঁ। আপনার মুখে কিন্তু আপনার নাম ভারি সুন্দর শোনায়।

তাই নাকি?

ভদ্র মহিলা প্রীত হলেন। বললেন, আমি মিসেস নাফিস।

উচ্চারণটা শোনাল যেন–ইস্ ইস্ ইস। এবারে বাবর চিনতে পেরেছে।

আরে হ্যাঁ তাইতো! মিসেস নিফিসের গলাই তো।

সে বলল, কেমন আছেন?

ভাল। সকালে ঘরে ছিলেন না?

না। কেন, টেলিফোন করেছিলেন?

হ্যাঁ, একবার দুবার। কী ব্যাপার, দেখাই নেই?

বাবর মিথ্যে করে বলল, একটা জরুরি কাজে চিটাগাং যেতে হয়েছিল। ট্যাক্স বেশি ধরেছিল, সেইটে কমাতে।

আবার হঠাৎ আক্রোশটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল বাবরের ভেতরে। আর লতিফাকে যে কাল রাতে পায়নি তার জ্বালাও টগবগা করে উঠল সারা দেহে।

মিসেস নাফিস বললেন, বেশ আছেন, লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছেন।

আপনি কি ইনকাম ট্যাক্স অফিসে কাজ নিয়েছেন?

নিইনি। তবে যদি বলেন তো তাদের জানিয়ে দি।না, না, এত বড় শত্রুতা আপনার করব না। নিশ্চিন্ত থাকবেন।

আপনাকে নিয়ে আমার ভয় নেই।

সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি।

কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি আমাকে ভয় করেন।

কেন বলুন তো?

নইলে আমাকে একবার দেখতে আসতেন।

কেন, কী হয়েছে। আপনার?

কিছু না হলে কি দেখতে আসতে নেই?

নিশ্চয় আছে। আমি, টেলিফোনে হাত দেখা যাচ্ছে না, তবু আপনাকে কল্পনা করতে বলছি, আমি এই করজোড়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

রিনটিনটিন হেসে উঠলেন মিসেস নাফিস। বললেন, নাহ, কথায় আপনার সঙ্গে পারবার জো নেই। টেলিভিশনে কাজ করেন তো! কথা খুব বলতে পারেন।

বাবর বলল, শুধু কথা নয়, কাজেও।

তাহলে আজ প্রমাণ দিন। নইলে বিশ্বাস করব না।

আচ্ছা, আজই আসব। আসলে আমি ভাবছিলামও আজ। আপনার বাসায় যাব। তাহলে আজ। যাচ্ছি। কেমন? রাখি।

অবলীলাক্রমে মিথ্যে বলতে পারে বাবর। সেটা সে নিজেও জানে তবু প্রতিবারই একটা মসৃণ মিথ্যে বলে নিজেই চমৎকৃত হয় সে। যেমন এখন হলো।

বাথরুমে যাচ্ছিল বাবর, আবার টেলিফোন বেজে উঠল।

আমি মিসেস নাফিস বলছি। কখন আসবেন বললেন না তো?

ও, বলিনি? চারটে?

সাড়ে চারটে।

ঠিক, সাড়ে চারটেই আসব। রাখি?

আচ্ছা।

বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রস্রাব করল বাবর। এখনও রংটা গাঢ় হলুদ। কাল থেকে এই রকম। একটা অ্যালক্যালি মিকচার আনা দরকার। বেরিয়ে এসে গুমুধটা এনে

কয়েক চামচ খেল সে। কেমন টকটক ঝাঁঝাল। কিন্তু বেশ লাগল খেতে। তারপর শাওয়ার খুলে গোসল করে লম্বা হয়ে পড়ল বাবর। ঘুম এলো সঙ্গে সঙ্গে। ঘুমের ভেতরে সে দেখল তার দরোজায় দাঁড়িয়ে আছে লতিফা। তার পরনে একটা সুতো পর্যন্ত নেই। কিন্তু একটুও অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। চোখে পুরু কাজল। কাজল গলে অশ্রুর ধারা নামছে।

আরে তুমি, দেখি, দেখি কী হয়েছে?

তাকে আদর করতে করতে ঘরে নিয়ে এলো বাবর। আর ভেতরে দেখল তারই বিছানায় এক হাঁটু পিরামিডের মত তুলে শুয়ে আছেন মিসেস নাফিস। তার ঠোঁটে স্থির একটা হাসির বিদ্যুৎ। বাবরের এ রকম মনে হলো লতিফা যেন মিসেস নফিসের মেয়ে। সে খুবই লজ্জিত এবং অপ্রস্তুত হলো। পরীক্ষণে সারা শরীর হিম হয়ে গেল তার। পা কাঁপতে লাগল। পালাবার জন্যে দৌড়ে বাথরুমের দিবোজাটা খুলতেই শাওয়ারের তীব্র ছটা এসে তাকে ভিজিয়ে দিয়ে গেল।

ধরমর করে উঠে বসল বাবর। সম্মুখে তাকিয়ে দেখল বাবলি দাঁড়িয়ে আছে। নিজের চেহারায় হাত রেখে টের পেল সেখানে পানি। জিগ্যেস করল, মানে?

এত ঘুম আপনার?

কখন এলে?

এইমাত্র। নাম ধরে ডেকেছি। পায়ে শুড়াশুড়ি দিয়েছি। শেষে মুখে পানি ছিটাতে হলো। এ সময় কেউ ঘুমায়?

শরীরটা ভাল নেই।

বলে বাবর আবার শুয়ে পড়ল। ভেবেছিল বাবলি এসে পাশে বসবে। তারপর–তারপর আজকেই হয়ত প্রথম সেই সময় আসবে; বাবলি যখন ফিরে যাবে তখন অন্য মানুষ। কত দীর্ঘ দিন সে এর জন্যে অপেক্ষা করে আছে। একটু একটু করে এগুচ্ছে বাবলির অন্তরঙ্গতার দিকে।

কিন্তু বাবলি তার পাশে তো বসলই না, তার শরীর খারাপ বলে কোনো উদ্বেগও দেখাল না। তার বদলে সরাসরি বলল, এখন একটা ব্যবস্থা করুন।

আচ্ছা, একে কী বলে?

বাবর বাবলির কালো পাজামার দিকে আঙুল তুলে জিগ্যেস করল।

কেন, পাজামা?

আহা, একটা নাম আছে তো?

বেল বটম। — আমার কথাটা শুনুন না?

শুনছি। তোমার সব কথা শুনব। তার আগে একটা কথা বল। বাবর উঠে বসে কোলে একটা বালিশ জড়িয়ে বলে চলে, বেল বটম বলতে তোমাদের একটু কেমন, লজ্জা করে না।? বেল বটম পাজামা?

কেন? ওমা সে-কী!

অবাক হয়ে বাবলি একটা মোড়ার ওপর ধাপ করে বসে পড়ল।

লজ্জা করবে কেন?

মিটমিট করে হাসতে লাগল বাবর।

বলুন না, কী?

তুমি ইংরেজি মিডিয়ামে পড়ছ না?

হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে? আমি তো এখন বাংলা শিখছি।

আহা সে কথা নয়। সে তো আমি জানিই। তুমি এখন কী সুন্দর অ আ ক খ পড়তে পার। যাহ, আপনি ঠাট্টা করছেন। কী বলবেন তাই বলুন আর নইলে আমার কথা শুনুন। খুব বিপদে পড়েছি।

বিপদ?

বাবর ভাল করে বাবলির দিকে তাকাল। ঘাড় পর্যন্ত ছাটা চুল। মাথায় অসংখ্য চুলের চাঁদ এলাপাতাড়ি হয়ে আছে। শ্যামল লম্বাটে মুখটায় গালের ওপর উঁচু হাড়, অনেকটা বিদেশিনীদের মত। চিবুকটা পেস্ট্রীর প্রস্থের মত সরল ও চওড়া। চোখ সব সময় নাচ করছে যেন এইমাত্র মুখ ছেড়ে পালিয়ে যাবে। বিজ্ঞাপনের মত ঝকঝকে একসারি সুন্দর দাঁত সারাক্ষণ একটি হাসিকে ফ্রেম করে রেখেছে। এখানে কৈ, বিপদ তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না?

বাবর আবার জিগ্যেস করল, বিপদ? কোথাও প্রেম ট্রেম করছ নাকি?

যাহ!

বাবর বুঝতে পারে না, প্রেমের উল্লেখমাত্রে মেয়েরা এমন লজ্জিত, অপ্রতিভ হয়ে যায় কেন? তার আরো আশ্চর্য লাগে, সে দেখেছে, মেয়েরা যখন প্রথম নগ্ন হয়, যখন প্রথম তাদের সেই অভিজ্ঞতা হয়, পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তখন তাদের যে লজ্জা তা এর চেয়ে অনেক কম। তখন লজ্জার বদলে তাকে শংকা, থাকে শিহরণ, থাকে মিনতি, থাকে

সম্মোহন। কিন্তু লজ্জা? না। লতিফার কথা মনে পড়ে। প্রথম দিন, সেটা ছিল বিকেল, লতিফাকে এতটুকু লজ্জিত হতে সে দেখেনি। লতিফা ছিল চোখ বুজে। তার ঠোঁট জোড়া শাদা হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত শরীরকে পাথর করে একটা হাত দুই ঊরুর মাঝখানে শক্ত করে চেপে লতিফা বিছানায় আড়াআড়ি পড়েছিল একটি আয়তক্ষেত্রের নিখুঁত কর্ণের মত।

বাবর বলল, প্রেম নয়, তবে?

কী যে বলেন!

কার সঙ্গে কিছু হয়েছে?

আর কী হবে?

মানে, ডাক্তার দেখাতে হবে নাকি?

আমি চললাম। বাবলি উঠে দাঁড়াল। বাবর তাকে আটকে বলল, যাওয়া অত সোজা নাকি? বসো। লক্ষ্মী মেয়ের মত চুপ করে এখানে বসো। বলে তাকে প্রায় শূন্যে তুলে খাটের কোণায় বসিয়ে দিল বাবর। জিগ্যেস করল, চকোলেট খাবে? বিলেত থেকে এক বন্ধু দিয়েছে।

আপনি এখনো ঠাট্টা করছেন?

মোটেই না।

জানেন, আমি এই এপ্রিলে উনিশে পড়ব?

জানতাম না, জানলাম। তাতে চকোলেট খাবার বয়স চলে যায়নি। বরং চকোলেট টকোলেট খেলে একটু মোটা হবে। দেখতে ভাল হবে।

দেখতে আমি এমন কী খারাপ শুনি? আপনি যে লতিফার প্রশংসায় একেবারে গলে যান, তার চেহারা তো আমার চেয়েও বাজে। আর যা ধুমসি!

ভালুকের মত।

মুখে বলছেন। কিন্তু মন থেকে স্বীকার করেন না।

বাবর এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে চকোলেট এনে বাবলির কোলে ফেলে দিল। বলল, খাও। সব তোমার। এবার শুনি কী বিপদ?

বিশটা টাকা হবে? বাবলি ডান হাত তুলে আঙুলগুলো নাচাল, যেন নিজের দিকে সে কয়েকটা অদৃশ্য সুতো টেনে নিল তাঁতিদের মত।

বিশ টাকা! সে তো মেলা টাকা।

হবে কি-না বলুন।

হবে। দিন। চটপট দিন। আবার সামনের মাসে ভাইয়ার কাছ থেকে হাত খরচা পেলেই শোধ করে দেব।

ভাল কথা, তোমার ভাইয়া কোথায়?

কেন, অফিসে?

তাকে বল ফারুক এসেছে ঢাকায়।

ফারুক কে?

ও তুমি চিনবে না। আমরা ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে পড়াশোনা করেছি। তোমার ভাইয়া হতো ফাস্ট, ফারুক সেকেন্ড আর আমি বরাবর–

তাকে বাধা দিয়ে বাবলি অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল, টাকাটা পাব?

পাবে, পাবে।

আসলে বাবর চাইছিল বাবলি যেন চলে না যায়। ঐ যে তার মনে হচ্ছিল, আজকেই হয়ত সেই প্রথম দিন বাবলির সাথে, সেই সম্ভাবনাটা তাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। কিন্তু এটাও সে জানে এই মেয়েরা যৌবনে পা দিলেও, মনে মনে এখনো কিশোরী। তাদের কথা চটপট শোনা শেষ পর্যন্ত ভাল ফল দেয়।

বাবর টাকাটা বের করে দিল। খটাস করে ভ্যানিটি ব্যাগ বন্ধ হয়ে গেল। পায়ে স্যান্ডেলজোড়া ফের উঠে এলো। বাবলি বলল, ধন্যবাদ, যাই।

যাবে তো। যাবে তো বটেই। চকোলেটগুলো শেষ করে যাও।

পথে খাব। যেতে যেতে খাব।

ওটি হবে না। এখানে সব খেতে হবে।

কেন?

খেয়ে এক গ্রাস পানি খাবে। তারপর যাবে। নইলে দাঁতে পোকা লাগবে।

বাব্বা। আপনার সঙ্গে পারি না।

বাবলি আবার বসল। চিবোতে লাগল চকোলেট। দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে খয়েরি রং লাগল। তখন যেন তাকে আরো সুন্দর দেখাল। বাবলিকে এখনই যেতে দেয়া যায় না, বাবর ভাবল। কিন্তু কী করে? বাবর জিজ্ঞেস করল, টাকাটা কী হবে?

বলব না। সিক্রেট।

বল।

না।

বল।

বললাম তো, সিক্রেট।

এত সিক্রেট রাখতে নেই। এক আধজনকে বলতে হয়। তাতে সিক্রেট আরো জমে ভাল।

দূর।

বাবলি চকোলেট চিবোতে চিবোতে পা নাচাতে নাচাতে বলল।

তা হলে আমি রাগ করলাম।

বাবলি এবার আড়চোখে বাবরকে দেখল। তারপর খিলখিল করে হেসে উঠল। হঠাৎ বলল, বলছি, বলছি। এমন কিছু সিক্রেট না। সেদিন কলেজ থেকে চায়নিজ রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছিলাম। আমরা চারজন।

ছেলে না মেয়ে?

মেয়ে সাহেব, মেয়ে। ছেলেদের সঙ্গে আমি মোটেই বেরোই না। আমি ওদের হেট করি।

আমাকেও?

আপনি কী ছেলে?

তার মানে?

আপনি তো কত বড়? ভাইয়ার বন্ধু।

ও তাতো বটে, তারপর?

ভাইয়ার বন্ধু শুনে বাবর যেন একটু থেমে গেল। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য।

তারপর সবাই মিলে তো রাক্ষসের মত খেয়েছি। সবাই ভেবেছি সবার কাছেই টাকা আছে এক আমার কাছে ছাড়া। বিল দিতে গিয়ে মাথায় বাজ। পুরো সাতাশ টাকা বার আনা–আর সবার কাছে সব মিলিয়ে এগার টাকা সাতষট্টি পয়সা।

মাথা খারাপ! ঐ ভাবে খেতে যায়?

মজা শুনুন না। সবার মুখ তো শুকিয়ে এতটুকু। পাশে এক বুড়ো বসে খাচ্ছিল। বণি বলল, ওর কাছে চল ধার করি।

বণি কে?

আপনি চিনবেন না।

চিনিয়ে দিয়েছ নাকি যে চিনব?

আচ্ছা, একদিন নিয়ে আসব। তারপর বুড়োর দিকে আমরা চারজন এক সঙ্গে তোকালাম। বুড়ো হঠাৎ চোখ তুলে দেখে ড্যাবডোবে আটটা চোখ। সে বেচারা স্বপ্নেও ভাবেনি এ রকম করে আমরা তাকিয়ে থাকব। কেন? তাই দেখে তার গলার কাছে ঝুলঝুলে চামড়াটা থর থর করে কাঁপতে লাগল। আর আমাদের হাসি পেয়ে গেল।

সত্যি?

আমরা এক সঙ্গে হেসে উঠতেই বুড়ো আর পালাবার পথ পায় না। একবার এক চেয়ারের সঙ্গে, আরেক বার টেবিলের সঙ্গে–ধাক্কা! হাসতে হাসতে পেটের সব হজম।

খুব অন্যায়। বুড়োটার খাওয়া মাটি করে দিলে।

বারে, আমাদের কী দোষ। আমরা শুধু তাকিয়েছি–তার গলার চামড়া ওরকম নড়তে শুরু করল কেন?

তারপর বেরুলে কী করে?

বেয়ারাকে তিন টাকা বকশিস দিলাম। কাউন্টারে চীনে ব্যাটা বিমোচ্ছিল। তাকে আট টাকা দিয়ে বললাম, কুড়ি টাকা কাল দিয়ে যাব। বলে চারজন লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে এলাম। চীনেটা কিছু বলল না?

বলবে কী? তার বলবার আগেই আমরা দরোজার বাইরে।

ছি ছি ছি।

কী ছি ছি? আমরা তো টাকা মেরে দিচ্ছি না? এক্ষুণি যাবার পথে এই কুড়ি টাকা তার মুখের ওপর ফেলে দিয়ে আসব।

আমাকে একটা টেলিফোন করলেই তো হতো।

তা হতো। আপনার কথা মনেই হয়নি।

তা হবে কেন? আমার কথা তো মনে হবে না। বলে বাবর লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। শুয়ে চোখ বুজল। ভান করল যেন মনে খুব লেগেছে তার কথা মনে হয়নি বলে। হঠাৎ সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল। বাবলি তার পায়ের বুড়ো আঙুল ধরে টানছে।

এই যে, কী হলো?–শুনুন।–আচ্ছ। এরপর কখনো এ রকম হলে নিশ্চয় ফোন করব। — কই, শুনুন।

চোখ মেলে মিষ্টি করে হাসল বাবর। নিঃশব্দে। তারপর বাবলির একটা হাত নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, তুমি মনে করেছ, আমি রাগ করেছি, না? পাগল মেয়ে, আমার কি সে বয়স আছে?–একেক সময় কী ভাবি জান?

কী?

বাবর লক্ষ করল বাবলির গলা অত্যন্ত সূক্ষ্ম তারে যেন কেঁপে উঠল। এতে সে খুশিই হলো মনে মনে। বলল, ভাবি, আমার বয়স দশ বছর কম হলো না কেন? কিংবা তুমিও তো আরো দশ বছর আগে হলে পারতে।

বাবলি মাথাটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে অনির্দিষ্ট চোখে একবার তাকিয়ে হঠাৎ বলল, তখন বেল বটমের কথা কী বলছিলেন?

মনে মনে হাসল বাবর। বাবলি ঠিকই বুঝতে পেরেছে। তাই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইছে। বাবর আরো কিছুক্ষণ নিঃশব্দে খেলা করল বাবলির আঙুল নিয়ে। তার কড়ে আঙুলটা আলতো করে মুচড়ে দিল। কেমন লাল হয়ে উঠল আঙুলটা এক পলকের জন্যে।

লাগছে বাবলি?

বাবলি মাথা নেড়ে জানাল–না। তখন আবার এমনি করে দিল বাবর।

বললেন না, বেল বটমের কথা?

বাবর সন্তর্পণে হাত রাখল, বাবলির ঊরুর ওপর। তারপর এক চিমটি পাজামা তুলে সে বলল, এর নাম বেল বটম পাজামা?

বাবলি মাথা নাড়াল–হ্যাঁ।

বেল বটমের বাংলা জান?

নাতো।

মানে, যার নিচ দিকটা ঘন্টার মত।

গোল ঘন্টা?

হ্যাঁ।

বলতে বলতে বাবর করতল দিয়ে বাবলির হাঁটুর নিচে গোঁড়ালি পর্যন্ত স্পর্শ করে বলল, এই পাজামার নিচের দিকটা চওড়া তো, অনেকটা ঘন্টার মত, তাই বেল বটম বলে।

জানি।

কিন্তু ইংরেজিতে বটমের আরেকটা মানে আছে।

কী?

বলেই বাবলি লজ্জায় চোখ নামিয়ে ফেলল। এক মুহূর্তে অর্থটা তার মনে পড়ে গেছে। আর সে জানতে চায় না। কিন্তু বাবর ততক্ষণে তার পেছনে করতল দিয়ে ব্রাশ করতে করতে বলছে, বটম মানে এটা। বাংলায় একটা সুন্দর শব্দ আছে। নি-ত-ম্ব। মানে বটম। তাই বলছিলাম, বেল বটম বলতে একটু লজ্জা করে না তোমাদের?

কোনো উত্তর দিতে পারল না বাবলি। নিঃসাড় নিষ্পন্দ হয়ে বসে রইল। কিন্তু হাত আর সরিয়ে নিচ্ছে না বাবর। অনেকক্ষণ। অথচ ওঠাও যাচ্ছে না।

বাবর তার পেছনে দুটো মৃদু চাপড় দিয়ে বলল, তুমি খুব সুন্দর হয়েছ। বলে সে তাকে কাছে টানল। মুরগির তুলতুলে একটা বাচ্চার মত বাবলি তার বুকের মধ্যে পড়ে হাঁফাতে লাগল চোখ বুজে। এইটুকু কাছে পাওয়া যতটা শক্ত হবে বলে বাবর ভেবেছিল তার চেয়ে সহজে হয়ে গেল। বহুবার বাবর এটা দেখেছে, আসলে একটু সাহস করলেই হয়, হয়ে যায়, তবু বারবার, প্রথম বার, এত কঠিন মনে হয়, যেন এর চেয়ে বাঘের বাসায় যাওয়া অনেক সোজা।

বাবর তাকে চুপচাপ বুকে নিয়ে শুয়ে রইল। এতটুকু নিজেকে সে নড়াল না। বাবলি অনেকক্ষণ পড়ে থেকে বলল, এখন যাই।

না। আরো একটু থাক।তোমাকে একটু দেখি। বলে সে তার মুখ তুলে ধরল। খুব আস্তে একটা চুমো দিল তার চোখে। বলল, চোখ বুজে থাক।

চোখ বুজেই ছিল বাবলি, কিন্তু এই কথা শুনে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল বাবরের হাতের ওপর দিয়ে। সেইভাবে থাকতে থাকতে কী হলো তার, হঠাৎ বাবলি বাবরকে ঠোঁটে দ্রুত একটা চুমো দিয়ে বুকের মধ্যে মুখ লুকাল।

বাবর বলল, ভয় কী? আমি তো তোমার। এখন থেকে তোমারই। সব সময়ের জন্যে।

এবার বাবরই তাকে চুমো দিল, দীর্ঘক্ষণ ধরে পাতলা দুটি ঠোঁট সে সুখাদ্যের মত খেল। তারপর কামিজের একটা বোতাম খুলে বাবলিকে উপুড় করে তার পিঠে ঠোঁট রাখল। ঠোঁটে সুড়সুড়ি দিতে লাগল বাবলির পিঠের প্রায় অদৃশ্য পশমগুলো।

বাবলি বলল, যাই।

না, থাক। তোমার পিঠে তিল আছে?

হ্যাঁ।

একটা চুমো দিই তিলে? বাবলি কিছু বলল না। বাবরকে তার ইচ্ছে রাখতে দিল। বাবর মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, আরো তিল আছে?

হ্যাঁ।

দুটো বোতাম একসঙ্গে খুলে ফেলল বাবর। প্রায় কোমর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

কই আর তো দেখছি না?

বাবলি চুপ করে রইল।

কই, আর তিল কই? তুমি বললে যে আছে?

এখানে নেই।

তাহলে সামনে?

বলে বাবর তাকে সামনে ফেরাতে চেষ্টা করল। কিন্তু উপুড় হয়ে শক্ত করে নিজেকে ফেলে রাখল বাবলি। মাথা নেড়ে মুখে শুধু বলল, না।

তখন জোর করে তাকে ফেরাল বাবর। ফেরাতেই শাদা কাচুলির ভেতরে অপুষ্ট একজোড়া স্তন কেঁপে উঠল। বাবর তাদের আবরণ সরিয়ে সেখানে মুখ রেখে ধীরে ধীরে আরোহণ করতে লাগল যেন ছিপছিপে একটা পেয়ারা গাছে। যখন সম্পূর্ণ সে পেল তাকে তার নিচে, সে চুপ করে রইল। নিঃশব্দে স্ফীত হতে লাগল। কিন্তু আজ নয়। প্রথম দিনে নয়। বাবর সময় নিতে ভালবাসে। সময় নেবার পর যখন পাওয়া যায়।

তখন আর সময় নেয় না। তখন তার মনে হয় ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নিঃশেষ হয়ে ফিরে আসে।

শেষ একটা চুমো দিয়ে এবার বাবর নিজেই বলল, বাড়ি যাও, কেমন?

বাবলি উঠে বসে বোতাম লাগাল কামিজের। কোনো কথা বলল না। বাথরুমে গেল। ফিরে যখন এলো, মুখ সাবান দিয়ে ধুয়েছে, একটু পাউডার দিয়েছে। কিন্তু মুখে একটা নতুন ছাপ। কেমন এলানো, মন্থর, নিঃশব্দ। সে বেরিয়ে আসতেই বাবর একটু হেসে বলল, পৌঁছে দেব?

না। আমি নিজেই যেতে পারব।

রিকশা ডাকিয়ে দি।

আমি নিয়ে নেব।

যাবার সময় আমাকে একটা চুমু দিয়ে যাও।

বাবলি চুপ করে রইল।

এসো।

বাবলি নড়ল না। তাকিয়ে রইল আপলক চোখে বাবরের দিকে।

এসো বাবলি।

বাবলি হঠাৎ এসে বাবরের কানের কাছে মুখ রাখল আলতো করে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। দরোজার দিকে যেতে যেতে শুধু বলল, আপনার তো কোনো ক্ষতি নেই। ক্ষতি শুধু আমার।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বাবর চমকে উঠল। পাঁচটা বাজে।

৪. মিসেস নাফিস

মিসেস নাফিস বললেন, যাহোক আসা হলো তাহলে?

আপনি কী ভেবেছিলেন?

সত্যি বলব না মিথ্যে? আপনি যা বলবেন তা-ই আমি সত্যি বলে মেনে নেব।

যদি সত্যি বলি, ভেবেছিলাম। আপনি আসবেন না। আর আপনি যে আসবেন, সেটা মিথ্যে মনে হচ্ছিল।

বাবর হাসল, টাইয়ের নট ঠিক করল আন্দাজে, বিরল হয়ে আসা চুলের ভেতর হাত চালাল খানিক, হাসল আবার, একটা সিগারেট বের করল এবং বলল, আমি তো এলাম। বলে সিগারেট ধরাল। তারপর হঠাৎ জিগ্যেস করল, আপনি কখনো সিগারেট খেয়েছেন?

এ-কী জিগ্যেস করছেন?

বলুন না।

যদি বলি খেয়েছি।

যদি বলি কেন? খেয়েছেন তো খেয়েছেন! এখনো খান?

কী করে বুঝলেন?

হঠাৎ মনে হলো।

আপনি মানুষের মন পড়তে পারেন?

পারি না। পারলে দাবি করা হতো মন পড়ার বিজ্ঞান আছে। আসলে কিন্তু নেই। মনের কোনো হিসেব হয় না। মন মনের মত চলে। নাফিস সাহেব কোথায়?

হাসপাতালে।

প্রায় লাফ দিয়ে উঠল বাবর। বলল, কই আমাকে আগে বলেননি তো। কী হয়েছে তার? কবে থেকে?

তার কিছু হয়নি। তার মামার আজ অপারেশন। চোখের।

ও, তাই বলুন।

ফিরতে রাত হবে।

বাবর তার দিকে চোখ গভীরতর করল। ঘন সবুজ শাড়ি পরেছেন মিসেস নাফিস। একই রংয়ের ব্লাউজ। কপালে সবুজ টিপ। পায়ের স্প্যান্ডেলে সবুজ ফিতে। হাসছেন যখন, মনে হচ্ছে দাঁতেও সবুজের একটু আভা দিচ্ছে।

তাকিয়ে আছেন যে।

না, একটা সিগারেট খাবেন?

থাক, ইচ্ছে করছে না।

আচ্ছা, আপনি মদ খেয়েছেন কখনো?

মদ?

হ্যাঁ মদ। লিকার।

না, খাইনি।

খাবেন একদিন?

নিমন্ত্রণ না পরামর্শ?

খানিকটা নিমন্ত্রণ তবে অনেকটা পরামর্শ।

হঠাৎ এ পরামর্শ দিচ্ছেন?

তাহলে ভাল হতো।

কী ভাল হতো।

মনে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য পেতেন।

আপনি বুঝি তাই খান।

হ্যাঁ, তার জন্যেই খাই। কিন্তু উদ্দেশ্যটা শেষ পর্যন্ত গুলিয়ে যায়। মাতাল হয়ে পড়ি। ঘুম পায়। পরদিন মাথা ধরে। তখন মনে হয় অসুস্থ হবার জন্যেই খেয়েছিলাম।

তাহলে খান কেন?

খাই কেন? শরীরটা বেয়াড়া রকমে সুস্থ। মাঝে মাঝে অসুস্থ হওয়া, এভাবে হওয়া, মন্দ কী? অসুস্থ হলে সুস্থতা কী, তা ভাল বোঝা যায়।

অর্থাৎ আপনি ভালকে জানতে মন্দের আশ্রয় নেন।

হ্যাঁ, নিই।

আপনি পাপ করতে পারেন?

পারি। পাপীই জানে পুণ্য কী!

সব পাপী তো জানে না। জানে না। কারণ পাপী দুরকমের। শুধু পাপী আর জ্ঞান-পাপী। আপনি তাহলে জ্ঞান-পাপী।

হ্যাঁ, তাই।

আপনি এখন মদ খেয়ে আসেননি তো? না। হ্যাঁ, খেয়েছি বলতে পারেন।

সেটা কী রকম?

ধরে নিন খেয়েছি। বাবর মনে মনে ভাবল, মিসেস নাফিস কী জানবেন, এই কিছুক্ষণ আগে সে কোন নেশা

করে এসেছে? বাবলি যতক্ষণ ছিল বুঝতে পারেনি। চলে যাবার পর বাবরের মনে হচ্ছিল সে যেন কয়েক পেগ কাঁচা হুইস্কি গিলেছে।

মিসেস নাফিস বললেন, আমি ঠিকই ধরেছি, এই বিকেল বেলায় আপনি হুইস্কি গিলে এসেছেন। কেন ওসব খান?

শরৎচন্দ্রের পরামর্শে খাই না। নিজেকে ডাইলান টমাস মনে করেও খাই না। ডাইলান টমাস কে?

কবি।

আপনি কবিতা লেখেন না কেন?

এটা প্রশ্ন হলো না। আমি কেন তাহলে রাজনীতি করি না, কেন আমি গান গাই না, কেন আমি বিয়ে করি না–

সত্যি, কেন বিয়ে করেন না?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বাবর জের টেনে চলল, কেন আমি সাংবাদিকতা করি না, এ রকম পৃথিবীর এক লক্ষ একটা কাজ কেন করি না–এর কোনো জবাব নেই।

মিসেস নফিসের একবার মনে হলো, লোকটা বড় রূঢ়। তিনি আনমনা হলেন। বাবর জিগ্যেস করল, আপনার বড় ছেলে কই? কী যেন নাম?

হাসু। সাইকেল চড়া শিখতে গেছে। আপনার টিভি প্রোগ্রামের খুব ভক্ত।

আমি জানি।

আচ্ছা, সেদিন যে ধাঁধাটা দিলেন তার উত্তরটা কী?

কোন ধাঁধা?

ঐ যে বললেন, এক মহিলা, দুটো ট্রাঙ্ক, একটা বেড়িং, কয়েকটা হাঁড়ি, একটা মাটির উনোন আর কী কী নিয়ে, কোলে একটা বাচ্চা, হাসিমুখে ট্রেনে চড়ছে। সে বাপের বাড়ি থেকে আসছে না যাচ্ছে? বলুন না, কী উত্তর হবে?

সামনের সপ্তাহ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তখন আমিই টিভিতে বলে দেব।

বারে, তাহেল আপনার সঙ্গে আলাপ থেকে লাভ?

আমার সঙ্গে শুধু ধাঁধার উত্তর জানা পর্যন্তই সম্পর্ক?

না, তা নয়। কী যে বলেন। তা কেন হবে?

তাছাড়া এখন উত্তর বলে দিলে নিয়ম ভঙ্গ করা হবে। নীতি বলে একটা কথা আছে তো? কত লোক উত্তর পাঠাবে, সঠিক উত্তরগুলো থেকে লটারি করে পুরস্কার দেওয়া হবে। এখন উত্তর বলে দিলে আমার নিজের কাছেই খারাপ লাগবে।

আপনি উত্তর বললে তো আর আমি টিভিতে পাঠাতে যাচ্ছি না। আর পাঠালেও আমার নাম লটারিতে কোনোদিনই উঠবে না।

কী করে বলছেন?

আমি জানি। আমার ভাগ্যে হঠাৎ কিছু পাওয়া নেই।

বাবর তার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। পরে বলেল, এ কথা কেন বলছেন?

এমনি বলছি। কিছু না। আপনাকে চা দিই। কতক্ষণ এসেছেন।

চা থাক।

ও ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনি ড্রিংক করে এসেছেন।

বাবর তার ভুল ভাঙ্গাবার উৎসাহ পেল না। বরং পা দুটো সামনে লম্বা করে দিয়ে আয়েশ করে বসে মিসেস নফিসের অনুমানের অভিনয় করে যেতে লাগল।

মিসেস নাফিস হঠাৎ নিঃশব্দে হাসলেন। অনেক সময় অনেকে এটা আমন্ত্রণ হিসেবে ব্যবহার করেন; অর্থাৎ আমাকে প্রশ্ন কর আমি কেন হাসছি। বাবর সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করল না। তার সমস্ত মন এবং চোখ আচ্ছন্ন করে আছে। বাবলির শ্যামল ছিপছিপে দেহ। যা কিছুর ঘ্রাণ নিচ্ছে তার অন্তঃস্থল থেকে বাবলির ঘ্রাণ পাচ্ছে।

মিসেস নাফিস বললেন, চুপ হয়ে গেলেন যে!

এমনি। আপনার বসবার ঘরটা ভাল। সুন্দর।

ধন্যবাদ।

নাফিস সাহেব কোথায়?

বললাম না হাসপাতালে?

ও ভুলে গিয়েছিলাম।

আচ্ছা আপনি তো টিভিতে কাজ করেন, ওদের বলতে পারেন না প্রোগ্রামগুলো একটু ভাল করতে?

পারি না।

কেন?

আচ্ছা ওখানে কাজ করি না। ওদের চাকরি করি না। ওরা কী প্রোগ্রাম করবে না করবে: সেটা আমাকে জিগ্যেস করে না।

বাহ, সবাই তো আপনার বন্ধু। ওদের না হয় বন্ধু হিসেবেই পরামর্শ দিলেন।

আমার কী মনে হয় জানেন?

কী?

বন্ধুত্ব এ যুগের সবচে বিরল বস্তু। বন্ধুত্ব নেই বলেই যত্রতত্র আমরা বন্ধু শব্দটা ব্যবহার করে থাকি।

আজ কতটা হুইস্কি খেয়েছেন বলুন তো!

আপনি তো খান না, কাজেই শুনে আন্দাজ করতে পারবেন কি?

আন্দাজ না করতে পারলেও শুনতে ক্ষতি কী?

ও, তা বটে।

এই যে সেদিন চাঁদে মানুষ নামল, কত কী রিপোর্ট বেরুল, সবটা কী বুঝতে পেরেছি? না কেউ পেরেছে? তবু মানুষ শোনার জন্যে রাত জেগে রেডিও-র পাশে বসে থাকেনি?

থেকেছে। থেকে তারা এটুকুই শুনেছে মানুষ চাঁদে নেমেছে। আপনিও তো শুনেছেন, আবার না হয় শুনুন, আমি আজ মধ্যপান করেছি।

কথায় আপনার সঙ্গে কে পারে?

বাবর হাসল।

মিসেস নফিসের তখন রাগ হলো আরো বেশি। তিনি বললেন, কথা বলে আপনি পয়সা পান। খামখা এত ভাল ভাল কথা বিনি। পয়সায় ছাড়ছেন কেন?

এটা টিভি স্টুডিও নয়।

যাক, বাঁচা গেল। আমি তো ভাবছিলাম। আপনি এটা টিভি স্টুডিও মনে করে বসে আছেন।

হা হা করে হেসে উঠল বাবর।

হাসলেন যে!

এমনি।

না, বলতে হবে কেন হাসলেন। হাসি সব সময় মানসিক কারণে হয় না। কখনো কখনো শুদ্ধ শারীরিক কারণে, পেশি নার্ভ ইত্যাদির অকারণ সহসা কোনো নতুন সংস্থাপনেও হাসি পায়। আপনি এরপর টিভিতে শরীরটাকে ভাল রাখুন। প্রোগ্রামও করবেন নাকি?

করতে পারি। অন্তত আমার কোনো আপত্তি নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ঐ ডাক্তারদের চেয়ে অনেক সরস করে বলতে পারব।

এখান থেকে ফিরে গিয়ে আবার হুইস্কি খাবেন?

বলতে পারি না। আপনার তো সব কিছুই আগে থেকে হিসেব করা থাকে। কেন বলতে পারবেন না? বলতে

সংকোচ হচ্ছে?

সংকোচ শব্দটা আমার অজানা।

আর কোন কোন শব্দ আপনার অজানা শুনি?

আরো অনেক আছে। যেমন, শোক, বিবাহ, ভালবাসা।

কাউকে কখনো ভালবেসেছেন?

হ্যাঁ বেসেছি।

বেসেছেন?

হ্যাঁ।

নাম বলতে আপত্তি আছে?

না, নেই।

কে সে?

আমি নিজে।

বাবর রসিকতা করল কি-না বুঝতে পারলেন না মিসেস নাফিস। তিনি অনির্দিষ্ট চোখে তাকিয়ে রইলেন প্রথমে বাবরের মুখে, তারপর তার হাতের দিকে, যে হাত দুটো ম্যাচের শূন্য খোল নিয়ে খেলা করছিল।

বাবর জিগ্যেস করল, নাফিস সাহেব কোথায়?

বললাম না হাসপাতালে?

সত্যি আমি দুঃখিত। ভুলে যাচ্ছি।

আমার কী মনে হয় জানেন, নফিসকে আপনি ঠিক পছন্দ করেন না।

কেন?

অবশ্যি আমিও ওকে ঠিক পছন্দ করি না, করতে পারি না, এই তের বছরেও ঠিক পেরে উঠিনি।

তের বছর বিয়ে হয়েছে আপনাদের?

হ্যাঁ, উনিশ শো ছাপ্পান্নতে বিয়ে হয়েছিল। তেরাই তো হলো। হ্যাঁ তের হলো। বিয়ে ঢাকাতেই হয়েছিল?

ঢাকাতেই।

আচ্ছা, আমি এখন চলি।

সে-কী, এখুনি যাবেন?

কাজ আছে।

তবে যে বললেন আজ আর কাজ নেই।

বলেছিলাম নাকি?

ভেবে দেখুন।

বোধহয় বলিনি। কিংবা বলেছি। চলি।

বাবর উঠে দাঁড়াল। উঠে দাঁড়ালেন মিসেস নাফিসও। কী ভেবে বাবর আবার বসল। বলল, না হয় এক পেয়ালা চা দিন। চা খেয়েই যাই।

খাবেন?

না, না, চা খেলে নেশা নষ্ট হবে না।

মিসেস নাফিস উঠে গেলেন চা করতে। আর বাবর বসে বসে ভাবতে লাগল বাবলির কথা। কাজী সাহেবকে সে বলেছিল, তার মেয়ে আছে, মেয়ের নাম বাবলি বাবর। চাঁদের মত একটা হাসি তার ঠোঁটে জন্ম নিল। বাবলিকে কাল আবার আসতে বলতে হবে। এখান থেকে বেরিয়ে বাবলিকে একবার দেখতে গেলে হয়। যাবে সে।

চা নিয়ে এলেন মিসেস নাফিস।

এমন সুন্দর চায়ের জন্য ধন্যবাদ।

এই চা পাঠিয়েছিল শ্রীমঙ্গল থেকে ওর এক বন্ধু। একেবারে বাগানের। ভারি সুন্দর ঘ্রাণ। আরেক কাপ দিই?

না।চলি। আবার আসব।

বাবর মিসেস নাফিসকে একা ফেলে বেরিয়ে গেল দ্রুতপায়ে গাড়ির চাবিটা বানাৎ ঝনাৎ করে বাজাতে বাজাতে। শব্দটা আগুন ধরিয়ে দিল মিসেস নফিসের সারা দেহে। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে একবার উচ্চারণ করলেন, রাস্কেল। তারপর তার কান্না পেল। তিনি মানসিকভাবে কাঁদলেন।

বাইরে বাবরের গাড়িটা অট্টহাস্যের মত কয়েকটা শব্দ তরঙ্গ তুলে অনেক ধ্বনির মধ্যে মিলিয়ে গেল।

৫. উদ্দেশ্যবিহীন কিছুক্ষণ

গাড়ি নিয়ে উদ্দেশ্যবিহীন কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল সে। একবার মনে হলো তার ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খাওয়া দরকার। কিন্তু উৎসাহ পেল না। কোন হোটেলে বসবে, অর্ডার দেবে, অপেক্ষা করবে, খাবার আসবে–বড় দীর্ঘ মনে হলো ব্যাপারটা। ইন্টারকন্টিনেন্টালের মোড়ে একটা লোক রঙ্গীন তুলোয় তৈরি সিংহ বিক্রি করছে।

কত দাম?

আপনার জন্যে দশ টাকা।

একবার ভাবল, কেনে। আবার ভাবল, কিনে কী হবে? ট্রাফিকের নীল বাতি জ্বলে উঠল। বাবর বেরিয়ে গেল।

কোথায় যাবে সে? বাবলিকে কাল একবার আসতে বলা দরকার। কিন্তু এখুনি ওদের বাসায় যাওয়াটা খুব সমর্থনযোগ্য বলে মনে হলো না।

ঢাকা ক্লাবের সামনে ভেতরে অসংখ্য গাড়ি। মিষ্টি একটা বাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছে। গতি শ্লথ করল বাবর। বড্ড একা লাগছে। কোথাও কাউকে পেলে হতো। অনেকদিন এমন একা মনে হয়নি।

কেন একা লাগছে?

বয়স হয়ে যাচ্ছে তার?

না, তাও তো নয়।

নিজের সঙ্গেই কথা বলে বাবর। মনে মনে। আবার আপন মনেই হাসে। এইতো এখনো একেবারে কালকের কথা মনে হয়, সে ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে বই বগলে ইস্কুলে যাচ্ছে। মহিতোষ বলে এক দুর্দান্ত ছেলে ছিল, দুক্লাশ ওপরে পড়ত। তার পেছনে কী লাগাটাই না লেগেছিল মহিতোষ। খারাপ খারাপ কথা বলত। ইস্কুলের পেছনে ভাঙ্গা পায়খানায় নিয়ে প্যান্ট খুলতে চাইতো তার।

ছেলেবেলায় দেখতে বোধ হয় আমি গোলগাল সুন্দর ছিলাম, ভাবল বাবর। নিজের অজান্তেই এক হাতে নিজের চিবুক নিয়ে খেলা করতে লাগল সে। তোপখানার মোড়ে আবার লাল বাতি। আর একটু হলেই সামনের গাড়িতে ধাক্কা লাগত। গাড়ির ট্যাক্স দেবার সময় হয়ে এসেছে। কাল মনে করতে হবে। আবার সেই ভাঙ্গা পায়খানার ছবি ভেসে উঠল তার চোখে। মনে পড়ল ছেলেবেলায় সেই ভাঙ্গা পায়খানায় গেলেই কেমন গা শিরশির ছমছম করে উঠত। দেয়ালের লেখাগুলোও স্পষ্ট দেখতে পায় সে।

বাবুল + মন্টু।

মন্টু যেন কে ছিল? কিছুতেই মনে করতে পারল না বাবর।

৮০ তবে। B-দায়।

মৃদু হাসি ফুটে উঠল বাবরের ঠোঁটে।

আবার আর এক দেয়ালে কয়লা দিয়ে একটা বিরাট সঙ্গম উদ্যত শিশ্নের রেখাচিত্র। চিত্রকর যত্ন করে অন্ডকোষ আর কেশ পর্যন্ত এঁকেছে। একটি অণ্ডকোষে লেখা মালতি, আরেকটিতে বাবাগো। তার নিচে দ্বিতীয় কেউ মন্তব্য করে রেখেছে শালা।

বাবর কিছুতেই মনে করতে পারল না সেই ভদ্রলোকের নাম যিনি লণ্ডনের বিভিন্ন শৌচাগার আর দেয়ালের ছবি তুলে দেয়ালের লিখন নামে একটা অ্যালবাম বের করেছিলেন। তাতে কত রকম মন্তব্য! রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত, দাম্পত্য যৌন-বিকার সম্পর্কিত— কী না বাদ গেছে। ও রকম একাকী জায়গায় মানুষ তার ভেতরের সত্তাটিকে বের করে আনে। গা শিরশির করে। হাত নিসপিস করে। লেখা হয়ে গেলে এমন একটা তৃপ্তি হয় যেন পরম আকাঙ্ক্ষিত কোনো গন্তব্যে পৌঁছুন গেছে।

বাবর নিজেও তো এ রকম করেছে। দেয়ালে লিখেছে। একবার সেক্রেটারিয়েটের বাথরুমে গিয়ে দেখে বাঞ্চোৎ লেখা। সিগারেট টানছিল বাবর। প্রথমে সিগারেটের ছাই দিয়ে চেষ্টা করল, কিন্তু লেখা গেল না। তখন চাবি দিয়ে সে বাঞ্চোৎ-র পাশে একটা বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকল। নিচে লিখল, কে? তুমি, না তোমার বাবা? আরেকবার

এয়ারপোর্টের বাথরুমে দেখে কে লিখে রেখেছে। লাল পেন্সিল দিয়ে বড় বড় হরফে–খেলারাম খেলে যা।

বাক্যটা আজ পর্যন্ত ভুলতে পারেনি বাবর। যে লিখেছে জগৎ সে চেনে। যে লিখেছে সে নিজে প্রতারিত। পৃথিবী সম্পর্কে তার একটি মাত্র মন্তব্য বাথরুমের দেয়ালে সে উৎকীর্ণ করে রেখেছে–খেলারাম খেলে যা।

কতদিন বাবর কানে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে কথাটা।

হা হা করে হেসে উঠল। কারা যেন। বাবর তাকিয়ে দেখে সে ডিআইটি বিল্ডিংয়ে এসে গেছে। আসতে চায়নি, অবচেতন মন তাকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে। সামনের বাগানে রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে কয়েকজন জটলা করছে। ঐ হাসির উৎস ওখানেই।

গাড়ির দরোজা ভাল করে বন্ধ করে বাবর নামল। এসে যখন পড়েছে তখন টেলিভিশন স্টুডিওটা একবার ঘুরে যাওয়া যাক।

সিঁড়ির ওপর মনে হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভিড়। আজ বোধহয় ওদের প্রোগ্রাম ছিল। উত্তেজিতভাবে ওরা হাত নাড়ছে, কথা বলছে, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। একজন বাবরকে সালাম দিল।

কী ছিল আপনাদের?

বিতর্ক।

ভিটিআর হলো?

হ্যাঁ, এইমাত্র শেষ করলাম।

কেমন হয়েছে?

ছেলের দল সলজ্জ হেসে নীরব রইল।

আচ্ছা, আবার দেখা হবে।

বাবর যেতে যেতে শুনল পেছন থেকে ওদেরই কে মন্তব্য করল, ডাট দেখিয়ে গেল, বুঝলি?

রিসেপশনে দাঁড়িয়ে বাবর জিগ্যেস করল, আমার কোনো চিঠি আছে?

আছে, এই এক গাদা।

প্রায় শখানেক চিঠি ভদ্রলোক বের করলেন। বাবর বলল, এগুলো তো সব ধাঁধার জবাব। আমার নিজের নামে কিছু নেই?

বলতে বলতে সে চিঠিগুলোর ঠিকানা দ্রুত দেখতে লাগল। না, তার ব্যক্তিগত নামে কোনো চিঠি নেই। একই হাতের লেখায় তিনটে খাম। বোধ হয় উৎসাহটা বেশি, যে করেই হোক সঠিক উত্তর একটা করতেই হবে। হ্যাঁ, এই যে তার নামে একটা চিঠি।

চিঠিটা সে আলাদা করে নিয়ে বাকি চিঠিগুলো ফেরত দিল। নীল খাম। মেয়েলী হাতের লেখা। ভেতরে পুরু কাগজে লেখা চিঠি। ওপর থেকেই খাস খস করছে। চিঠিটা বের করল বাবর।

শ্রদ্ধাস্পদেষু, আপনার মারপ্যাঁচ নামক ধাঁধার অনুষ্ঠানটি আমাদের খুবই ভাল লাগে। আমি এতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করি। গত সপ্তাহে আমার উত্তর সঠিক হয়েছিল। কিন্তু আপনি আমার নাম ভুল উচ্চারণ করেছেন। আমার নাম মোফসেনা নয় মোহসেনা। আশা করি এবারের অনুষ্ঠানে নামটি শুদ্ধ করে দেবেন। তসলিম। মোহসেনা খাতুন। এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

হেসে চিঠিটা পকেটে রেখে দিল বাবর। নামের জন্য মানুষের কী দুর্বর মোহ। না হয় একটু ভুলই হয়েছে, তার জন্যে কী জগৎসংসার থেমে গেছে? কাজ করছে না? কিন্তু এমন ভুল হলো কী করে তার? প্রোগ্রামের আগে তো সে তেমন মদ্যপান করে না যে সব হ য ফ হয়ে যাবে!

স্টুডিও করিডরের দরোজা ঠেলতেই এক পাল বাচ্চা মেয়েদের মধ্যে গিয়ে পড়ল বাবর। তাদের পরনে সিল্কের রঙ্গিন ঘাগরা। মাথায় রূপালি সোনালি ফিতে। মুখে মেকআপের গোলাপি প্রলেপ।

তোমরা নাচবে নাকি? বাবর জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ। পরীর দেশে নাচ আছে আমাদের। ফুটফুটে একটা মেয়ে সুন্দর জবাব দিল তার। ভারি ভাল লাগল বাবরের।

তোমার নাম কী?

হেসে গড়িয়ে পড়ল মেয়েটা।

বারে নাম জিজ্ঞেস করলে হাসতে আছে নাকি?

আরো হাসতে লাগল এবার।

তাহলে তোমার নামই নেই। তাই না?

তখন আরেকজন ওর হয়ে উত্তর দিল, ওর নাম রুনু। আপনি ধাঁধার আসর করেন না?

নাতো! বাবর মুখ গোল করে বলল, কে বলল আমি ধাঁধার আসর করি? আমি তো নাচ দেখাই টেলিভিশনে দ্যাখোনি?

যাহ।

সত্যি।

এরপর যেদিন আমার প্রোগ্রাম আছে, দেখ আমি নাচ করি কি-না। বলে সে স্টুডিও-র ভেতর ঢুকল। সেখানে আর্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা দৃশ্যপট তৈরি করছে। বুলিয়ে দিচ্ছে মেঘ। মেঘ থেকে বৃষ্টির আভাস হিসেবে রূপালি জরি ঝলমল করছে। আর দশ মিনিট পরেই পরীর দেশে শুরু হবে। প্রযোজক ছুটোছুটি করছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন। আবার শূন্যের উদ্দেশে বাচ্চাদের মেকআপ হয়েছে? প্রশ্নটা থেকে থেকে ছুঁড়ে দিচ্ছেন। কারো অন্য কোনোদিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশ নেই।

বাবার চুপচাপ এককোণে দাঁড়িয়ে রইল। এক নতুন ঘোষিকা এরই মধ্যে ঘোষণাপত্র হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে মুখস্থ করছে আর হাঁটছে। বাবরের দিকে একবার তার চোখ পড়তেই সে হাসল। উত্তরে প্রশস্ততার হাসি আঁকল বাবর। ঘোষিকা হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছুটে গেল তার বুথের দিকে।

বাবর বেরিয়ে এলো।

আজ বড্ড একা লাগছে তার। অনেকদিন এ রকম মনে হয়নি। মনে হচ্ছে, তার ভীষণ একটা কিছু হতে যাচ্ছে; সেটা ভাল না মন্দ তা বোঝা যাচ্ছে না।

করিডরের দরোজার কাছে প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাহেবের সাথে দেখা। এই যে বাবার সাহেব।

কেমন, ভাল?

এসেছেন, ভালই হলো। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

অপেক্ষা করি?

হ্যাঁ, আমার ঘরে গিয়ে বসুন। আমি দুমিনিটে আসছি।

বাবর তার ঘরে গিয়ে বসল। কমলা রংয়ের সরাসরি লাইন টেলিফোনটা জ্বলজ্বল করছে একরাশ কাগজপত্রের ভিড়ে। করবে নাকি একটা টেলিফোন বাবলিকে? বাবর সিগারেট ধরাল। কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। বাবলির পিঠের তিলটা হঠাৎ চোখে ভেসে উঠল তার। আর সেই সঙ্গে অস্পষ্ট গুরু একটা সুগন্ধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। অভিভূতের মত টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল বাবর।

হ্যালো। কে?

অপর পক্ষের গলাটা এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল বাবলির। কিন্তু পরীক্ষণেই টের পেয়েছিল, না বাবলির ভাবী।

আমি বাবর বলছি। সেলিম কই?

এইতো এখানেই, দিচ্ছি।

সেলিম টেলিফোন ধরল।

কিরে? কোত্থেকে?

টেলিভিশন থেকে।

খুব গ্যাঁজাচ্ছিাস, না?

দূর। একটা কাজে এসেছিলাম। ভাবলম দেখি তুই বাসায় আছিস নাকি?

আসবি?

দেখি।

আয় না, অনেকদিন তোকে দেখি না।

কেন, টেলিভিশনে তো দেখিস।

বাবর একটু পরিহাস করবার চেষ্টা করল। তার উত্তরে সেলিম বলল, নে নে আর বাহাদুরি করতে হবে না। আসবি কি-না বল?

আচ্ছা, আসছি।

কতক্ষণে?

এই একটু পরেই। বলেই বাবর লোভ সামলাতে পারল না, বাবলির উল্লেখ করতে গিয়ে একটু দূর থেকে আরম্ভ করল, ভাল আছিস তো?

আছি।

তোর বৌ?

সেও ভাল।

www.bengaliebook.com

বাবলির পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?

কী জানি। পড়াশুনা করছে নিশ্চয়ই।

এই কি ভাইয়ের মত কথা? একটু খোঁজ খবর নিতে হয়।

সত্যি রে, একেবারে সময় পাই না। মনেও থাকে না ছাই।

বাবর হাসল। প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাহেব ঘরে এসে ঢুকলেন।

সেলিম হাসল।

আচ্ছা, আমি আসছি।

আয়।

টেলিফোন রেখে বাবর একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলল, বড় ব্যস্ত মনে হচ্ছে?

ব্যস্ত তো বটেই। একটা ইমপরট্যান্ট ইন্টারভিউ রেকর্ড হবে কাল। আমাদের নতুন সিরিজটার জন্যে।

ও। আমাকে কী বলবেন বলছিলেন।

বলছি, বলছি। চা?

খেতে পারি।

বেল টিপে চায়ের জন্যে ফরমাশ করলেন তিনি। তারপর কয়েকটা কাগজ এদিক থেকে ওদিকে সরিয়ে, অনাবশ্যকভাবে টেলিফোনের বইটা খুলে একবার দেখে, হঠাৎ বাবরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার প্রোগ্রামটা বাবর সাহেব—

বাবর উদ্বিগ্ন চোখে তার দিকে তাকাল।

আপনার প্রোগ্রামটা কিছুদিনের জন্যে বন্ধ রাখতে হচ্ছে।

কেন, খারাপ ছিল না তো সিরিজটা!

না, তা নয়, সিরিজটা খুবই ভাল, আপনি করেছেনও চমৎকার।

বাবর ঠিক বুঝতে পারল না লোকটা সত্যি সত্যি ভাল বলছে, না প্রোগ্রাম উঠিয়ে দেবে বলে তেতোর উপর মিঠে প্রলেপ লাগাচ্ছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল তার।

তিনি বললেন, আপনার পরিচালনা খুবই ভাল, কিন্তু আমরাই ঠিক করলাম কিছুদিনের জন্যে বন্ধ থাক।

কেন?

জানেন তো, টিভি প্রোগ্রাম যখন খুব ভাল হতে থাকে, তখনই বন্ধ করতে হয়। তাতে পরে আবার যখন সিরিজটা শুরু হয় তখন দর্শক উৎসাহ নিয়ে দেখে। এতে আপনারই লাভ।

তাতো বটেই।

বাবর চেষ্টা করেও প্রফুল্ল থাকতে পারল না। কেমন যেন বঞ্চিত মনে হতে লাগল। তার নিজেকে।

প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাহেব চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, অনেক দিন তো করলেন, মাস তিনেক বিশ্রাম নিন। আবার শুরু করবেন। আরে, আপনারাই তো আছেন। আপনাদের ছাড়া আমরা কাদের নিয়ে স্টেশন চালাব? নিন, চা খান।

আজ যেন তাঁর কোনো কথাই বিশ্বাস করতে পারছে না বাবর। তার টিভি সিরিজ যে এভাবে শেষ হয়ে যাবে সে ভাবতেও পারেনি। তার ধারণা ছিল আরো অন্তত তিন মাস চলবে, আগামী মার্চ পর্যন্ত।

তাহলে এই সামনের দুটো প্রোগ্রামই শেষ প্রোগ্রাম?

হ্যাঁ। শেষ প্রোগ্রামটা একটু জমিয়ে করবেন। ফেয়ারওয়েল প্রোগ্রাম তো! নতুন কিছু করতে পারবেন না? নতুন ধরনের কোনো প্রেজেন্টেশন?

ভেবে দেখব। আচ্ছা উঠি, আমার আবার এক জায়গায় যেতে হবে।

বাবর উঠে দাঁড়াল। প্রোগ্রাম ম্যানেজার হাত বাড়িয়ে বললেন, আপনার অবশ্য একটু আর্থিক লোকসান হলো।

না, না ঠিক আছে। আমি তো টাকার জন্যে প্রোগ্রাম করি না।

সে জানি। আপনার অন্য মেলা সোর্স আছে ইনকামের। সেই জন্যেই সরাসরি বলতে পারলাম।

চলি।

আচ্ছা, দেখা হবে।

বিমূঢ়ের মত বাইরে এসে থমকে দাঁড়াল বাবর। দাঁড়িয়ে থাকল। কিছুক্ষণ। ও কথা সে সত্যি বলেছে, প্রোগ্রাম টাকার জন্যে করে না। প্রোগ্রাম তার কাছে নেশার মত অনেকটা। এই যে যখন সে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াচ্ছে এক সঙ্গে এত হাজার হাজার লোক তাকে দেখছে, এর একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে। টাকা দিয়ে তার পরিমাপ করা যায় না।

টাকা তো সে ইনডেন্টিং থেকে কম রোজগার করে না। কিন্তু সেখানে এই যাদু, এই সম্মোহন নেই।

তাছাড়া, তাছাড়া এই প্রোগ্রামের জন্যেই তো সে প্রথম জানতে পেরেছিল লতিফাকে।

ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল বাবর। বেরিয়ে গাড়িতে বসল। প্রচণ্ড শব্দ তুলে স্টার্ট করল ইঞ্জিন। আপন মনেই বলল, খেলারাম খেলে যা। তারপর রওয়ানা হলো বাবলিদের বাড়ির দিকে।

৬. বাবলি

পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখল, সেলিমের সামনে বাবলি একগাদা বইপত্র নিয়ে মুখ কালো করে বসে আছে। বাবরকে দেখে দ্রুত চোখ নামিয়ে নিল বাবলি। এলোপাতাড়ি একটা বই ওল্টাতে লাগল।

সেলিম বলল, আয়। তোর কথা শুনে বাবলিকে নিয়ে বসেছিলাম পড়াশুনা দেখতে। হোয়াট ইজ ইকনমিকস তাই বলতে পারল না।

তাই নাকি বাবলি?

বলতে বলতে বাবর বসল।

তবে আর বলছি কী? এ নির্ঘাত ফেল করবে। কিছু পড়েনি। শুধু ঘোরাফেরা, হৈচৈ, চুল আঁচড়ানো, সিনেমা দেখা।

বলেছে তোমাকে? কটা সিনেমা দেখেছি গত মাসে? বাবলি প্রতিবাদ করে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে কালো ক্রুর একটা চাহনি দিল বাবরকে।

কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল বাবর, যা সে সাধারণত হয় না। সেলিম ওকে বলতে গেল কেন যে সে তার পড়াশোনার খোঁজ নিতে বলেছে? একটা গাধা! গর্দভ।

বল না কটা সিনেমা দেখেছি? বাবলি মরিয়া হয়ে জের টেনে চলে, সত্যি করে বল! রিচার্ড বাটনের এত সুন্দর বইটা সবাই দেখে পচিয়ে ফেলল, আমি দেখেছি? তারপর ওমর শরিফের পিটার ও টুলের নাইট অব দি জেনারেল?

সিনেমা না দেখলেও নাম তো সব মুখস্থ দেখছি! সেলিম বলল।

নাম পড়তে পয়সা লাগে নাকি? কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছি, তাই বলি।

কাগজে সিনেমার বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছু পড়ার থাকে না বুঝি?

বাবর এবার এগিয়ে এলো বাবলিকে উদ্ধার করতে।

আচ্ছা হয়েছে। ইকনমিকসের ডেফিনেশন পরীক্ষায় আসে না। এলেও থাকে। পাঁচ নম্বর। যাও, তুমি পড়তে যাও।

একটা ক্রুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বাবলি গ্যাঁট হয়ে বসে রইল। ভাবখানা যেন, আপনার কথায় পড়তে যাব নাকি? বাবর তাকিয়ে দেখল, এই প্রথম সে লক্ষ করল, তখনকার জামা কামিজ এখনো বাবলি ছাড়েনি। এর আগে কতদিন সে দেখেছে। এই পোশাক। কিন্তু আজ অন্য রকম মনে হচ্ছে। ঐ তো সেই বোতামগুলো, পিঠের পরে, যা সে খুলেছিল। কোমরে রবারের ব্যাণ্ড দাঁত কামড়ে বসে আছে নিশ্চয়ই তার মসৃণ তলপেটে।

একটা তুলতুলে বাচ্চার মত পেটটা তখন উঠছিল নামছিল। করতল দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার ওপর ঘষতে ভারি ভাল লাগছিল বাবরের।

সেলিম বলল, যা এখন। দুদিন বাদে সব পড়া ধরব।

দুম দুম করে তখন উঠে গেল বাবলি।

হেসে উঠল বাবর। একবার সেই কারণে বাবলি পেছন ফিরে তাকিয়েছিল। সে চলে গেলে বাবর বলল, তোরাও তো তেমনি মাথা খারাপ। পড়াশুনার কথা বলছি বলে সঙ্গে সঙ্গে ধরতে হয়?

না, তুই ঠিকই বলেছিস। ও মোটে পড়াশুনা করছে না।

আমি কোথায় বলেছি, পড়াশুনা করে না? বলেছি, খোঁজ টোজ নিস আর তাছাড়া মানুষের মন কি সব সময় এক রকম থাকে? অনেক সময় জানা জিনিসও টপ করে বলা যায় না।

ঐটুকু মেয়ে তার আবার মন মেজাজ!

নে বাদ দে। ছেলেমেয়েরা ওরকম একটু হয়েই থাকে। ফারুক এসেছে শুনেছিস?

বলেই বাবর শংকিত হলো। বাবলি কি এসে বলেছে তার ভাইয়াকে যে ফারুক এসেছে?

যদি বলে থাকে তাহলে সেলিম জানে তার সঙ্গে বাবলির দেখা হয়েছিল। অথচ টেলিভিশন থেকে যখন ফোন করেছিল তখন সে এমনি ভাব করেছিল, যেন অনেকদিন দেখা হয়নি।

না, শুনিনি তো। কবে এসেছে?

যাক বাঁচা গেছে, মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বাবর। বলল, এইতো সেদিন।

কোথায় উঠেছে?

শ্বশুর বাড়িতে। আর কোথায়? বলছে, পলিটিকস করবে।

পলিটিকস?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, পলিটিকস। বলছে, আওয়ামী লীগে ঢুকবে।

তাতো ঢুকবেই। এখন আওয়ামী লীগের দিন।

তা ঠিক। সবাই এখন শেখ সাহেব বলতে পাগল। বাবর বলল, শেখ সাহেবের পাশে একটু বসতে পারলে যেন কৃতার্থ হয়ে যায়। অথচ এরাই জানিস, শেখ সাহেব যখন আগরতলা মামলার আসামি ছিলেন তার নাম পর্যন্ত মুখে আনতেন না ভয়ে।

হা হা করে হেসে উঠল সেলিম।

ঠিকই বলেছিস। দুনিয়াটাই ও রকম। আচ্ছা, তোর কী মনে হয়, শেখ সাহেব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন এবার?

হতেও পারেন। পলিটিকস আমি বুঝি না।

ফারুক কী বলে?

ওর সাথে কথা হয়নি।

ফারুক যখন আওয়ামী লীগে যেতে চাচ্ছে তখন কী আর এমনি যেতে চাচ্ছে? এক নম্বর সুযোগ সন্ধানী ছেলে। বরাবর। মনে নেই, কী করে ফাস্ট ক্লাস বাগাল এম.এ-তে?

আছে, আছে। মনে থাকবে না?

কই গো দ্যাখো বাবর এসেছে, কিছু খেতে টোতে দাও।

ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?

সেলিমের বৌ এসে বলল, ভাল আছেন?

আছি। আপনি ভাল তো?

এই যা দেখছেন। চিংড়ির কাটলেট খাবেন?

নিশ্চয়ই। আমার খুব প্রিয়।

তাহলে একটু দেরি করতে হবে।

করব। যেমন আদেশ করবেন।

হেসে চলে গেল সুলতানা।

সেলিম বলল, তুই আর বিয়ে টিয়ে করবি না?

কেন, পাত্রী আছে নাকি ভাল?

খুঁজে পেতে কতক্ষণ? তুই করলে তো! আচ্ছা, নাকি, তুই সত্যি বলতো, তোর কোনো ব্যারাম ট্যারাম নেই তো? মানে— এই আর কী–

বাবর অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ল।

থাকতেও তো পারে। একটা যন্ত্র দু এক বছর ফেলে রাখলেও বিকল হয়ে যায়, আর তো মানুষের শরীর। তুই ডাক্তার দেখা।

তুই দেখছি ধরেই নিয়েছিস আমারটা অকেজো হয়ে গেছে।

তাহলে বিয়ে করিস না কেন?

বাদ দে বিয়ের কথা। বিয়ে করব চুল টুল যখন শাদা হবে তখন।

চুল কী এখন কালো আছে তোর?

তা সত্যি। বুড়েই হয়ে গেছিরে। আর এখন মেয়ে দেবেই বা কে, বল? তাছাড়া দেশের যা অবস্থা।

দেশের অবস্থার সঙ্গে তোল বিয়ের যোগটা কী শুনি? কারবি তো ভারি–একটা বিয়ে। ইচ্ছে নেই সেই কথা বল।

রেখে দে। বুড়ো কালে আর এসব ভাল লাগে না। তোর মেয়ে কই?

আছে ভেতরে।

নিয়ে আয় না? একটু দেখি–এই দ্যাখো, কিছু আনিনি ওর জন্যে। বাসায় চকোলেট ছিল। একেবারে বিলিতি জিনিস।

সেলিম মেয়েকে আনতে ভিতরে গেল। বাবরের মনে পড়ল বাবলি যখন চকোলেট খাচ্ছিল তার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে খয়েরি রংটা দেখাচ্ছিল ভারি মিষ্টি।

ফিরে এসে সেলিম বলল, নারে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভারি সুন্দর হয়েছে তোর মেয়েটা। কার চেহারা পেয়েছে বলতো?

ওর মায়ের।

তোর চোখই নেই। অবিকল তোর মত হয়েছে দেখতে। কেবল রংটা ওর মায়ের।

তার মানে, বলতে চাস, আমি কাল?

কাল ফর্সা দিয়ে এখন আর কী করবি?

কেন, বিয়ে করেছি বলে চান্স আর নেই নাকি?

তোদের শুধু মুখে মুখে। চিনিস এক অফিস, আর বৌয়ের আঁচল।

বলেছে তোকে?

তোরা খুঁজবি চান্স? যাহ!

কীসের চান্স? বলতে বলতে সুলতানা ঘরে এলো।

বলে দিই? বাবর দুষ্টুমি করতে শুরু করল।

ভাল হবে না বলছি।

তবে এই যে বীরপুরুষের মত বলছিলি?

আমি ভীতু নাকি?

থাক, তুমি আর বল না। টেবিলে গ্লাশ সাজাতে সাজাতে বলল সুলতানা, জানেন ভাই সেদিন রাতে কী একটা স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন, তাও যদি সত্যি হতো, আমাকে ঘুম থেকে তুলেছে। তার নাকি ভয় করছে।

সেলিম বলল, আচ্ছা তুই বল, ঘুমের মধ্যে কোনটা স্বপ্ন আর কোনটা সত্যি অতশত মনে থাকে?

হা হা করে হেসে উঠল বাবর।

খুব ভাল বলেছিস, কথাটা টিভি প্রোগ্রামে যুৎসই মত লাগাতে হবে।

বলেই বাবরের মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল, একটু আগেই সে শুনে এসেছে, তার প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ মাসেই। সামনের মাস থেকে আর কেউ তাকে দেখবে না, পথে পথে দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠবে না। কারো চোখ, নামটা শুদ্ধ করে বলার জন্যে নীল চিঠিতে আসবে না কোনো অনুরোধ, নতুন কোনো লতিফার সঙ্গে আর আলাপ হবে না। বাবর খুব ভাল করে জানে সিনেমা টিভি আর খেলার মাঠ এক সমান। যতক্ষণ পর্দায় আছ, যতক্ষণ গোল দিচ্ছ, ততক্ষণই লোকে মনে রাখে। তারপর কেউ ফিরেও তাকায় না। একটা হাত কেটে নিলেও এত ব্যথা হয় না। যতটা হয় পাদপ্রদীপের আলো থেকে বঞ্চিত হলে।

সেলিম কী সব পাগলের মত বলে যাচ্ছে, হাসছে, গম্ভীর হচ্ছে, প্রশ্ন করছে, সুলতানা কাটলেট এনে রেখেছে, বাবর দু একটা নিজেও কী বলেছে, কাটলেট খাচ্ছে, ঘড়িতে ঢং করে একটা আওয়াজ হলো কোথায়–কিছুই তার কানে যাচ্ছে না। অভিভূতের মত বাবর বসে একটা ছবি দেখছে–সে ছবি তার নিজের। এই তো দেখা যাচ্ছে সে প্রোগ্রাম ভিটিআর করবার দিন ভাল করে শেভ করে বিশেষ সুট পরে, গাড়িতে নয় যেন পাখা মেলে দিয়ে ডিআইটি বিল্ডিংয়ে এসে থামল। হাসি বিলিয়ে দিল একে তাকে। প্রযোজকের সঙ্গে কথা বলল এমন একটা গুরুত্ব নিয়ে যেন ডাঃ বার্নার্ড কারো দেহে হৃৎপিণ্ড সংযোজন করতে যাবার আগে পরামর্শ করছেন। ঐ তো সে দরোজা ঠেলে মেকআপ। রুমে ঢুকল। তার মুখে পরতের পর পরত রং লাগছে। নাকের দুপাশে ঘষে দিচ্ছে লাল। ভ্রা শুধরে দিচ্ছে পেন্সিল দিয়ে। সে বিরল হয়ে আসা চুলের গোছা টান টান করে ধরে বলছে, গোঁড়ায় একটু পেন্সিল বুলিয়ে দাও, নইলে টাক চোখে পড়ে বড্ড। তারপর যত্ন করে সময় নিয়ে সিঁথি সেরে হেয়ার স্প্রে লাগাচ্ছে সে। প্রযোজক এসে বলছে, সেট রেডি। আসুন। সে বলছে, আর এক মিনিট। বাবর সেটে ঢুকছে যেন সদ্য তৈরি নতুন রাজধানীতে প্রথম পা রাখছে কোনো তরুণ সম্রাট। কে যেন কোথায় বলছে, একটু দাঁড়ান, আলোটা দেখে নিই। ক্যামেরার পেছন থেকে কানে হেডফোন লাগানো কে এবার সাড়া দিয়ে উঠল দুহাত তুলে–স্টুডিও স্ট্যাণ্ডবাই। নিঃশ্বাস বন্ধ করে একবার টাইয়ের নট বুলিয়ে নিল বাবর। চোখ তার মনিটারের দিকে। শোনা গেল, ভিটিআর রোলিং। কয়েক সেকেণ্ড পর মনিটারে পর্দা দুধসাদা হয়ে উঠে একটি লেখা ফুটিয়ে তুলল। মারপ্যাঁচ। তারপর সেটা মিলিয়ে গেল। এবারে এলো তার নাম–পরিচালনা বাবার আলী খান। বাবর মনিটার থেকে চোখ নামিয়ে ক্যামেরার লেন্সের দিকে রাখল। ঠোঁটে সৃষ্টি করল হাসির পূর্বভাষা। তারপর, ক্যামেরার মাথায় লাল বাতিটাজ্বলে উঠতেই সে

সহাস্য ঝুঁকে উচ্চারণ করল, শুভেচ্ছা নিন, বাবার আলী খান বলছি মারপ্যাঁচের আসর থেকে। বুদ্ধির মারপ্যাঁচ। দেখি আপনারা কতজন আমাকে বোকা বানাতে পেরেছেন। আমি গেলবারে মোট আটটি ধাঁধা পেশ করেছিলাম, এক-দুই-তিনচার-পাঁচ-ছয়-সাত-আটটি ধাঁধা, আপনারা উত্তর পাঠিয়েছেন, দুহাজার তিনশ সাতান্ন, তার মধ্যে সঠিক হয়েছে একুশ জনের।—

বাবর উঠে দাঁড়াল। বলল একটু বাথরুম থেকে আসি।

বসবার ঘর থেকে বেরুতে হয় পেছনের বারান্দায়, তার শেষ প্রান্তে একটা বাথরুম আছে।

দুটো ঘর পেরিয়ে যেতে হয়। প্রথমটা খাবার ঘর। তারপরে বাবলির। দ্রুতপায়ে বাথরুমে ঢুকে দরোজাটা বন্ধ করতে করতে তার মনে হলো বাবলিকে যেন দেখা গেছে জানালার কাছে বই নিয়ে বসে আছে। চলার তোড়ে তখন লক্ষ করেনি, থামার কথাও মনে হয়নি। কিন্তু ছবিটা চোখে লেগে গেছে। সমুখের ল্যাম্প থেকে আলোর আধখানা বৃত্ত বাবলির চিবুক স্পর্শ করেছে মাত্র। দুটো হাত বইয়ের ওপর। আলোকিত হাত দুটোকে অচেনা একটা ফুলের মত দেখাচ্ছিল। পিঠটা অন্ধকার। দূরে সবুজ চাদর পাতা বিছানা অন্তরঙ্গ করে তুলেছে জালানা দিয়ে হঠাৎ দেখা ছবিটা।

বাথরুমে এসে কিছুই করল না। বাবর অনেকক্ষণ। বাতি জ্বালিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখল। বলল তার ঠোঁট দুটিকে, তুমি আজ কাকে চুমো খেয়েছ?

আলতো করে নিজের ঠোঁট আদর করল সে। তারপর জামার কয়েকটা বোতাম খুলে দেখল, কোনো চুল পেকেছে কি-না! না, এখানে এখনো শুরু হয়নি। নিজের লোমশ বুকে হাত ঘষতে ভাল লাগল তার। কিছুক্ষণের জন্যে তাই করল সে। তারপর জামার বোতাম তাড়াতাড়ি লাগিয়ে প্যান্টের বোতাম খুলল বাবর।

কমোডে এই যে একটানা সরসর শব্দ হচ্ছে এখন, বাবলি কি শুনতে পাচ্ছে? দ্রুত হাতে সে ট্যাপ খুলে দিল। ট্যাপ থেকে পানি পড়ার শব্দে ডুবে গেল ঐ শব্দটা।

বাথরুমের তাকে একটা তুলোর রোল। কে ব্যবহার করে? বাবলি? তুলোটা একবার বুলিয়ে দেখল সে। তারপর চারদিকে তাকাল। একটা তোয়ালে ঝুলছে। ওপাশে চিলতে হয়ে আসা সাবান। দুটো টুথব্রাশ। পাজামার একটা ফিতে জড়িয়ে আছে ফ্লাশ হ্যাণ্ডেলের সাথে। বাবলির পাজামায় তো রবারের ব্যাণ্ড। এটা কার? ভাল করে সে দেখতে লাগল সব। না, বিশেষ করে বাবলির এমন কিছুই চোখে পড়ল না। বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ দরোজার গায়ে দেখল পেন্সিল দিয়ে লেখা–বাবলি। ইংরেজিতে। কবে লিখেছিল? কেন লিখেছিল? লেখাটা ছুঁয়ে দেখল বাবর। তারপর ঠোঁট বাড়িয়ে স্পর্শ করল অক্ষরগুলো। প্রথমে একসঙ্গে সব কটা অক্ষর। পরে একটা একটা করে–বি এ বি এল আই। সন্তর্পণে দরোজা খুলে বেরুল বাবর। নিঃশব্দে বাবলির জানালার কাছে এসে থামল। ডাকল, এই।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

বাবলি মাথা তুলল। না। বাবর দেখল রংটা সে ভুল দেখেছে। চাদরের রং নীল। সে বলল, রাত ঠিক এগারটায় আমাকে টেলিফোন কর।

কথা বলল না বাবলি। গলা আরো নামিয়ে আনল বাবর।

আচ্ছা, আমিই করব। টেলিফোনের পাশে থেকো।

না।

তুমি করবে?

না।

চকিতে চারদিকে দেখে বাবর চাপা গলায় হিস হিস করে উঠল, কথা শোন। আমি টেলিফোন করব। রাত ঠিক এগারটায়। বলেই সে লম্বা লম্বা পা ফেলে বসবার ঘরে এসে ঘোষণা করল, ভুলেই গিয়েছিলাম। এখুনি বাসায় যেতে হবে। একজন আসবে।

৭. একজন আসবে বলেও

একজন আসবে বলেও তক্ষুণি বেরুন সম্ভব হয়নি। আরো কিছুক্ষণ বসতে হয়েছে। বসেছে সে। বারবার তার মনে হচ্ছিল বাবলি একবার এ ঘরে আসবে। এলে কী হবে তা সে জানে। না। কিন্তু প্রতীক্ষ করেছে উৎকর্ণ হয়ে প্রতিটি মুহূর্ত।

ঝুঁকির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার প্রবল একটা আকর্ষণ চিরকাল অনুভব করেছে বাবর। বিপদ তার স্বাভাবিক পরিবেশ। উদ্বেগ তার পরিচ্ছেদ। এই দুয়ের বিহনে সে অস্বস্তি বোধ করে, মনে হয় বিশ্বসংসার থেকে সে বিযুক্ত। তাই বেঁচে থাকার প্রয়োজনে, স্বাভাবিকতার প্রয়োজনে, সে অবিরাম সৃষ্টি করে বিপদ আর ঝুঁকি।

বাবলি এলো না।

সুলতানা বলল, আরেকদিন আসবেন।

আসব। তার জন্যে বিশেষ করে বলতে হবে না।

আচ্ছা, সবসময় টিভির মত কথা না বলে বুঝি আপনি পারেন না?

সুলতানার ঐ হঠাৎ মন্তব্যে মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল বাবর। তারপর হেসে ফেলে বলল, দেশে যখন টিভি ছিল না তখনও আমি এমনি করেই কথা বলতাম। আচ্ছা, চলি।

বেরিয়ে এসে দেখল এগারটা বাজতে এখনো অনেক দেরি। বাবলিকে হঠাৎ এগারটা সময় দিতে গেল কেন? না, ভেবে চিন্তে দেয়নি। এমনিই বেরিয়ে গেছে মুখ থেকে। বোধহয় এগারটা শুনতে ভাল, বলতে গেলে জিহ্বার এক রকম তৃপ্তি হয়। এ-গা-র-টা। বাবলির স্তনের ঘ্রাণটা অস্পষ্টভাবে আবার নাকে এসে লাগল হঠাৎ। নিজের আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করল বাবর যে আঙুলে সে তার শরীর সন্ধান করেছিল আজ বিকেলে।

বাসায় ফিরে যাবে?

আজ বড় একা লাগছে বাবরের। আজ নয়, কাল থেকে একা লাগছে। কিন্তু কেন লাগছে। তা এখনও বুঝতে পারেনি।

ধুত্তোর ছাই। খেলারাম খেলে যা।

এক নিমেষে মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল তার। ভিআইপি স্টোরে গাড়ি থামাল সে। কিছু জিনিসপত্র কেনা দরকার। ব্লেড ফুরিয়ে গেছে, শেভিং লোশনও তলানিতে এসে ঠেকেছে। আরো কী কী যেন ফুরিয়েছে চট করে মনে পড়ল না তার।

স্টোরে ঢুকে বলল, একটা টেলিফোন করতে পারি?

টেলিফোনে বাসায় খোঁজ নিল, কেউ এসেছিল কি-না। না, কেউ আসেনি। মান্নান জিগ্যেস করল রাতে খাবে কি-না? না, সে খাবে না। বাইরে খাবে। আবার জিজ্ঞেস করল কেউ আসেনি? কেউ ফোন করেনি? না। হ্যাঁ, না।

বিশেষ কারো কথা ভেবে বাবর জিজ্ঞেস করেছে কি? না, তা করেনি? ওটা তার স্বভাবের অন্তর্গত। তার কেবলই মনে হয়। কেউ যেন তাকে খুঁজছে। বাসা থেকে বেরুলেই মনে হয়। কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। তখন বাসায় ফেরবার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে। আবার বাসায় ফিরলে মনে হয় বাইরে, শহরে, কী যেন হয়ে যাচ্ছে যা সে জানতে পারছে না।

শো কেসে লাল সবুজ নীল রংয়ের মেলা। লোশন, সাবান, শ্যাম্পু, ক্রম, পাফ, কত কী! হ্যাঁ, শ্যাম্পূও দরকার। ওটা নিতে হবে। ব্লেড দিন দুপ্যাকেট, সাবানটা কী রকম? নতুন বেরিয়েছে? ভাল? দিন। বাহ, চাবির রিংটা তো সুন্দর। কত দাম? সাত টাকা? না, থাক। ওটা কী? মিনি লাইট? দেখি দেখি, কী রকম? সুন্দর প্যাস্টেল নীল রংয়ের এতটুকু একটা টর্চ। মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে থাকে এত ছোট। পকেটে রাখা যায় স্বচ্ছন্দে। দিন একটা। বাবর পছন্দ করল প্যাস্টেল গোলাপি রং। কয়েকবার নেড়েচেড়ে দেখল। লাইটটা সুন্দর। মনটা খুব খুশি হয়ে উঠল তার। আর, দুপ্যাকেট সিগারেট দিন। লাইফ ম্যাগাজিন এটাই নতুন এসেছে? দিন এক কপি। পনির দেবেন। হাফ পাউণ্ড। এক বোতল টমাটো কেচাপ। আর–আর কী? আর কিছু না।

প্যাকেটটা নিয়ে গাড়িতে বসল বাবর। বাসায় ফিরবে পৌনে এগারটায়। তারপর ঠিক এগারটায় ফোন করবে বাবলিকে। এখনো ঘণ্টা দুয়েক সময় আছে। বরং খাওয়াটা সেরে নেয়া যাক। কোথায় খাবে?

ইন্টারকন্টিনেন্টালে বাবর এসে ঢুকল। বইয়ের দোকানে দেখল। চমৎকার সব নতুন বই এসেছে। বই দেখল কিছুক্ষণ। কিন্তু কিনল না। আজ বই কেনার মুড নেই তার। শুধু দেখতে ভাল লাগছে।

হঠাৎ তার পিঠ স্পর্শ করল কেউ। বাবর ঘুরে দেখল। আলতাফ। তার বিজনেস পার্টনার। আলতাফ বলল, আমি তোমাকে গরুখোঁজা করছি।

বাজে কথা! বাসায় এইমাত্র খবর নিয়েছি, কেউ আসেনি।

মানে, বাসায় এখুনি যেতাম।

এই তোমার গরুখোঁজা?

চল কোথাও বসি, জরুরি কথা আছে।

কী ব্যাপার?

এমন কিছু নয়। চল।

তোমার পারিবারিক কিছু?

না, না।

ব্যবসা?

হ্যাঁ, ব্যবসার।

চল, খেয়ে নিই। খেতে খেতে শুনব।

সে অনেক সময় লাগবে। তার চেয়ে বারে চল। কুইক দুটো হয়ে যাবে।

চল।

বারে এসে অর্ডার দিয়ে আলতাফ বলল, শুনেছ বোধ হয় সরকারি কিছু বড় অফিসার সাসপেণ্ড হচ্ছে?

হ্যাঁ, শুনেছি। আমাদের বন্ধুবান্ধব কে কে গেল?

এখনো পুরো খবর পাইনি। সবাই তো আল্লা আল্লা করছে।

ভালই তো।

তবে, একজনের একেবারে পাকা খবর।

কে?

আমাদের হতরন সাহেব।

বল কী? লাফিয়ে উঠল বাবর। সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি।

যার কথা তারা বলছে তিনি ব্রিজ খেলায় এক্সপার্ট। কিন্তু হরতন বলতে পারেন না। বলেন হতরন। সেই থেকে তার নাম হয়ে গেছে হতরন সাহেব।

মুশকিলের কথা।

বাবরকে চিন্তিত দেখাল।

হতরন যাচ্ছে তাহলে?

ইয়েস, স্যার। পাকা খবর। সেই জন্যেই তোমাকে খুঁজছিলাম।

এইমাত্র কিছুদিনের কথা, হতরন তাদের একটা বড় কাজ পাইয়ে দেবে বলেছে, যার কমিশনই হবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। শর্ত ছিল এই হতরনের বড় মেয়ের বিয়ে সামনে, গহনার সম্পূর্ণ টাকা দেবে তারা। গহনার অর্ডারও দেয়া হয়ে গেছে। কথা ছিল, গহনা নিয়ে যাবেন হতরন সাহেব, টাকাটা ওরা জুয়েলারকে দিয়ে দেবে।

বাবর জিজ্ঞেস করল, গহনা নিয়ে গেছে?

হ্যাঁ, আজই সকালে নিয়েছে। আমি টেলিফোন করেছিলাম।

আমাদের কাজটা।

সাসপেণ্ড হলে তো কাঁচা কলা পেলাম।

তা বটে।

আর সাসপেণ্ড না হলেই বা কী? এই সময় হতরন কেন হতরনের বাবাও কাজ দিতে সাহস করবে না।

তাইতো।

আলতাফ তাকে একবার ভাল করে দেখে বলল, মনে হচ্ছে তুমিও আজ খুব মনোযোগ দিতে পারছ না।

চমকে উঠল বাবর। বলল, না, তা কেন?

আমার যেন মনে হচ্ছে। আসল কথা কী জান? কথা হচ্ছে, গহনার টাকাগুলো। কাজ দশটা আসবে, একটা পাব, একটা পাব না।

তো কী করবে?

তুমি আজ সত্যি কিছু চিন্তা করতে পারছ না। কী হয়েছে?

কিছু না।

বুঝেছি। চল এবার গহনার দোকানে যাই।

গিয়ে কী হবে?

আচ্ছা, তোমার কী হয়েছে বল তো?

বাবর এবার সত্যি বিরক্ত বোধ করল। এক ঢোকে সবটা হুইস্কি গলায় ঢেলে দিয়ে বলল, চল গহনার দোকানে যাই।

গহনার দোকানে গিয়ে জানা গেল মোট দাম নহাজার সাতশ চুরাশি টাকা। সাড়ে নহাজার দিলেই চলবে।

আলতাফ বলল, দামটা আপনারা ওঁর কাছ থেকেই পাবেন।

কিন্তু কথা তো ছিল আপনারা দেবেন।

হাত কচলে অনাবিল একটা হাসি দিয়ে দোকানদার নিবেদন করল।

আলতাফ বলল, না, সে রকম কথা ছিল না।

মানে? বাবর চমকে উঠল। কিন্তু আর কিছু বলার আগেই নিজের হাতের উপর আলতাফের চাপ অনুভব করল সে।

আলতাফ এবার জোর দিয়েই বলল, আপনারা ভুল করছেন, সে রকম কোনো কথা ছিল না। দাম উনিই দেবেন। গয়না উনি নিয়ে গেছেন?

তা, নিয়েছেন।

তবে আর কথা কী?

কিন্তু আপনিই তো বলেছিলেন—

আপনি তখন ঠিক বুঝতে পারেননি। কথা ছিল, উনি গয়না নিয়ে যাবেন, যদি দাম নিয়ে গোলমাল হয়, তবে জিম্মা আমরা রইলাম।

কী বলছেন স্যার?

হ্যাঁ আপনারা যান তার কাছে। টাকা চান।

দোকান থেকে বেরিয়েই বাবর বলল, এটা কিন্তু ঠিক হলো না?

কী ঠিক হলো না?

এভাবে মিথ্যে বলাটা। দাম তো আমরাই দিতে চেয়েছিলাম।

আলতাফ গাড়িতে বসতে বসতে বলল, হঠাৎ এমন নীতিবাগিশ হয়ে উঠলে যে।

না, এটা নীতিবাগিশ টাগিশ কিছু না। কাজ পাচ্ছি না বলে ভদ্রলোককে তার মেয়ের বিয়ের সময় বিপদে ফেলাটা কিছু কাজের কথা নয়।

কী বলতে চাও তুমি?

ভদ্রলোকের কাছ থেকে অতীতে অনেক উপকার পেয়েছ। দু বার দু। দুটো কাজ দিয়েছিলেন।

তখন তাকে টাকাও দিয়েছি।

দিয়েছ, কিন্তু সেই দুটো কাজে কম লাভ আমরা করিনি। না হয় তার থেকে এই নয়। সাড়ে নয় হাজার টাকা দিলামই।

বুঝলাম না, আজ তুমি এই সাধারণ কথাটা বুঝতে পারছি না কেন। এই টাকাটা একেবারে পানিতে ঢালা হবে। অফিসার হিসেবে হি ইজ ডেড, ডেড ফর গুড়। কিম্বা তোমাদের ইংরেজিতে যাকে বলে ডেড আজ এ ডোর নেইল।

আলতাফ ইংরেজি একটু কম জানে বলে বাবরকে ইংরেজি নিয়ে মাঝে মধ্যে ঠাট্টা করতে ছাড়ে না।

বাবর দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, তবু আমার মনে হয়, গহনার দামটা আমাদের দিয়ে দেয়া উচিত। কী ব্যাপার, হতরনের বড় মেয়েকে দেখেছ নাকি?

দেখেছি, কেন?

চোখ টোখ ছিল নাকি তোমার?

বাজে কথা বল না।

কী জানি। তবে যাই বল, টাকা দেওয়ার বিরুদ্ধে আমি।

বাবর কিছু বলল না। অস্বাভাবিক একটা নীরবতার আশ্রয়ে সে বসে রইল। এ রকম বসে থাকা বাবরের স্বভাব নয়। কথা সে ভালবাসে। কথা না বলতে পারলে ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত খাবি খায় সে।

আলতাফ বলল, চল হোটেলে যাই।

যেখানে তোমার খুশি।

তুমি রাগ করেছ?

মোটেই না।

এই জন্যেই মাঝে মাঝে তোমার ওপর আমার ভীষণ রাগ হয়। আলতাফ বলে চলল, তুমি সাধারণ একটু রাগও করতে পার না।

একেবারে মেয়েদের মত কথা বলছি। হা হা করে হেসে উঠল বাবর। বলল, ব্যবসা করতে গেলে রাগ করলে চলে না। ব্যবসা প্রেম নয়।

প্রেম তো তোমার কাছে বিছানায় যাবার রাস্তার নাম।

আবার হা হা করে হেসে উঠল বাবর। হাসতে দেখে আলতাফ আশ্বস্ত হলো। মনে করল, টাকা দেয়া না-দেয়া সম্পর্কে তার সিদ্ধান্তটাই বাবর মেনে নিয়েছে শেষপর্যন্ত। কিন্তু বাবরের সঙ্গে এতদিন ব্যবসা করলেও বাবরকে সে চেনে না, এইটে তার অজানা।

পরপর কয়েকটা হুইস্কি খেল বাবর। খুব দ্রুত সেরে নিল রাতের আহার। তারপর বলল, আলতাফ, আমি একটু অন্যখানে যাব। কাল দেখা হবে।

কাল কোথায় দেখা হবে?

কেন, অফিসে?

ভুলে গেছ, কাল রাওয়ালপিণ্ডি যাচ্ছি।

ওহো তাইতো।

সেই জন্যেই তোমাকে খুঁজছিলাম। চল আমার বাসায়। কাগজপত্র নিয়ে একটু বসব। কমার্স সেক্রেটারির সঙ্গে সেই ফাইলটা নিয়ে–

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে। চল।

আলতাফ তাকে বাসায় এনে আবার একটা হুইস্কি দিল।

আবার কেন?

খাও না? ভাল জিনিস। জাপানের।

বাহ, বেশ চমৎকার তো।

বোতলাটা শেষ করবে নাকি আজ?

তুমি ফাইল বের কর।

ফাইল নিয়ে ডুবে গেল বাবর। কয়েকটা এষ্টিমেট দুজনে বসে আবার দেখল। না, যা করা হয়েছে, ঠিকই আছে। এই ড্রাফটা ভাল করে লেখা হয়নি। নতুন করে আবার লিখে দিল বাবর। কয়েকটা সই বাকি ছিল, সই করল। তারপর বলল, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ফিরছ কবে?

তা এক সপ্তাহ লাগবে।

পারলে একবার করাচি ঘুরে এসো। জাহাজের সেই—

হ্যাঁ, মনে আছে। ওটা তদ্বির করতে হবে।

এবারে একটা ফাইন্যাল কিছু করে আসা চাই-ই।

দেখি। মনে হয় করতে পারব।

আমি চললাম। গুড লাক।

বোতলাটা নিয়ে যাও।

না, থাক।

আরো জাপানি জিনিস।

থাক। ফিরে এসো এক সঙ্গে খাওয়া যাবে।

আলতাফ ফটিক পর্যন্ত এলো। বলল, আর শোন হতরন টেলিফোন করলে নিজে বলতে না পার বল আলতাফ না আসা পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না।

আচ্ছা।

সাড়ে নহাজার খুব কম টাকা নয়।

আমি জানি।

আচ্ছা দেখা হবে।

বাবর তীব্রবেগে গাড়ি ছুটিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ল। তারপর গাড়ি থামিয়ে পকেট থেকে নোটবুক বের করে দেখে নিল হতরনের বাড়ির ঠিকানা। বাড়িটা খুঁজে পেতে দেরি হলো না। দরোজায় বিজলী বোতাম টিপল সে। একজন এলো। তাকে বলল, সাহেবকে ডেকে দাও।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন তিনি। বাবরকে দেখেই বিস্ময়ে স্থলিত গলায় বলে উঠলেন, আপনি?

হ্যাঁ, আমি।

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বাবরের হাত চেপে ধরলেন। আমার কথা শুনেছেন সব?

হ্যাঁ শুনেছি।

আপনার কী মনে হয়, আমার বাড়ি ওয়াচ করছে ওরা?

ভয় পাবেন না। গাড়ি দূরে পার্ক করেছি। আমি এসেছি। কেউ জানবে না।

আমি, আমি কিন্তু গয়নাগুলো নিয়ে এসেছি।

জানি।

আপনাদের কাজটা করে দিতে পারলাম না। এদিকে এই বয়সে দেখুন দিকি, একটা কিছু হলো লজ্জায়–সামনে মেয়ের বিয়ে–অথচ জানেন, বহু অফিসার যারা রিয়ালি কিছু করেছে, তারা দিব্যি আছে, তাদের নাম পর্যন্ত কেহ করছে না।

আপনি শান্ত হয়ে বসুন।

বসছি, বসছি। এখন কী হবে। বলতে পারেন?

কী আর হবে? যা হবার তাই হবে। ঘাবড়াচ্ছেন কেন?

না। ঘাবড়ে আর কী হবে। চা খাবেন?

থাক, কষ্ট করবেন না। আলতাফের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

না।

টেলিফোন করেছিল?

না। কেন বলুন তো?

আপনার মেয়ের বিয়ে কবে?

সামনের বারো তারিখে।

কেনাকাটা সব হয়ে গেছে?

জি, এক রকম সবই হয়েছে। যদি লিষ্টে আমার নাম বেরোয় তাহলে কী করে যে বিয়ের দিন সবার সামনে দাঁড়াব। আচ্ছা, আপনি আলতাফ সাহেবের কথা জিগ্যেস করলেন কেন? উনি হাই সার্কেল থেকে কিছু শুনেছেন নাকি? আমার নাম আছে?

সত্যি, আপনি ছেলে মানুষের মত করছেন।

ভদ্রলোক তখন দুহাতে মাথা চেপে শূন্যদৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। এক আধবার চেষ্টা করলেন শুকনো ঠোঁটজোড়া জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিতে। কিন্তু সে শক্তিটুকু তার দেহে অবশিষ্ট নেই। জিভটা বেরিয়েও যেন বেরুল না। দেখে হাসি পেল বাবরের। কিন্তু না, হাসলে নিষ্ঠুরতা করা হবে।

ভদ্রলোক হঠাৎ চোখ তুলে কিছু একটা বলার জন্যেই যেন বললেন, আপনি এলেন বাবর সাহেব, খুব ভাল করেছেন। সারাদিন ঘরের মধ্যে ছটফট করেছি। রোজা ছিলাম। তারাবির নামাজ পর্যন্ত পড়তে যাইনি। আমার এই বড় মেয়েটা বুঝলেন বাবর সাহেব খুব আদরের। ছেলেটাও ভাল পেয়েছি। এ রকম ভাল পাত্র পাওয়া ভাগ্যের কথা; এবার এমআরসিপি করে ফিরেছে। আলতাফ সাহেব এলেন না?

কী বলতে কী বলছেন ভদ্রলোক। এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যাচ্ছেন ঠিক যেন একটা চড়াই। না, উপমাটা ঠিক হলো না। মাথার ভেতরে হুইস্কি কাজ করতে শুরু

করেছে। বাবর দেখেছে, একটু বেশি সুরা পান করলেই এ রকম হাস্যকর কথা সব তার মনে পড়তে থাকে।

হতরন সাহেব আবার নীরব হয়ে গেলেন। আবার তার ঠোঁট শুকিয়ে এলো। আবার তিনি জিভ দিয়ে তা ভেজাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলেন। এবারে তিনি বাবরের দিকে ভীত কিন্তু গভীর চোখে তাকিয়ে অনুমান করতে চেষ্টা কলেন কেন সে এসেছে। তার ভীষণ অস্বস্তি হতে লাগল। কেন লোকটা বলছে না। তার আসার আসল উদ্দেশ্য কী?

কিন্তু বাবর নিজে যে কোন চুপ করে আছে তা সে নিজেও বলতে পারবে না। একবার তার মনে হচ্ছে, সে গভীর ভাবে কী ভাবছে, আবার মাচ্ছে, না ভাবছে না। শূন্যতা, অসীম এক শূন্যতার মধ্যে বিনিসুতো ঝুলে আছে সে।

সোয়াতের গিরিশৃঙ্গগুলোর ফাঁকে ফাঁকে যেমন নীল শূন্যতা, শীতল শূন্যতা, স্তব্ধ শূন্যতা– এ যেন তেমনি। বাবর একবার মনোযোগ দিয়ে দেখছে–হতরন সাহেবের পা জোড়া যেন সেখানে কোনো দুর্বোধ্য লিপিতে কিছু লেখা আছে। আবার সেখানে থেকে চোখ ফিরিয়ে ভদ্রলোকের গালে কাটা জায়গাটা দেখছে। দেখতে দেখতে সেই দাগটা এত বড় হয়ে গেল যে তাতে আবৃত হয়ে গেল দৃশ্যমান সব কিছু। কোথায় যেন ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে। ঝরে যাচ্ছে। আশা, উদ্যম, বর্তমান, ফোঁটায় ফোঁটায় নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে। বাবরের হাতে সিগারেট পুড়ছে। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে ছাই। আস্তে আস্তে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে ধনুকের মত। বাবর উদ্বেগ নিয়ে এখন তাকিয়ে দেখছে কখন খসে পড়বে হাইটুকু। এই বুঝি পড়ে। এই বুঝি পড়ল। না, এখনো কিছুটা শক্তি, কিছুটা

আকর্ষণ অবশিষ্ট আছে। বশির মত বাঁকা হয়ে এসেছে, তবু ধূসর সুগোল দীর্ঘ ছাইটা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে না সিগারেট থেকে।

হতরন সাহেব বলে উঠলেন, বাবার সাহেব?

বাবর সচকিতে তাকাল তার দিকে। অভ্যাসবশত এক টুকরো হাসিও ফুটে উঠল তার সমস্ত মুখে।

বলুন।

বাবর ছাইটা নিজেই ঝেড়ে ফেলে দিল।

আমি এই এত বছর চাকরি করলাম, মনে করতে পারেন লাখ লাখ টাকা বানিয়েছি। সবাই তাই মনে করে। গভর্ণমেন্টও তাই মনে করছে। কিন্তু শুনলে অবাক হবেন, আমার ব্যাংকে একটা পয়সাও নেই। বড় কষ্ট করে জীবনটা চালিয়ে এলাম। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে পেরেছি, ঐ যা। কিন্তু একটা বাড়ি বলুন, এক টুকরা জমি, বেনামিতে টাকা–কিছু না। শুনি, আমাদের কোনো কোনো সাহেবের ফরেনে টাকা পয়সা আছে—

থাক ওসব। নাইবা বললেন।

না, না, বলছি। এই জন্যে যে, আপনাদের কাজটা করে দিতে চেয়েছিলাম বলে মনে করবেন না, আমি যে আসে তার জন্যেই করি। আপনারা মানে আপনাকে আমি অন্য চোখে দেখি। আপনিও রিফিউজি, আমিও আমার পৈতৃক বাড়িঘর জমিজমা সব মুর্শীদাবাদে ছেড়ে এসেছি। মেয়েটার বিয়ে যে কষ্ট করে দিতে হচ্ছে তা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না–আপনারা আমার মেয়েকে নিজের মনে করে কিছু দিতে চেয়েছিলেন– বলতে বলতে ভদ্রলোক উদগ্রীব চোখে তাকালেন বাবরের দিকে। কথা শেষ করতে পারলেন না। ভয়, পাছে বাবর তার প্রতিবাদ করে। কে জানে হয়ত সে জন্যেই এত রাতে সে এখানে এসেছে কি-না।

বাবল বলল, আমি সেই ব্যাপারে এসেছি।

কেন, কিছু–অন্য রকম কিছু–মানে–বলুন।

গয়নার টাকাটা আমরা দেব বলেছিলাম।

সে আপনাদের দয়া।

বাবরের হঠাৎ রাগ হলো ভদ্রলোকের দীনতা দেখে। এরা পৃথিবীতে বাস করে কী করে? তার সামনে বাবর তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজেকে ঈশ্বরের মত মনে করতে বাধ্য হচ্ছে। বাবরের হাতে তার সব কিছু নির্ভর করছে এখন– অথচ বাবর মোটেই তা উপভোগ করতে পারছে না। তাই সে চুপ করল।

ভদ্রলোক বললেন, গয়না। আমি নিয়ে এসেছি। এখন—

জানি। টাকাটা দেব বলেছিলাম।

হ্যাঁ।

টাকাটা চেকে দিলে অসুবিধে হতো। আপনার নাম জানি না লিষ্টে আছে কি-না। কিছু চিন্তা করবেন না। টাকাটা নগদ কাল আপনি পেয়ে যাবেন। আমি দিয়ে যাব।

ভদ্রলোকে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। এক মুহূর্তে তার চেহারাটা আলো হয়ে উঠল। তিনি কিছু শব্দ খুঁজলেন, কিন্তু পেলেন না। শেষে বললেন, একটু চা খান।

না, আমি চলি। এই কথাটা বলতে এসেছিলাম।

অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে কী আর বলব।

আর শুনুন, আলতাফ যেন না জানে।

আমার মেয়ের বিয়েতে আসবেন না?

আসব। চলি এখন।

কিছু খেলেন না?

আবার কোনোদিন।

আচ্ছা, আমার নাম কী লিষ্টে আছে বলে মনে করেন?

আমি খবর পাইনি। ভয়ের কি আছে। বিপদ তো পুরুষ মানুষের জন্যেই। ভয় করলেই ভয়।

তবু, এই বয়সে মান সম্মান।

আমি যাচ্ছি। কাল টাকা পাবেন।

ভদ্রলোক বাবরকে দরোজা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার শক্তি পর্যন্ত পেলেন না। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ঘরের মাঝখানে।

ঘরে এসে শুতে যাবে হঠাৎ বাবরের মনে পড়ল বাবলির কথা। দৌড়ে সে টেলিফোনের কাছে গেল। রিসিভারটা তুলল। নামিয়ে রাখল। নিজের বুকের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছে সে

স্পষ্ট। হাতঘড়িটা খুঁজল। বাথরুমে খুলে রেখেছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত শরীর যেন পাকিয়ে উঠল একটা দীর্ঘ স্ক্রুর মত। ঘড়িতে সাড়ে বারোটা বাজে। সে বলে এসেছিল, বাবলিকে, এগারটায় তার টেলিফোনের অপেক্ষা করতে। বাবলির দুটো স্তন আবার সে দেখতে পেল ঘড়ির ডায়ালে। আর নাকে সেই অস্পষ্ট সুঘ্রাণ।ধীরে, যেন স্বাস্থ্যস্বচ্ছল। খোকা মায়ের কোলে ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তেমনি নড়ে চড়ে উঠল তার শিশ্ন। বড় হতে লাগল। উত্তাপ বিকিরণ করতে শুরু করল। উত্তাপে, আয়তনে, সে তার দেহের চেয়েও বিশাল হয়ে উঠল যেন। তারপর আবার হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল। শীতল হয়ে গেল। অস্তিত্ব অবলুপ্ত হলো তার। বাবর টেলিফোনের কাছে এলো।

এখন ডায়াল করবে বাবলিকে? এই মাঝ রাতে, যখন ওদের বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, নিস্তব্ধ হয়ে গেছে চারদিক। গভীর রাতে টেলিফোনের আওয়াজ বড় উচ্চগ্রামে বাজে। যদি সবার ঘুম ভেঙ্গে যায়? যদি বাবলির ভাই টেলিফোন ধরে? যদি বাবলিই ধরে আর পাশের ঘরে কান খাড়া করে থাকে তার ভাবী?

হাসি ফুটে উঠল বাবরের ঠোঁটে। খেলারাম, খেলে যা। মন্দ কী? বাবর প্রলুব্ধ হলো বিপদের সামনা করতে। বিপদ যদি আসেই দেখা যাক না আমি কী করে সামলাই। রিসিভারটা তুলে নিল বাবর। ধীরে, একটার পর একটা নম্বর ঘোরাল সে। শুনল অন্য দিকে বেজে উঠল টেলিফোন। কিম্বা এত দ্রুত যে, বেজে ওঠার আগেই কেউ রিসিভার তুলল। কিন্তু অপর পক্ষ কোনো সাড়া দিল না।

গাঢ় হিংস্র একটি স্তব্ধতা।

তখন বাবর বলল, হ্যালো।

সে স্তব্ধতা আরো বিকট হয়ে উঠল।

বাবর আবার বলল, হ্যালো।

তবু সেই স্তব্ধতা হত্যা করে কেউ উত্তর দিল না। কিন্তু আশ্চর্য, বাবরের মনে হলো স্তব্ধতা এখন তার হিংস্র নখরগুলো গুটিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। ঘুমিয়ে পড়ছে। বাঘের সুবর্ণ পিঠে ধীরে ধীরে সূর্যোদয়ের আলো এসে পড়ছে। নির্মল বাতাস বইতে শুরু করেছে দিগন্তের দিক থেকে।

বাবর অত্যন্ত কোমল প্রশান্ত কণ্ঠে প্রায় ফিস ফিস করে উচ্চারণ করল, হ্যালো।

অপর দিক থেকে জবাব এলো, এখন পৌন একটা বাজে।

বাবলি! বাবলি! বাবলি!

নামটা বারবার উচ্চারণ করেও তাপ্তি হলো না বাবরের। যেন এই উচ্চারণের মধ্য দিয়ে টেলিফোনের তারের ভেতর দিয়ে তার ঈষৎ কম্পিত দুটো হাত বাবলির শ্যামল মুখটাকে আদর করতে লাগল।

বাবলি তুমি জেগে আছ? কী করছ বাবলি? কোন ঘরে টেলিফোন? বাবলি, তুমি রাগ করেছ? আমি এগারটায় টেলিফোন করেছিলাম।

মিথ্যে কথা।

তুমি টেলিফোনের কাছে ছিলে?

বাবলি তার উত্তর করল না।

ছিলে তুমি টেলিফোনের কাছে?

আপনি মিথ্যে কথা বলেন।

হাসল বাবর। বলল, হ্যাঁ মিথ্যে বলেছি। তোমাকে মিথ্যে বলে দেখলাম কেমন লাগে। তুমি আমাকে বকবে না। বাবলি? বকো না? আমি খুব খারাপ। আমি খুব খারাপ লোক। তোমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছি।

জি না, আমি আপনার জন্যে বসেছিলাম না।

টেলিফোন তোমার ঘরে? ঘুমুচ্ছিলে? আজ জান, সারাক্ষণ তোমার কথা মনে পড়েছে। মনে হয়েছে। জীবনের সবচে ভাল একটা দিন আমার আজ। এই দিনটার জন্যেই আমার জন্ম হয়েছিল। বাবলি! তোমাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে। কাল আসবে?

না।

এসো না কাল?— আচ্ছা, পরশু সকালে। কলেজ যাবার পথে।

না।

তুমি খুব রাগ করেছ। এত রাগ করতে নেই। আমি তোমার ভাল চাই। তুমি কত বড় হবে। কত নাম হবে তোমার। তোমার বিয়ে হবে। আমি তোমার বাড়িতে বেড়াতে যাব। আচ্ছা, আমি গেলে আমাকে কী খেতে দেবে?–বল। বল? বাবলি?–না, তুমি সত্যি রাগ করেছি। আমাকে একবার বকে দাও। বাবলি? সত্যি একটা জরুরি কাজে এমন আটকে গেলাম, তাছাড়া টেলিফোনটাও খারাপ ছিল, এই একটু আগে ঠিক হয়েছে। মাত্র কয়েক মিনিট আগে। বিশ্বাস কর।

আপনি মনে করেন, আমি ছেলে মানুষ, না?

যাক, কথা বললে তাহলে। আমি ভাবলম, আর কোনোদিন আমার সঙ্গে কথা বলবে না।

আপনি মনে করেন, আমি কিছু বুঝি না?

তা কেন? তুমি সব বোঝা। তুমি সব বোঝ বলেই না আজ তোমাকে এত আদর করলাম। আসবে না কাল?

টেলিফোন আপনার খারাপ ছিল না।

তুমি রিং করেছিলে নাকি?

না।

তাহলে কী করে বুঝলে?

হ্যাঁ, করেছিলাম।

আমি বাসায় ছিলাম না। এই তো? বাইরে আটকে গিয়েছিলাম। চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে সাহেব এসেছেন তার সঙ্গে কিছু আলোচনা ছিল। উনি কালকেই ইয়োরোপ যাচ্ছেন। আবার দশদিন পর ঢাকায় আসবেন। তোমার জন্যে একটা মজার জিনিস আনতে দিয়েছি তার কাছে।

চাই না। আমি আপনার জিনিস।

কেন? এত রাগ করলে আমি কোথায় যাব বলতে পার?

যেখানে আপনার খুশি। আপনার কত জায়গা।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। কিন্তু তারা আমার আপন নয়।

আমিও আপনার কেউ না।

তুমি আমাকে টেলিফোন না করার জন্যে যে শাস্তি দেবে তাই নেব।

আমি আপনাকে টেলিফোন করতে বলিনি।

আচ্ছা শোন, এসব টেলিফোনে হয় না। কাল তুমি এসে আমাকে খুব করে বকে দিয়ে যাও। আসবে না?

কোনোদিন আর আসব না।

কেন?

জাহেদার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

কবে?

আজ।

আমার এখান থেকে যাবার পর?

হ্যাঁ।

কেমন আছে ও?

মিথ্যেবাদী। আপনার সঙ্গে ওর সোমবারেও দেখা হয়েছে।

তাই বলে কেমন আছে জিগ্যেস করতে নেই আজ?

আপনার চিঠি দেখলাম।

হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে উঠে এলো বাবরের। বলল, দেখলে?

হ্যাঁ।

ও দেখাল?

জাহেদা তোমাকে দেখাল?

যে ভাবেই হোক, আমি দেখেছি।

তারপর?

ঘটনার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বাবর বলল, তারপর কী?

আবার কী? আপনি কোনোদিন আমাদের বাসায় আসবেন না। যদি আসেন ভাইয়াকে সব বলে দেব।

বেশ, আসব না।

আপনি, আপনি একটা ইতর। আপনি মানুষ না। আপনি সব পারেন। টেলিফোন রাখার শব্দ শুনল বাবর।

বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সে। তাকিয়ে রইল বাতির দিকে। কেমন একটা অস্পষ্ট রামধনু বাতিটা ঘিরে স্থির হয়ে আছে। কোথায় যেন সে শুনেছিল, এটা একটা ব্যাধিবাতির চারদিকে এই রামধনু দেখাটা। কালকেই একবার চোখের ডাক্তারের কাছে

যেতে হবে। এই যে মাঝে মাঝে মাথাটা একটু টিপ টিপ করে এটাও বোধহয় এই চোখেরই জন্যে। কিন্তু সে তো সব কিছুই পরিষ্কার দেখতে পায়। পড়তে পারে। নাকি, বর্ণকানা হয়ে যাচ্ছে?

বাবর হাসল। বর্ণকানা? মন্দ কী? লালকে বেগুনি দেখবে। সবুজকে নীল। আমরা কি বর্ণের সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনা এই দুটো চোখ দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি? আমি একটা গাছের পাতাকে যতটুকু সবুজ দেখি, যে সবুজ দেখি, আরেকজন কি ঠিক তাই দেখে?

আজ হুইস্কিটা একটু বেশি হয়ে গেছে।

আশ্চর্য, পরপর দুদিন দুটো মেয়ে প্রায় একই কথা বলল। বাবর কোনো কারণ খুঁজে পায় না, কেন লতিফা তাকে ঐ কথাগুলো বলেছে। কেন সে লেখাপড়া ছেড়ে বিয়ের কনে হতে চলেছে? আর জাহেদাই বা কী রকম? চিঠিটা বাবলি দেখল কী করে? কী লিখেছিল। সে চিঠিতে? কথাগুলো মনে আছে? না। বক্তব্যটা মনে পড়ছে, শব্দগুলো মনে নেই। বাবলি দেখেছে চিঠিটা। দেখেছে? না, জাহেদা দেখিয়েছে? জাহেদা কেন হঠাৎ দেখাতে যাবে? তাহলে জাহেদা কি তার সাথে যাবে না? জাহেদা তো বলেছিল, যাবে। তারা দুজন এক সঙ্গে উত্তর বাংলা যাবে।

খেলারাম, খেলে যা। বাবলি জেনেছে, জানুক। কাল যদি বাবলি তার বাসায় আসে তাতেও আশ্চর্যের কিছু নেই। ঐ বয়সের মেয়েরা বরং আসব না বলেই আসে। না বলে

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

হ্যাঁ করে। বাবলি এলে, কাল তাকে আর সে ছাড়বে না। শুধু আদর নয়, চুমো নয়, কথা নয়। বাবলিকে সে কাল সোজা বিছানায় নিয়ে যাবে।

বাবর শুধু এই কথাটা ভুলে গেছে, বাবলি স্পষ্ট বলে দিয়েছে, সে আসবে না। বোধহয় হুইস্কির জন্যে তার এখন বিশ্বাস করতে কোনো বাধা হচ্ছে না যে বাবলি কাল আসবে।

বাবর টের পায় আবার তার দুপায়ের মাঝখানে উত্তাপ বাড়ছে। বড় হচ্ছে। তার দেহকে ছাপিয়ে উঠছে আয়তনে। বাবর উপুড় হয়ে শুল। শাসন মানল না। তবু বড় হতে লাগল। উত্তাপে উত্তেজনায় যেন সেখানে ছোট ছোট ড্রাম বাজানোর কাঠিতে বাড়ি পড়তে লাগল। সৃষ্টি হতে লাগল একটা দ্রুত লয় ছন্দের। লয়টা দ্রুত থেকে আরো দ্রুত হতে লাগল। চোখের ভেতরে বাবলিকে সে দেখতে পেল স্পষ্ট। নির্বাক। নগ্ন। কাছে, আরো কাছে। সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে তাকে অনুভব করতে লাগল বাবর।

আরো কাছে।

বাবলি এখন তার দেহের সঙ্গে এক। আর যুগলে যেন বাজছে সেই ছোট ছোট ড্রাম। দোকানে দেখা খেলনা ড্রাম। নীল রং চারদিকে। মাঝখানে একটা উজ্জ্বল লাল রেখা। বৃত্তাকারে ঘুরছে নীল, লাল, নীল। আবার নীল, আবার লাল, আবার নীল। ঘুরতে ঘুরতে রং দুটো একাকার হয়ে গেল। বাজনার দ্রুত লয় যেন বাবরের অস্তিত্বকে অতিক্রম করে এখন হঠাৎ শেকলকাটা পাখিব মত উড়ে গেল উর্ধে আকাশে, শূন্যে। উজ্জ্বল রোদে পুড়ে যেতে লাগল বাবরের চোখ। সে দুহাতে সজোরে চেপে ধরল। তার উত্তপ্ত অধীর দ্রুত

স্পন্দিত শিশ্ন। এবং তৎক্ষণাৎ এক বহু আকাঙ্ক্ষিত, মন্ত্রোচ্চারিত, খরচৈত্রের বৃষ্টির আবেগে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে নেবে এলো অন্ধ, অজস্র শাস্ত্রে বর্ণিত চল্লিশ দিন-রাত্রির প্রান্তর পাহাড় ডোবান মুখর জলধারা। বাবর ভেসে যেতে লাগল স্থলিত একটা সবুজ পাতার মত।

দিনের প্রথম কাজ ব্যাংকে যাওয়া। হতরন সাহেবের মেয়ের গহনার দরুন সাড়ে ন হাজার তুলতে হবে। চেক কাটতে ভুলে সাড়ে দশ হাজার লিখে ফেলল বাবর। ভুলটা আর সংশোধন করল না। সাড়ে দশ হাজারই তুলল। এক হাজার নিজের কাছে থাকবে। এত টাকা এক সঙ্গে সাধারণত নিজের জন্যে রাখে না, আজ রাখল। বাবর ঘটনাচক্রে বিশ্বাস করে। কে জানে, কখন কী হয়, কোন কাজে লাগে। নোট নেবার সময় বাবর পুরনো নোটই পছন্দ করল। কিন্তু এমনভাবে পুরনো নোট সে চাইল যেন কারো সন্দেহ না হয়। হতরন সাহেবকে পুরনো নোট দেয়া তার জন্যে, বাবরের জন্যে, উভয়ের জন্যেই নিরাপদ। কেবল নিজের নোটগুলো নতুন দশ টাকায় নিল সে। ম্যানেজার সাহেব জিগ্যেস করলেন, কী ব্যাপার বাবর সাহেব। এক সঙ্গে হঠাৎ এত টাকা ক্যাশ দরকার পড়ল?

একটা জমি কিনব। আজ বায়না হচ্ছে।

তাই নাকি? কোথায়?

বননীতে।

মোনায়েম খাঁর বাড়ির পাশেই নাকি? বলে ম্যানেজার খ্যা খ্যা করে হাসলেন, উচ্চাঙ্গের একটি রসিকতা করছেন। বাবরও তার জবাবে তারই মত খ্যা খ্যা করে হাসল ইচ্ছে করে। ম্যানেজার তা দেখে আরো সুধা ঢেলে উচ্চগ্রামে। এবার খ্যা খ্যা করে উঠলেন। বাবর ব্যাংক থেকে বেরুল।

হঠাৎ মনে হলো, খবরের কাগজে কি হতরন সাহেবের নাম বেরিয়েছে? মোড় থেকে কাগজ কিনে তন্নতন্ন করে দেখল সে। তা, সাসপেণ্ড অফিসারদের নামের লিস্ট আজও বেরোয়নি। তার মানে আর একটা দিন ভদ্রলোক এই রোজার দিনে দারুণ উৎকণ্ঠায় ভুগবেন। এ হচ্ছে স্বয়ং ঈশ্বরের নাটক। বাবর হাসল।

হতরনের বাড়ির সামনে এসে তাকিয়ে দেখল। চারদিক। না, সন্দেহজনক কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। টাকাটা খবরের কাগজে মুড়ে সে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে কলিং বেল টিপল। অপেক্ষা করল। কেউ সাড়া দিল না। আবার বেল বাজাল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দরজা খুলল না কেউ। বেলটা আবার টিপতে যাবে দরজা ফাঁক হলো। দেখা গেল হতরন সাহেবের নিশিজাগা চেহারা।

বাবর বলল, এই যে। এবং খবরের কাগজের মোটা মোড়কটা হাতে তুলে দিল তাঁর। বলল, এতে আছে।

উত্তরের অপেক্ষা না করে সে ফিরে এলো গাড়িতে। আবার চারদিকে দেখল। একটা লোক গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে দূরে। আই বি-র লোক? আচ্ছা, দেখাই যাক। বাবর একটা সিগারেট বের করে। এ-পকেট ও-পকেট হাতড়াবার ভাণ করল। তারপর লোকটার কাছে গিয়ে বলল, দেশলাই আছে?

লোকটা যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। দেশলাই বার করে দিল বাবরের হাতে। না, গোয়েন্দা হলে এতটা কৃতার্থ হতো না। বাবর সিগারেট ধরিয়ে গাড়িতে ফিরে গেল, আয়নাটা একটু ঘুরিয়ে দিল যাতে লোকটাকে দেখা যায়। খুব ধীরে গাড়ি চালাল সে। কিছু দূর গেল। দেখল লোকটা এবার চারদিক দেখে গাছতলায় বসল প্রস্রাব করতে।

যাঃ বাবা। এই ব্যাপার? সেই জন্যে লোকটাকে আমন উসখুস করতে দেখা গিয়েছিল? বাবর গাড়ির গতি বাড়িয়ে পলকে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল তখন।

ঘড়ি বলছে, দশটা দশ। জাহেদা নিশ্চয়ই এখন হোস্টেলে নেই। ওর সঙ্গে দেখা করা দরকার। প্রথমত, বাবলি কী করে তার চিঠি দেখল। দ্বিতীয়ত, উত্তর বাংলায় জাহেদা যেতে রাজি কি-না। এই দুটো ব্যাপার পরিষ্কার করা দরকার।

হোস্টেলের দারোয়ানকে সে জিগ্যেস করল জাহেদার কথা।

আচ্ছা দাঁড়ান, দেখে আসি।

শিগগির।

আরেকটা সিগারেট ধরাল বাবর। পায়চারি করল খুব ছোট পরিসরে। গাছপালার মাথায় আলোর নাচন দেখল। তখন ফিরে এলো দারোয়ান।

রুমে নেই।

ও। আচ্ছা। এলে তাকে বলবে—না থাক, আমি আবার আসব। বাবর এয়ারপোর্টে এলো। সকালে ঘুম থেকে এত দেরি করে উঠেছিল যে, নাশতা খাবার সময় ছিল না। খিদেও ছিল না তেমন। এখন প্রচণ্ড খিদে করে উঠল। সে রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসল। আলতাফের প্লেন সকাল পৌনে আটটায় ছেড়ে গেছে। আলতাফ কি কাজগুলো ঠিক মত গুছিয়ে আসতে পারবে? ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবল খানিক বাবর। এখন সময় খুব সুবিধে যাচ্ছে না। হতরন সাহেব কাজটা দেবেন বলেছিলেন, তিনি নিজেই এখন কাৎ। এর আগে একটা কাজে বিশেষ কিছু থাকেনি। আজ সাড়ে নহাজার টাকা অমনিই চলে গেল। না দিলেও পারত। আলতাফ না দিতেই বলেছে। কিন্তু তার যে কী হলো, হঠাৎ মনে হয়েছিল টাকাটা না দেয়া খুব বড় রকমের অন্যায় হবে।

অনুতাপ বাবরের স্বভাববিরুদ্ধ। যারা অনুতাপ করে তারা এগোয় না। অনুতাপ একটি শিকলের নাম। কী করলাম সেটা বড় নয়, কী করছি সেটাই বিবেচ্য। বিলেতে থাকতে একটা নাটক দেখেছিল বাবর। তার একটা কথা এখনো মনে আছে তার। মেয়েটি জিগ্যেস করেছিল, আমি কোথায়? ছেলেটি তার উত্তরে বলেছিল, অতীত এবং ভবিষ্যতের

মাঝখানে, যেখানে তুমি আগেও ছিলে, এখন আছ এবং পরেও থাকবে। অসংখ্য বর্তমানের গ্রন্থনা আমাদের জীবন।

রুটির ওপর পুরু করে মাখন লাগাল বাবর। আবার সন্তর্পণে সমস্ত মাখন চেছে তুলে ফেলল। এমনিতেই মোটা হয়ে যাচ্ছে সে। এত মাখন খাওয়া কাজের কথা নয়। পোচ করা ডিম দুটিকে মনে হলো যেন কোনো সর্পনারীর স্তনযুগল। বাবর কাটার আঘাতে তা ভাঙলো। গড়িয়ে পড়ল গাঢ় হলুদ রস, যেন এক জণ্ডিস রোগাক্রান্ত মানুষের বীর্য যা শীতল রক্ত মানুষের জন্ম দেবে।

এই উপমাটা আলতাফকে একদিন সে নাশতা খেতে খেতে বলেছিল। তারপর থেকে সপ্তাহখানেক নাকি আর আলতাফ ডিমের পোচ মুখে তুলতে পারেনি।

আলতাফ বলেছিল, তোমার একটা বড় দোষ কি জান? তুমি সেক্স ছাড়া কিছুই ভাবতে পার না। সর্বক্ষণ ঐ এক কথা ভাবছি, সব কিছুতেই ঐ এক জিনিস দেখছ।

কেন নয়? মানুষের জীবনে বড় সত্য কী বল?

আলতাফ বলেছিল, তুমি বল।

আসলে আলতাফ অতশত বোঝে না। হিসেবটা বোঝে। আসবাব-পত্রের শখ আছে। আর মা বলতে অজ্ঞান।

বাবর বলেছিল জীবনে একটা ঘটনাই সত্য। তা হচ্ছে মৃত্যু।

বলে যাও।

মৃত্যু কীসে সম্ভব?

সব কিছুতেই। অসুখে-বিসুখে, ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করে আত্মহত্যায়, আর কত কিছুতে।

আমি তা বলছি না। মূলত মৃত্যু দুপ্রকারে আসতে পারে। এক ক্ষুধায়। আর এই কাজটা যাকে ভাল বাংলায় যৌনসঙ্গম বলে, তার অভাবে।

ক্ষুধায় না হয় মানুষ মরে স্বীকার করি, কিন্তু ঐ কাজ না করলে মানুষ মরবো কেন? বহু চিরকুমার আছে। পথে ঘাটে।

আমি ব্যক্তিবিশেষের কথা বলছি না। মনে কর যদি কোনোক্রমে আজ গোটা মানুষের মধ্যে যৌনসঙ্গম বন্ধ করে দেয়া যায়, তাহলে? নতুন মানুষ জন্মাবে না। এক পুরুষ পরে পৃথিবীতে মানুষ নামে কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব থাকবে না।

তোমার সব অদ্ভুত কথা।

অদ্ভুত শোনালেও অবাস্তব নয়। আমি বলছিলাম ক্ষুধা আর যৌনজীবন মানুষকে যুগ থেকে যুগ বংশ থেকে বংশ আবিষ্কার থেকে আবিষ্কারে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার দুটি শক্তির নাম। এ ছাড়া তৃতীয় কোনো শক্তি নেই। আমি যেমন ক্ষুধাকে জয় করবার জন্যে কাজ করছি, তেমনি ঐ দ্বিতীয়টার জন্যেও সময় দিচ্ছি।

বাবর পয়সা দিয়ে বেরিয়ে এলো।

আহার্যে সে আজকাল আর আগের মত স্বাদ পায় না। ক্ষুধা হয়। কিন্তু খেতে ইচ্ছে করে না। খেতে বসে কিন্তু ডিশ পছন্দ হয় না। আগে কত অল্প সময়ে মেনু দেখে বলে দিতে পারতএইটে খাবে। এখন মেনু নিয়ে দীর্ঘ সময় কেটে যায়, মনস্থির করা যায় না। আগে এমন হতো ক্ষুধা বোধ হবার মুহূর্ত থেকে স্পষ্ট দেখতে পেত, চোখের সমুখে খাদ্যের ছবি। কল্পনায় উত্তপ্ত সুঘ্রাণ এসে নাকে লগত তার। এমনকি পরিবেশটাও ভেসে উঠত চোখেটেবিল, সাদা চাদর, সবুজ ন্যাপকিন, ঝকঝকে প্লেট, বুদবুদ জড়ান ঠাণ্ডা পানি। এখন সেই প্রখর মনটা আর নেই। কোনো রেস্তোরাঁই পছন্দ হয় না তার। কোনো সার্ভিসই যথেষ্ট তৃপ্তিদায়ক বলে মনে হয় না। বকশিস দেয়াটা বাহুল্য বোধ হয়। এখন সে মাত্র একটি সিকি বকশিস করেছে।

আবার সে এলো জাহেদার হোস্টেলে। দারোয়ান তাকে দেখে এগিয়ে এলো। বলল, আপা এখনো ফেরেনি।

আমি জানি।

হোস্টেলের সঙ্গেই কলেজ। বাবর গাড়ি ভেতরে ঢুকিয়ে কলেজের মাঠে গিয়ে থামল। এই কাঠবাদাম গাছটা তার ভারি পছন্দ। কেমন শান্ত, সহনশীল, শীতল, ছেলেবেলার বন্ধুর মত। বাবর একটা সিগারেট ধরাল। তাকিয়ে রইল অজস্র সচ্ছল ডালপালার দিকে। আলতাফ রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনো কাজ নেই। পিণ্ডি থেকে কাজ ঠিক মত গুছিয়ে আনতে পারবে কি-না ও, তাই বাঁ কে জানে। বরং সে নিজে গেলেই পারত। কিন্তু যাতায়াতটা বেশি পছন্দ করে আলতাফ, হোটেলে থাকা, ট্যাকসিতে করে ছুটোছুটি করা ফেরার সময় বাড়ির জন্যে জিনিসপত্র কেনা। বাবরের জন্য গতবার ও সুন্দর একটা স্কাফ এনেছিল। লাল জমিনের ওপর সবুজ কলকে তোলা। ঠিক এই বাদাম গাছটার মত সবুজ। আর সবচে বিস্ময়কর যে, কোনো গাছে এক মাত্রার সবুজ থাকে না, অসংখ্য মাত্রার সবুজ মিলে একটা বর্ণের সৃষ্টি হয়। কাছে এলে, একটা একটা করে পাতা লক্ষ করলে তবে বোঝা যায় প্রকৃতির এই কারিগরিটা। এদিক থেকে মানুষের সঙ্গে একটা আশ্চর্য মিল আছে। অমিলও কি নেই? কাছে এলেও মানুষের সব রং তো চোখে পড়ে না।

আমাকে কে কতটুকু জানে? বাবর ভাবল এবং হাসল। বাবর কি সেই জন্যেই এমন একেকটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায় যাতে আরো অচেনা হয়ে যায় অপরের কাছে? এতে সে মজা পায়। মনে মনে হাসার সুযোগ হয় আরো। নিজেকে এক নির্বোধের পৃথিবীতে চতুর কোনো যাদুকর বলে মনে হয় তার।

আমি জীবনের যাদুকর এক নির্বোধ পৃথিবীতে।

বাক্যটা নিজের কাছেই খুব চমকপ্রদ মনে হলো বাবরের। তার কবরের ওপর লিখে দিলে হয়। বাবর যেন চোখেই এখন দেখতে পেল তার কবর, তার মাথার মার্বেলে লেখা ঐ পরিচিতি, ঐ ঘোষণা, ঐ শব্দ সমূহের অন্তরালে প্রবহমান অট্টহাসি।

আরেকটা সিগারেট ধরাল সে। সিগারেটেও আজকাল আর তেমন স্বাদ নেই। কত রকম ব্রাণ্ড বদলেছে, দেশী, বিদেশী, কিন্তু কোনোটাই তাকে তার ক্রীতদাস করতে পারেনি। এখন সে যে সিগারেট খাচ্ছে তার নাম একজন জলদস্যুর নামে রাখা, যে নিউইয়র্ক শহরের পত্তন করেছিল বলে জানা যায়।

কোথায় একটা ঘণ্টা বাজল। নড়েচড়ে বসল বাবর। চোখে কালো চশমা পরে নিল। হাত দুটো জড় করে রাখল স্টিয়ারিংয়ের ওপর।

না, জাহেদাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বাতাসে টুপটাপ করে পড়তে থাকা ফুলের মত মেয়েরা সবুজ মাঠটাকে ভরে ফেলল। কেউ দাঁড়াল। কেউ হাসল। কেউ কেউ একজোট হবার জন্যে হাত টানাটানি করতে লাগল। কেউ অন্য ক্লাশে ঢুকল। এর মধ্যে জাহেদা কই? বাবরের চোখের সমুখে লাল নীল সবুজ হলুদ বেগুনি সাদা কালোর নৃত্য চলছে অত্যন্ত মন্থর তালে। জাহেদা আজ কী রংয়ের জামা পরেছে কে জানে? জাহেদার একটা নীল জামা আছে তার ভারি পছন্দ। আজ যদি সেই নীল জামায় তাকে দেখা যায়, বাবর

নিজেকেই একটা শর্ত দিল, আজ তাহলে সে ঠিক এগারটায় জাহেদার কথা মনে করতে করতে ঘুমুতে যাবে।

আবার সব ফাঁকা হয়ে গেল। মেয়েরা আবার তাদের পরের ক্লাশে গিয়ে বসল। আবার শুধু রইল সে। তার সিগারেট আর কাঠবাদাম গাছটা। ছেলেবেলার মত আবার একা হয়ে গেল সে।

সে না হয় জাহেদাকে দেখতে পায়নি। জাহেদাও কি তাকে দেখেনি? দেখে এগিয়ে এলো না কেন? রাগ হলো তার। ক্রমশ এই বিশ্বাসটা হতে লাগল যে, জাহেদা তাকে দেখেও কাছে আসেনি।

তখন আর বসে থাকা গেল না। চাপা আক্রেনশটাকে প্রচণ্ড গতিতে রূপান্তরিত করে সে বেরিয়ে গোল কলেজ থেকে। শুনুক জাহেদা তার গাড়ির শব্দ, শুনুক ক্লাশে বসে থেকে। জাহেদা তার গাড়ির শব্দ চেনে। কতদিন এমন হয়েছে হোস্টেলে গাড়ি রাখতে না রাখতেই ছুটে এসেছে সে।

আপনার গাড়ির আওয়াজ পেলাম।

পৃথিবীর সমস্ত শব্দ শহরের এই বিভিন্ন গ্রামের কোলাহল সমুহ এখন ছাপিয়ে উঠুক। তার গাড়ির শব্দ, বধির করে দিক যে দেখেও কাছে আসে না, বইয়ের পাতায় চোখ রেখে যে নিস্তব্ধ ক্লাশে বসে থাকে এবং নীল জামা পরে চিত্ত হরণ করে।

খেলে যা, খেলারাম খেলে যা।

আপিসে এলো বাবর। এয়ারকন্ডিশন করা নিজের কামরায় ঢুকতেই শরীরটা যেন স্বচ্ছন্দ ঝরঝরে হয়ে গেল, তার ভারি আরাম বোধ হলো। চুপ করে বসে রইল। কিছুক্ষণ। তারপর কফি বানাতে বলল।

কোনো টেলিফোন?

না।

কেউ এসেছিল?

না।

ডকুমেন্টগুলো সব ফটোস্ট্যাট করা হয়ে গেছে?

জি।

একতাড়া ডকুমেন্টের ফটো-নকল নিয়ে এলো রহমান। প্রত্যেকটা ভাল করে দেখল। তারপর নিজ হাতে আলমারিতে বন্ধ করে রাখল। জিগ্যেস করল, আলতাফ একটা করে কপি নিয়ে গেছে তো?

হ্যাঁ স্যার, আমি নিজে অ্যাটাচিতে তুলে দিয়েছি।

আজকের কাগজগুলো দিন।

কফি খেতে খেতে প্রত্যেকটা কাগজ দেখল বাবর। কাগজ দেখা মানে দেশ বিদেশের খবর দেখা। ওটা দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় পর্যায়ের জিনিস। প্রথমে সে দেখে দুয়ের পাতায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপন। কোথায় সরকারি বেসরকারি কে কোন কাজ করতে চাইছে, কোন যন্ত্র চাইছে, কোন নির্মাণের জন্যে আহবান জানিয়েছে।

না, আজ কিছু নেই। কাগজগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝের ওপর। পিয়নকে ডেকে বলল, টেবল এত এলোমেলো থাকে কেন? লাল নীল পেন্সিল নেই কেন? পেন্সিল কাটা হয়নি। কেন? পেপার ওয়েট উপুড় হয়ে আছে কেন? কেন? কেন? কেন?

নিঃশব্দে বেয়ারা সব ঠিক করতে থাকে, ত্রস্ত হাতে সাজায় গোছায়, পেন্সিলগুলো সরু করতে নিয়ে যায় কম্পিত হাতে।

বাবর উঠে পায়চারি করে। একবার জানালার কাছে। স্বচ্ছ শাদা পর্দার ভেতর দিয়ে নিচে রাজপথ দেখা যাচ্ছে। হারমোনিয়ামের চাবির মত দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি গাড়ি। এত ওপর থেকে পেট্রল পাম্পটাকে মনে হচ্ছে অতিকায় একটা লিপস্টিক। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলে বাবর।

জাহেদা কি তাকে দেখেনি। কাঠবাদামের গাছটার নিচে দাঁড়ালে কলেজের যে কোনো কোণ থেকেই চোখে পড়ার কথা। কিম্বা নাও পড়তে পারে। হয়ত জাহেদা লাইব্রেরীতে গেছে। কমনরুমে আছে। অথবা বান্ধবীদের সাথে টুক করে বেরিয়ে চীনে দোকানে এসেছে খাবার খেতে। চায়নিজ খেতে ভারি ভালবাসে জাহেদা।

কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল একটা তাগিদ অনুভব করল বাবর সেই রেস্তোরাঁয় যাবার জন্যে। বেরুতে যাবে এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোন।

হ্যালো।

বাবার সাহেব?

বিরক্ত হলো বাবর। ব্যাটা হতরন আবার টেলিফোন করতে গেল কেন? তাকে তো তার মেয়ের গহনার দরুন টাকা দেওয়াই হয়েছে।

সরি, বাবার সাহেব নেই।

তবে যে এর আগে যিনি ধরছিলেন তিনি বললেন আছেন।

ছিলেন, বেরিয়ে গেছেন।

কখন আসবেন?

জানি না।

বাসার নম্বর কত?

বাবর ঠাস করে টেলিফোন রেখে দিল। কামরার বাইরে এসে রহমানকে বলল, লাইন দেবার আগে শুনে নিতে পারেন না আমার কাছে?

সারা উনি তো—

আমি জানি উনি কে। উনি হলেই লাইন দিতে হবে কোনো মানে নেই।

আচ্ছা স্যার।

বাবর বেরিয়ে গেল। রহমান কী করে জানবে ভেতরে কত কী হয়ে গেছে। হতরন এখন আর তাদের কোনো কাজেই আসবে না।

লিফটে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজেকে ভাল করে দেখে নিল বাবর। মাথার বাঁ পাশে চুল সরে গিয়ে এক চিলতে টাকি বেরিয়ে পড়েছে। হাত দিয়ে টেনে দেবার চেষ্টা করল। ফলে আরো ফাঁক হয়ে গেল। হেয়ার স্প্রে ব্যবহার করার দোষই এই। চুল ভারি হয়ে যায়। কবার ফাটল ধরলে আর রোধ করা যায় না। ক্রমশ বাড়তেই থাকে। আর স্প্রে না দেয়া পর্যন্ত এই অবস্থা। বাসায় যাবে? কিন্তু জাহেদা যদি চায়নিজ থেকেও বেরিয়ে যায়?

বাবর উর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি চালিয়ে রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকল। না, নেই। ফ্যামিলি রুমে উঁকি দিয়েই বুকটা হিম হয়ে গেল তার। নীল কামিজ পরে জাহেদা বসে আছে। এক পা এগুল। তখন পেছন ফিরে দেখল মেয়েটা। উঃ, কী বীভৎস চেহারা। ঈশ্বর তুমি এখনো আছ স্বীকার করি। পেছনটা অবিকল জাহেদার মত দেখতে।

যাবার উদ্যোগ করতেই বাটলার সসম্ভমে জিগ্যেস করল, বসবেন না স্যার?

না। পরে কখনো।

একবার ভাবল তাকে জিগ্যেস করে, এই রকম বর্ণনার কোনো মেয়ে আরো কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে এসেছিল কি-না। পরে অন্য রকম সিদ্ধান্ত নিয়ে আর থামল না। সোজা গাড়িতে বসে দম নিল। সিগারেটও ফুরিয়ে গেছে।

কন্টিনেন্টালে সিগারেট কিনতে গিয়ে চোখে পড়ল একটা বই। এর আগেও বহুদিন চোখে পড়েছে। আজ যেন বিশেষভাবে পড়ল। বইটার নাম যুদ্ধ নয় প্রেম : জ্বলন্ত ভিয়েতনাম। ঘন কালো চকচকে প্রচ্ছদে গাঢ় লাল রংয়ে লেখা MAKE LOVE NOT WAR–শেষ শব্দটা অজস্র খণ্ডে খণ্ডিত। হাসল বাবর, যেমন সে মাঝে মাঝেই হাসে, একা হাসে।

মিসেস নাফিস তাকে বলেছিল, আপনি ও রকম হাসেন কেন?

কই, নাতো।

আপনি হয়ত লক্ষ করেননি। ভালই দেখায়।

কথাটা শোনার পর থেকে কয়েকদিন চেষ্টা করেছিল বাবর হাসিটাকে সংযত করতে। বদলে আরো বেড়েছে। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে সে। আবার হাসল। কিনল বইটা। বলল সুন্দর একটা প্যাকেট করে দিন।

উপহার দেবেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু ব্রাউন প্যাকেট ছাড়া যে নেই। সরি স্যার।

ঠিক আছে। খোলা থাক।

বইটা নিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল।

সুলতানা বলল, আরে আপনি? কী মনে করে? হঠাৎ?

এই এলাম।

ও তো অফিসে গেছে।

জানি। বাবলিও তো কলেজে?

হ্যাঁ। বসবেন না?

না। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেদিন বাবলি বলছিল ভিয়েতনাম সম্পর্কে খুব ইন্টারেস্টেড। জানতে চায়। এই বইটা ওকে দেবেন।

আচ্ছা।

আর বলবেন, ফেরত দিতে হবে না। ওকে দিলাম।

পেলে খুব খুশি হবে। এক কাপ চা দিই?

না দিলেই বাধিত করবেন।

সুলতানা ভেঙ্গে পড়ল। হাসিতে। বলল, কথা শিখেছেন বটে! আচ্ছা বাবলি এলেই বইটা দেব।

দেবেন। চলি। আবার আসব। এসে অনেকক্ষণ গল্প করব। চলি তাহলে।

গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বাবর তাকিয়ে দেখল পর্দা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সুলতানা। গালের এক পাশে রোদ এসে পড়েছে ছোট্ট একটা চৌকো বিস্কুটের মত। তেমনি সুস্বাদু দেখাচ্ছে। সুলতানা মন্দ নয় দেখতে। আরেকবার তাকে দেখল বাবর এবং চোখে পড়তে পড়তে বিদায়ের হাসি ফুটিয়ে তুলল। যেতে যেতে মনে পড়ল বাবলিদের ঘরে একটা বড় ছবি আছে। সেখানে গালে গাল ঠেকিয়ে হাসছে সুলতানা আর বাবলি। বাবলিকে যদি চুমো দিয়ে থাকি তাহলে তা সুলতানার গালেই দেয়া হলো। ল্যাজে ল্যাজে জোড়া দিয়ে বর্ধমান যাওয়া আর কী? না, হাসি নয়। ল্যাজে ল্যাজে জোড়া দিয়েই কত কী হয়ে গেল। লতিফাকে চিনল তো ঐ করে। জাহেদাকেও। ম্যাজিকের বাক্সের মত। একটার পেট থেকে আরেকটা। শেষ নেই। অনন্ত। এক মেয়ের মারফত আরেক মেয়ে। এক মেয়ে থেকে আরেক মেয়েতে।

একেক সময় বাবরের মনে হয় আসলে ওদের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। জাহেদা, বাবলি, লতিফা, টুনি, রিক্তা, জলি, পপি, সুষমা, মমতাজ, আয়েশা, ডেইজি-সব এক। এক মাপে এক ছাচে, এক রংয়ে বানানো। পেছন থেকে কতদিন সে একজনকে আরেকজন মনে করেছে। চুলের সেই একই বিন্যাস, কাপড়ের সেই একই নকশা, কথার সেই একই ঢং। এমনকি যাদের সঙ্গে তার কখনও আলাপ হয়নি, পথে ঘাটে ভিড়ে, বাজারে দেখা, তারাও ঐ ওদের মত। ওদের ভাবনাগুলোও যেন এক। এক তাদের প্রতিক্রিয়া। এক তাদের পছন্দ।

কেবল একটা তফাৎ আছে। খোলা গায়ের গন্ধটা। কারো গায়ে লেবুর গন্ধ। কারো গায়ে দৈয়ের। খবর কাগজের। বন্ধ সবুজ পানির। মিষ্টি কফি-সিরাপের। পনিরের। কী করে যে ঐ বিচিত্র বিভিন্ন বস্তুর গন্ধ যে ওরা সংগ্রহ করেছে কে জানে। রিক্তার পিঠে মুখ রাখলেই তার মনে হতো। সদ্য খোলা খবরের কাগজে সকাল বেলা নাক ডুবিয়ে আছে সে। জিগ্যেসও করেছিল, কাগজে গড়াগড়ি দিয়ে এসেছ নাকি?

না, নাতো। কেন বল তো।

এমনি।

কী যে সব অদ্ভুত কথা। খবর কাগজ! হি হি হি।

আয়েশাকে সে বলেছিল, আজ নিশ্চয়ই দৈ খেয়েছ।

কী যে বলেন। দৈ আমি কবে খাই? দৈ খেলেই আমার গায়ে চাকা চাকা দাগ হয়।

কিন্তু দৌয়ের গন্ধ পাচ্ছি যে।

তাহলে আপনি খেয়েছেন।

আজ অন্তত বছরখানেক দৈ খাওয়া দূরে থাক, চোখে দেখিনি। সত্যি দৌয়ের গন্ধ পাচ্ছি।

যান ঠাট্টা ভাল লাগে না।

আয়েশা খুব রাগ করেছিল। আয়েশা এখন কোথায়? গেল বছর খুলনা থেকে একটা চিঠি দিয়েছিল, তারপর চুপ? একবার গেলে হতো খুলনায়। নিশ্চয়ই জাঁদরেল একটা গিনী হয়েছে আয়েশা। স্বামীকে একেবারে নখে করে রেখেছে। মেয়েদের এক উচ্চাশা স্বামীকে নখের ডগায় রাখা আর পরপুরুষকে পায়ের তলায়।

যা খেলে যা।

আরেক বার যাবে জাহেদার কলেজে?

এবার কেমন যেন একটু সংকোচ হতে লাগল তার। ব্যাটা দারোয়ানটা লম্বা লম্বা সালাম দেয়। ঘুঘুর মত চোখ রাখে। গলায় আবার একটা রূপের ক্রুশ। যিশু হে, তোমার দুঃখ আমি অঙ্গে ধারণ করে এই পাপের পৃথিবীতে মৃত্যুর আশায় বসে আছি–এই রকম একটা নির্মীলিত ভাব।

আচ্ছা, এই শেষবার যাওয়া যাক। না পেলে তখন আবার ভাবা যাবে। বাবর উলটো দিকে গাড়ি ঘোরাল কলেজের উদ্দেশে।

দারোয়ান নেই। গাড়িটা পথের উপর রাখল বাবর। তারপর ধীরে ধীরে ফটকের কাছে গেল। ফটকটাও বন্ধ। শুধু পেটের কাছে চোরদরোজার পাল্লাটা কুকুরের জিভের মত ঝুলে আছে। ঢুকবে?

বাবর অতি কষ্টে চোর-দরোজার ভেতর দিয়ে নিজেকে চালান করে ওপারে নিয়ে গেল। মেরুদণ্ড খাড়া করতেই মুখোমুখি হয়ে গেল এক সহাস্য শুভ্রবসনা সিসটারের।

ইয়েস? কী প্রয়োজন?

মাননীয় ভদ্র মহিলা কী এক কৌশলে চোখে ভ্রুকুটি এবং ঠোঁটে হাসি একই সঙ্গে সৃষ্টি করে জিগ্যেস করলেন। এঁরা আবার কিছু কিছু বাংলাও জানেন। বাবর এক মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল–বাংলায় জবাব দেবে না।

সে তার সবচে মার্জিত ইংরেজি বের করে বলল, প্রয়োজন খুবই সামান্য। আমি আপনারই একজন ছাত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

সিসটারও এবার ইংরেজিতে শুরু করলেন।

কে সে?

নাম বললে চিনবেন?

এখানে আমাদের সব মেয়েকেই চিনি। চোর-দরোজা দিয়ে ঢুকে এখন পিঠটা টনটন করছে। বাবর বাঁ হাতে একবার বহু সহস্র বছর আগে খোয়ান ল্যাজের শূন্যস্থলে টিপে ধরে বলল, জাহেদা।

ও জাহেদা? বি.এ সেকেন্ড ইয়ার? হোস্টেলে থাকে?

হ্যাঁ। সেই বটে।

আপনি তার কে হন জানতে পারি?

অবলীলাক্রমে বাবর বলল, আংকল।

মায়ের দিক থেকে না বাবার দিক থেকে?

মায়ের দিকে। বাংলা আমরা বলি মামা। বলে বাবর একটা বিগলিত বিশুদ্ধ হাসি দান করল সিসটারকে।

তিনি আবার জিগ্যেস করলেন, ভিজিটার্স বুকে আপনার নাম আছে?

কী বিটকেল সিসটার রে বাবা। একেবারে শকুন মার্কা। বাবর হাসির নির্মলতা আরো কয়েকমাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে জবাব দিল, বুকে নাম না থাকবারই কথা ম্যাডাম। আসলে আমি কয়েক মাস হলো ঢাকায় এসেছি। এর আগে করাচিতে থাকতাম। জাহেদার মা আমি পিঠেপিঠি ভাই বোন। অনেকদিন জাহেদাকে দেখি না। কেমন আছে ও?

তাল আছে। আমাদের এখানে কেউ খারাপ থাকে না।

তা বটে। তা বটে।

কিন্তু আপনার চেহারা খুব চেনা ঠেকছে।

এই রে সেরেছে। নিশ্চয়ই বুড়ি তাকে আগেও এখানে আসতে দেখেছে। করাচি থেকে সদ্য আসার মিথ্যেটা ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু বাবর জানে কী করে ফাঁদ থেকে বেরুতে

হয়। সে মাথা ঝাঁকিয়ে স্বীকার করল অনেকেই এই কথা বলেন। আসলে ব্যাপার কী জানেন, আমি টেলিভিশনে কাজ করি তো তাই।

ও আপনি টিভিতে কাজ করেন? কী আনন্দজনক সাক্ষাৎ। খুব প্রীত হলাম। জাহেদা তো কোনোদিন বলেনি। তার মামা টিভিতে আছে।

কী জানি। দেখা পাব ওর?

ওর বলা উচিত ছিল।

সিসটার হাঁটতে শুরু করলেন শান বাঁধান লন চেরা পথ দিয়ে। বাবর পিছনে হাত যুক্ত করে বিনীত ভঙ্গিতে হাটতে লাগল তার পাশে।

ওর অবশ্যই বলা উচিত ছিল। আপনি হয়ত জানেন না, আমরা আমাদের কলেজে প্রতি মাসের শেষ শনিবার একটি করে সভার আয়োজন করি।

উত্তম করেন।

সে সভায় বিভিন্ন পেশার নেতৃস্থানীয় একজন করে নিমন্ত্রিত হন। তিনি মেয়েদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। এতে বাইরের জগৎ সম্পর্কে মেয়েদের একটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। তাদের নতুন নতুন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার হয়।

অবশ্যই। এ এক চমৎকার ব্যবস্থা।

জাহেদা যদি বলত, আপনাকেও একদিন ডাকতাম বক্তৃতা করতে।

আপনি আমাকে এখনো বাধিত করতে পারেন।

বাবর সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইল না, শিকারী কুকুরের মত পেট সরু করে সে তাই ঝাঁপিয়ে পড়ল। কে জানে কী থেকে কী হয়।

ঐ যে, ল্যাজে ল্যাজে জোড়া দিয়ে বর্ধমান যাওয়া।

সিসটার ঘুরে দাঁড়ালেন।

দয়া করে একটা বক্তৃতা দেবেন?

আপনাদের আদেশের শুধু অপেক্ষা।

আমি চাই আপনার কাছ থেকে মেয়েরা জানুক, কীভাবে জনতার সামনে দাঁড়াতে হয়, কথা বলতে হয়, টিভি মাধ্যম হিসেবে কতটুকু উপযোগী, এই সব। সানন্দে তা জানাতে চেষ্টা করব।

আপনার ঠিকানা?

এই যে।

বাবর পকেট থেকে কার্ড বের করে দিল। বলল, এটা আমার ব্যবসার কাজে লাগে। বেঁচে থাকার, এই মর দেহটার সামান্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে ব্যবসা করতে হয়। ব্যবসা আমার মৃত্যু, শিল্প আমার জীবন।

কী সুন্দর কথা। সামনের মাসের পরের মাসেই হয়ত আমরা আপনাকে ডাকতে পারি।

আমি অবশ্যই সময় করব।

আপনি জাহেদার সঙ্গে দেখা করতে চান?

একবার দেখা হলে ভাল হতো। দরকার ছিল।

আসলে আমাদের নিয়ম কী জানেন? বুকে নাম না থাকলে এবং নিকট আত্মীয় যদি না হন তাহলে প্রিন্সিপ্যালের কাছে দরখাস্ত করতে হয়। তিনি সন্তুষ্ট হলে কেবলমাত্র একবার সাক্ষাতের অনুমতি দিতে পারেন। তবে আপনার জন্যে—

না থাক। আমার জন্যে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নিয়ম ভাঙ্গা হোক চাই না। এটি শিক্ষামন্দির। এর নিয়ম কানুন বড়রাই যদি না মানি কোমলমতি শিক্ষার্থীরাই বা কেন মানবে?

এক জাহেদার জন্যে বক্তৃতার সুযোগ নষ্ট করতে চায় না বাবর। বক্তৃতায় আরো কত নতুন জাহেদার সঙ্গে আলাপ হবে। এখন বরং নিয়মনিষ্ঠ তরুণদের জন্যে উৎকণ্ঠিত একজন প্রৌঢ়ের অভিনয় করাই সুবিবেচনার কাজ। এতে মানমীয়া ভদ্রমহিলার চোখে তার মর্যাদা বাড়বে। চাই কী হয়ত সামনের মাসেই তাকে বক্তৃতা করতে ডাকবেন।

বাবর আরো যোগ করল, আমাদের পয়গম্বর বলেছেন, যা নিজে করতে পার না, তা অপরকে উপদেশ করবে না।

মূল্যবান কথা।

অতএব থাক। আপনি জাহেদাকে বলবেন, আমি এসেছিলাম। পরে একদিন দরখাস্ত করেই দেখা করব। বিদায় দিন।

চোর-দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো বাবর। হাসল। সিসটার জানে না, দরখাস্ত ছাড়াই তার মেয়েরা কত দেখা করছে। সে নিজেও কতবার এসেছে। আজ প্রথম মুখোমুখি হয়ে গোল বলে! তবে শিক্ষা-মন্দির কথাটা বলেছে। যুৎসই। নিজেকেই বড় রকমের প্রশংসা

করতে ইচ্ছে করল তার। বক্তৃতা দেবার জন্যে এখনিই তার জিভে চুলচুল করতে শুরু করে দিয়েছে।

সেই ঝোঁকে বেশ কিছুদূর হাওয়ায় ভেসে গেল বাবর। পাক মোটর্সের ক্রসিংয়ে দপ করে লাল বাতি জ্বলে উঠল। যেন হোঁচট খেল সে। হঠাৎ মনে হলো সিসটারের সঙ্গে আলাপ করতে করতে কলেজের ভেতরে অনেক দূর চলে গিয়েছিল, অনেকক্ষণ ছিল। জাহেদা কি একবারও তাকে দেখেনি? দেখতে পায়নি? কোনো ক্লাশ, কোনো কামরা, কোনো বারান্দা থেকে? আর তার নিজেরও যে কী হয়েছিল, চারদিকে একবারও সে তাকিয়ে দেখেনি। আসলে ঐ বক্তৃতার প্রস্তাবটাই সব মাটি করেছে।

বোধ হয় জাহেদা ইচ্ছে করেই তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। হয়ত বাবলিকে সে-ই চিঠিটা দেখিয়েছে। কেন এড়িয়ে যাচ্ছে? কেন দেখিয়েছে? দেখিয়েছে? জাহেদাকে তো আজ পর্যন্ত সে ছুঁয়েও দেখেনি। শুধু কথা বলেছে। তাও শুধু সিনেমা, ফ্যাশন আর চেনা মানুষদের নিয়ে। কোনো ইঙ্গিত নয়, কোনো আমন্ত্রণ নয়, কিছু নয়। আর জাহেদার বয়স এমন কিছু নয় যে বাবরের মনে কী আছে তা বোঝার ক্ষমতা তার হয়েছে। চিঠিতে কিছু ছিল? বাবলি কেন চিঠিটা পড়ে এমন হিংসুটে হয়ে উঠল?

নাহ কিছু বুঝা যাচ্ছে না। চিঠির প্রত্যেকটি কথা মনে আছে তার। সে লিখেছিল হুবহু এই রকম, ইংরেজি থেকে বাংলায় তরজমা করলে দাঁড়ায়–প্রিয় জাহেদা, কয়েকদিন দেখা হয় না। এর মধ্যে এক কাণ্ড হয়েছে। সেদিন টুরিজম ডিপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম। সেখানে রাস্তার মানচিত্র দেখে মনটা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। ভাবছি উত্তর বাংলায় গাড়ি করে

বেড়াতে গেলে কেমন হয়? তুমি যদি যেতে চাও তাই লিখলাম। পরে যে বলবে, আগে জানলে যেতাম, কেন তোমাকে নিলাম না ইত্যাদি, সে সুযোগ দিতে আমি রাজি নই। তাড়াহুড়া নেই, যখন খুশি জানিও। ভাল থেকো। মন দিয়ে পড়াশুনা কোরো। আমি মেধাবী ছাত্রীদের পছন্দ করি। পরীক্ষার ফল ভাল করে আমাকে সে আনন্দ দিও। ইতি বাবর।

ইতির পরে তোমারই লিখতে গিয়েও লেখেনি। কেবল জাহেদাই যে যাবে আর কেউ যাবে না, তেমন কোনো অঙ্গীকারও কোনো শব্দে নেই। তবু এ রকম হলো কেন?

চমকে উঠল বাবর। পেছনে কয়েকটি অধীর হর্ণ বেজে চলেছে। কখন সবুজ হয়ে গেছে বাতি। আটকে রেখেছে। সবার পথ সে। রাগ হলো বাবরের। দেবে না সে পথ। ভাণ করল তার গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। বনাত খুলে মিছেমিছি দেখল। আর আড়াচোখে পেছনে সবার বিরক্তি আর পাশ কাটিয়ে বেরুবার পরিশ্রম লক্ষ করল— করে তৃপ্তি পেল সে। বোঝ, বোঝ। তারপর বাতি আবার লাল হবার আগেই লাফ দিয়ে গাড়িতে বসে বেরিয়ে গেল সমুখে।

৮. সারা দুপুর সুরাপান

সারা দুপুর সুরাপান করল বাবর।

হাঃ হাঃ। তুমি কোথায় আছ? অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝখানে, যেখানে আগেও ছিলে, এখন আছ এবং পরেও থাকবে। তার এক বন্ধুকে প্ল্যান্টার্স পাঞ্চ খেতে দেখেছে মাঝে মাঝে। সে নিজে কোনোদিন চেষ্টা করেনি। কোন কোন সুরা মিশিয়ে করে তাও জানে না। গেলাশের নিচের দিকটা লালচে, ওপরে সোনালি–অস্বচ্ছ, দয়াহীন একটি পানীয় বলে ওটাকে তার মনে হয়েছে। আজ সে আনিয়ে চেখে দেখল এবং পছন্দ করল!

আবার আনাল একটা। মাথার ভেতরটা নিমিষে শূন্য হয়ে গেল যেন। মনে হলো ফেরেশতার মত জ্যোতির্ময় তার দেহ। আদিতে ইবলিসও তো ফেরেশতাই ছিলেন। না, যদি আমাকে পছদন করতে বভলা হয়, আমি হতে চাইব মিকাইল, বৃষ্টির ফেরেশতা, কিন্তু ইস্রাফিলের শিঙ্গা আমি চাই। ওটা আমার খুব পছন্দ। বাবর নিজেকে যেন দেখতে পেল ঘন কালো মেঘের অন্তহীন স্তরে জ্যোতির্ময় দেহে দাঁড়িয়ে আছে নগ্ন নিরাভরণ মিকাইলের শিঙ্গা হাতে। নিচে লাল কার্পেটে আচ্ছাদিত নীল দেয়ালে জানালাবিহীন এক বিশাল হলে মেয়েরা আসে যায় এবং মাইকেল এঞ্জেলোর গল্প করে। সেই ছবিটা কি মাইকেল এঞ্জেলোরই আঁকা? ঈশ্বরের প্রসারিত তর্জনী থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের হাত–ব্যগ্র একটি হাত। মাঝে সামান্য দূরত্ব কিন্তু কী অসীম, অলংঘনীয়; অনন্ত তো দেখা যায় না। কিন্তু দেখা গিয়েছে। এখানে। বিবর্ণ ব্রাউন একটি অনন্ত, ঈশ্বর ও মানুষের আঙুলের মাঝখানে।

সিগারেট কিনতে, প্রস্রাব করতে এবং বাইরের বাতাস নিতে বাবর বেরুল। সিগারেট কিনতে গিয়ে উল্টা দিকের কাউন্টারে দেখল সারি সারি প্রসাধনী সাজানো। মৃত সুন্দর সব শিশুদের বিয়োগ স্মরণে নির্মিত মিনারের মত দাঁড়িয়ে আছে লিপস্টিকের পেন্সিলগুলো। একটা থেকে আরেকটার দূরত্ব সুসম। এক উচ্চতা, এক বোধ, এক নিস্তব্ধতা। প্রত্যেকটির মাথায় ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার বৃত্তাকার বর্ণলেখ। সেই সব বর্ণে মৃত শিশুদের সহাস্য দুর্বোধ্য কাকলি প্রস্তরীভূত হয়ে আছে। দেখাতে বলল। যখন হাতে নিল তখন আর কিছু মনে হলো না। বাবর হাসল। এবং নিতান্ত চক্ষুলজ্জার খাতিরেই একটা কিনল।

তারপর এলো বাথরুমে। ঝাঁঝাল অনিশ্চিত একটা সুগন্ধ বাতাসে ঝকঝকে শাদা শাদা পাত্র ন্যাপথালিনের বল নিয়ে অপেক্ষা করছে। কোথায় যেন অপারেশন থিয়েটারের সঙ্গে অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে। তেমনি যেন মৃত্যুকে স্মরণ করায়। নিঃসঙ্গ করে তোলে সহসা। বোতাম খুলে চোখ তুলে তাকিয়ে বাবর দেখতে পেল নিজেকে ঝকঝকে আয়নায়। সমস্ত মুখ ফোলা ফোলা লাগছে, মনে হচ্ছে দীর্ঘ একটা স্বপ্নহীন ঘুম থেকে এইমাত্র উঠেছে সে। গালে হতে দিয়ে দেখল। এরই মধ্যে কর্কশ হয়ে এসেছে, কালচে দেখাচ্ছে। গলার উপর হাত রেখে অনুভব করল সেখানে জীবন স্পন্দিত হচ্ছে টিপ টিপ করে। ঠোঁটের দুপাশে ময়লা জমে শুকিয়ে আছে। বাবর পকেটে হাত দিল রুমালের জন্য। রুমালের বদলে হাতে ঠেকল সদ্য কেনা লিপস্টিকটা।

বের করল সে। আস্তে আস্তে তার ক্যাপ খুলে নিচের চাকতি ঘুরিয়ে দিতেই মাথা উঁচু করে উঠল। লাল মাথাটা। ঘুমের মধ্যে প্রস্রাব পাওয়া শিশ্নের মত। কার্তিকের কুকুরের মত। লাল, দৃঢ়, মসৃণ, আলো ঠিকরাচ্ছে, যেন আমন্ত্রণ করছে। বাবর তার নিচের দিকে তাকাল। শেষ বিন্দুটা এখনো মাথায় জ্বলজ্বল করছে, এখনো যথেষ্ট হয়নি বলে পড়ছে না। বাবর একটা আলতো টোকা দিয়ে ফোটোটাকে ফেলে দিল এবং সেখানে ছোঁয়াল লিপস্টিকের লাল মাথা। সঙ্গে সঙ্গে একটা শিহরণে কুঞ্চিত হয়ে উঠল যেন তার সমস্ত স্নায়ু। দ্রুত হাতে সরিয়ে নিতেই দেখল। লাল দাগ পড়েছে। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল সে। বাবলির কথা মনে পড়ল। বাবলির ঠোঁটের রং ঠিক এই রকম–আবছা লাল।

চারদিকে তাকিয়ে দেখল বাবর। না, কেউ নেউ। কান পেতে শুনল। না কেউ আসছে না। দ্রুত হাতে আয়নার ওপর লিপস্টিক দিয়ে লিখল MAKE LOVE NOT VVAR তারপর পেছনে আরেকটা দরোজা খুলে কমোডের মধ্যে ফেলে দিল লিপস্টিকটা। চলে আসছিল, দেখে ক্যাপটা হাতেই রয়ে গেছে। সেটা আরেকটা কমোডে ফেলে দিল। সাদা পোর্সিলিনে লেগে টং করে শব্দ করে উঠল, যেন চমকে উঠল একটি নিস্তব্ধতা।

বইটা দেখে বাবলি দপ করেজ্বলে উঠবো! কিন্তু কিছু বলতে পারবে না। বাবর কল্পনা করে মজা পেল, ভেতরের চাপা আক্রোশে বাবলি শুধু এঘর ওঘর করছে। এক সময় হয়ত সে টেলিফোন করবে। টেলিফোন তাকে করতেই হবে। আজ রাতেই সে করবে। যাক, একটা ভাল চাল দেয়া গেছে। বইটা কিনে বড় উপকার করেছে সে নিজের।

কে একজন খুব লম্বা লম্বা পা ফেলে বাথরুমে ঢুকল। লোকটার একটা হাত এখনি ট্রাউজারের বোতামে। বড্ড জোর লেগেছে বোধ হয়। প্রস্রাব বেরিয়ে যাওয়ার পর অনাবিল তৃপ্তিতে চোখ তুলেই লোকটা আয়নায় দেখতে পাবে MAKE LOVE NOT VVAR হাঃ হাঃ। বাবর কি বাইরে অপেক্ষা করবে লোকটা ফিরে আসা পর্যন্ত?

আচ্ছা, দেখা যাক না। লোকটা বেরিয়ে এলে তার মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। লেখাটা দেখে প্রতিক্রিয়া কী হয়েছে।

চকিতে বাবরের মনে পড়ল শ্যারণ টেটকে হত্যা করার পর হত্যাকারীরা বড় বড় করে লিখে গিয়েছিল PIGS — শুয়োরের দল। সব শালা শুয়োর। উদ্দেশ্যহীন একটি হত্যা— একটি নয়, এক সঙ্গে চারটি। যারা হত্যা করেছে তারা স্বীকার করেছে নিহতদের সঙ্গে আগে তাদের কোনো পরিচয় ছিল না। প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম! হাঃ প্রথম দেখাতেই মৃত্যু, রক্তপাত, হত্যা। প্রথম দেখাতে যদি প্রেমে পড়া সম্ভব হয়, চিরকাল লোকে তো একে আদর্শ একটা ঘটনা বর্ণনা করে এসেছে, তবে প্রথম দেখাতেই কাউকে হত্যা করার ইচ্ছে হবে না কেন। আমাকে বোঝাও বাপ। হাঃ। যত সব কেঁদো শুয়োরের দল।

লোকটা বেরিয়ে এলো। মুখ তার লাল। বাবরের দিকে চোখ পড়তেই লজ্জায় দ্রুত চোখ নামিয়ে এলোমেলো পায়ে প্রায় দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। যেন বাথরুমে লেখাটা সে-ই লিখেছে। আরে, আরে, মজা দেখ। এই রকম অনুভূতি, এই রকম প্রতিক্রিয়া প্রবল হলে লোকে যাজক হয়, নেতা হয়, বিশ্বপ্রেমিক হিসেবে অভিনন্দন কুড়োয়, তার জীবনী পড়ে পরীক্ষা পাশ করতে হয়। তোমার পাপে আমি অনুতপ্ত, লজ্জিত। তোমার দুঃখে

আমি কাঁদি। তোমার পতনে আমি রক্তাক্ত হই।–ব্যাস, এই তো কথা! যীশুখ্রিষ্টও এই বলেছেন। হযরত সারারাত জেগে খোদার কাছে মুক্তি চেয়েছেন মানুষের।

হাঃ খেলে যা। খেলে যারে খেলারাম। খেলে যা।

বাবর বারে এসে বিল শোধ করে বেরুল। পকেটে এখনো একরাশ টাকা। সেই হাজার টাকা থেকে একশ টাকাও এখনো পুরো ভাঙ্গেনি। হতরনকে একবার টেলিফোন করে দিতে হয়, আলতাফকে যেন না বলে গহনার টাকা সে দিয়েছে।

হ্যালো। আমি বাবর।

হতরন অধীর গলায় উচ্চারণ করলেন, আপনাকে অফিসে টেলিফোন করেছিলাম। ওরা প্রথমে বলল আছেন, তারপর বলল—

বেরিয়ে গেছিলাম। টেলেফোন করেছিলেন কেন?

কিছু না, এই এমনি। আপনাকে শুধু বলতে যে, বুলুর মা বলল..

বুলু কে?

আমার মেয়ে। ঐ যার বিয়ে। বুলুর মা বলল, আপনাকে নাকি ঠিক মত আমি যত্ন করিনি। এক কাপ চা খেয়ে গেলেন না। আপনার মত দয়ালু, মহৎ লোক পৃথিবীতে আছে বলেই—

বাবর যোগ করল, পৃথিবী এখনো চলছে, তাই না?

জি? হতরন সাহেব যেন হকচাকিয়ে গেলেন।

বাবর বলল, আমি আপনার কথাটাই শেষ করে দিলাম–আমার মত মহৎ, দয়ালু, না দয়ালু আগে বলেছেন, দয়ালু, মহৎ লোক পৃথিবীতে আছে বলেই পৃথিবীটা এখনো আছে, চলছে।

জি।

হতরন সাহেবের ঢোক গেলার শব্দটা পর্যন্ত স্পষ্ট শুনতে পেল বাবর। তখন বলল, আসব। নাকি চা খেতে। বলুন তো আসি।

জি।

হতরন এবার সত্যি সত্যি বিমূঢ় হয়ে গেছেন। বাবরের খুব মজা লাগল তখন।

কি আসব?

আসবেন না কেন? সে তো আপনার অনুগ্রহ।

নাহ, এখন আসব না।

কেন, কেন?

এখন মাল খাচ্ছি।

জি!

মাল! মানে মাদ। হুইস্কি। খেয়েছেন কখনো?

জি, ওসব মানে আমি, আমার, আমি গোঁড়ামি পছন্দ করি না, তবে খাইনি কোনোদিন। খান আপনি খান। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম আপনার এই উপকারের কথা সারা জীবন মনে থাকবে। বলতে গেলে বাপের কাজ করলেন আপনি।

বাপের কাজ আর কাকে কাকে দিয়ে করালেন।

মানে?

বাবরের ভারি রাগ হলো লোকটার ওপর। চটছে না কেন? এখন যদি তাকে দুটো কড়া কথা শোনাত, টেলিফোন ঠাস করে রেখে দিত তাহলে বোঝা যেত তার পৌরুষ আছে। মানুষ এত ভীরু হয় কী করে? নিজেকে এতটা বিকিয়ে দেয় সে কীসের অভাবে? কীসের তাড়ায়?

কিছু না, কিছু না। বলল বাবর।

নইলে বুলুর মা খুব মাইণ্ড করবেন। আমাকে বারবার করে বলে দিয়েছেন।

দুস সাহেব। আপনার বৌ মাইণ্ড করবে। আস্তে বলুন। লোকে কী ভাববে।

জি।

যান, মাথা ঠাণ্ডা করে শুয়ে থাকুন গে। রোজার দিন।

জি।

কি, রোজা আছেন তো?

জি, আছি। থাকব না কেন?

পরকালের রসদ যোগাড় করছেন?

কী যে বলেন।

এ কালের রসদ তো অনেক হয়েছে কী বলেন।

জি?

না, কিছু না। আর শুনুন, আলতাফকে বলবেন না ঐ টাকার কথাটা।

জি না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তাকে বলবই না। বলার কোনো সুযোগই হবে না। যে উপকার আপনি করলেন—

তার বিনিময়ে এই ঠাস করে রেখে দিলাম টেলিফোন-মনে মনে বলতে বলতে লাইন কেটে দিল বাবর। ওহ, কৃতজ্ঞতা! ল্যাজ থাকলে আদুরে কুত্তার মত তিরতির করে এখন নাড়াত হতরন। কুঁই কুঁই করত। আর পা শুঁকত। মানুষের আবার কত বড় কথা— আমরা পশু নই, মানুষ। বাবার তাকে টাকা দিয়ে নিজের জন্য আর একটা প্রমাণ সংগ্রহ করল, মূলত পশুর সঙ্গে মানুষের কোনো তফাৎ নেই। বরং মানুষ পশুরও অধম। এতক্ষণ একটা পশুকে খোঁচালেও সে থাবা বের করে দাঁত খিচিয়ে উঠত। আর হতরন

বেমালুম সব হজম করে। গেল। মানুষ যে বুদ্ধি বিবেচনা রাখে! কত ধানে কত চাল হয় তার হিসেব বোঝে!–তাই।

বড় ক্লান্তি লাগছে। ঘুম পাচ্ছে বাবরের। মনে হচ্ছে, একটা দিন, একটা জীবন যেন অপচয়ে নিঃশেষ হয়ে গেল আজ। খুব ধীরে গাড়ি চালিয়ে সে পথের পর পথ অতিক্রম করতে লাগল। পেছনে যার তাড়া আছে তাকে পথ করে দিতে লাগল ক্রমাগত। যাও সবাই এগিয়ে যাও। কারণ যাওয়াই তোমরা জীবনের মোক্ষ বলে মনে কর। সবাইকে পেছনে ফেলে। এগিয়ে যাওয়া। সেই জন্যই পথ তোমরা ক্রমশ প্রশস্ত করে তৈরি কর, নইলে পালা জমবে কেন? কাউকে পেছনে ফেলে যেতে কী সুখ মানুষ নামক জন্তু না হলে উপলব্ধি করা যায় না।

দিই আটকে?

একটা সাদা ফুরফুরে গাড়ি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ তাকে খেলাবার ইচ্ছে হলো বাবরের। চট করে ডাইনে কেটে গতি শ্লথ করল সে। ঘ্যাঁস করে ব্রেক করল সাদা গাড়ি। ঘাড়ের পরে উঁচু করে বাঁধা খোঁপার নিচে এক মহিলা চালাচ্ছিলেন। বিপ্লক্তিতে ভ্রুকুটি করে তাকালেন তিনি বাবরের দিকে। ভ্রুকুটি বোঝা গেল তার কালো চশমার ওপরে ভ্রু যুগলের আকস্মিক উর্ধ্ব বিন্যাসে। বাবর হাঃ করে হেসে নিজের গাড়ি সরিয়ে নিল। মহিলাটি তীরের মত বেরিয়ে গেলেন পেছনে সাদা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে! সমাজে অনুচ্চার্য একটি কথা মনে হতেই বাবার টিপে আপন হাসি সংবরণ করল।

বাসায় এসে দেখল দরোজা খোলা, খোলা মানে ভেজান। তালা লাগান নেই। অথচ কতদিন সে বলে গিয়েছে তালা লাগিয়ে রাখতে।

মান্নান, মান্নান।

পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছিল ব্যাট। ডাক শুনে চোখ ডলাতে ডলাতে এলো।

দরোজা খুলে ঘুমাচ্ছিস? কতদিন এক কথা বলব? কত দিন বলতে হবে?

স্যার–

ইডিয়েট! ফের যদি দরোজা খোলা দেখি পাঁচ টাকা জরিমানা করব। লাট সাহেব হয়েছ। লর্ড লিনলিথগো?

স্যার–মান্নান কী যেন বলতে চাইল।

চুপ! কোনো কথা শুনতে চাই না। আউট।

দরাম করে দরোজা লাগিয়ে ভেতরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বাবর। ড্রইংরুমের চারদিকে পর্দা টানা। প্রায় সন্ধ্যার মত অন্ধকার। তেমনি শীতল। দেয়ালে ঝোলান মাটির তৈরি নিগ্রো মেয়েটার মাথা। টেলিভিশনের ওপর একটা তেলাপোকা স্থানু হয়ে আছে।

লাইফ ম্যাগাজিনের খোলা পাতায় হাঁ করে বিকট গোলাপি মুখ দেখাচ্ছে এক শিম্পাঞ্জী। ড্রামের দুই বীটের মাঝখানে তুরিত স্তব্ধতার মত টানটান হয়ে আছে। সারাটা ঘর। বাবর একবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। চোখ বুজল। তারপর ক্লান্ত পায়ে ড্রইয়ং রুমের দৈর্ঘ্যটা কোণাকোণি পার হয়ে খাবার ঘরের পাশ দিয়ে জাল ঢাকা করিডোর অতিক্রম করে শোবার দরোজায় ঠেলা দিল।

নিভাঁজ বিছানা কোল বাড়িয়ে ডাকল তাকে। এক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দেখল সে। ছবির মত সাজানো বালিশ, চাদরের হালকা নকসা, পায়ের কাছে সরু কার্পেটের কোমলতা, পাশে পরিষ্কার ছাইদানি, ঘাড় নামানো পড়ার বাতি।

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বাবর পায়ে-পায়ে মোকাসিন জোড়া খুলে ফেলতে ফেলতে। মুখ গুঁজে পড়ে থাকল ঠাণ্ডা পাউডার নীল বালিশের ওপর। উপলব্ধি করতে পারল, কী উত্তপ্ত হয়েছিল তার সারা দেহ এতক্ষণ। মুখ আরো গুঁজে দিয়ে, মায়ের কোলে শিশুর মত মাথা ঘষতে ঘষতে সে কয়েকটা অব্যয় ধ্বনি সৃষ্টি করল। তখন আরো ভাল লাগল। সে ঘুমে উচ্চারিত ছড়ার মত বলে যেতে লাগল–আহ, ইস, ইস, ইস।

মোজা জোড়া বড্ড অস্বস্তিকর লাগল তার পায়ে। সে মোজা খোলার জন্যে পাশ ফিরে হঠাৎ দরোজার দিকে চোখ পড়তেই স্তব্ধ হয়ে গেল। এক হাত রইল তার গুটিয়ে আনা পায়ের পাতায়, আরেক হাত পাঁজরের নিচে। ঠোঁট ফাঁক হয়ে এলো কিছু বলার জন্যে কিন্তু বলতে পারল না। কুয়াশার মধ্যে সূর্যোদয়ের মত সেখানে ফুটে উঠতে লাগল, ধীরে, অতি ধীরে একখণ্ড চাপা হাসির আলো।

দরোজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে জাহেদা। জাফরান রংয়ের পাজামা পরনে। গায়ে সাদার ওপরে বড় বড় জাফরান সূর্যমুখী জামা। চোখে একটা ভয়।

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। একটা শ্লথ বিদ্যুৎ যেন এর চোখ থেকে ওর চোখে ক্রমাগত ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল। কিম্বা একটি প্রজাপতি, বাগানে যে কিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, কোন ফুলে বসবে।

বাবার উঠে বসল। বলল, তুমি? তুমি কখন?

বাবার উঠে গিয়ে জাহেদার কাঁধ স্পর্শ করে বলল, কখন এলে?

তাকে হাত ধরে বিছানার পাশে লাল চামড়ায় ঢাকা মোড়ার ওপর বসিয়ে, নিজে বিছানায় বসে, আবার বলল, কতক্ষণ এসেছ?

এই প্রথম জাহেদকে সে স্পর্শ করেছে। এখন মনে হচ্ছে জাহেদার এক মুঠো রেণু তার আঙুলে জড়িয়ে গেছে। বাবর আঙুলগুলো একটার ডগায় আরেকটা তখন অনবরত ছোঁয়াতে লাগত।

জাহেদা বলল, সকালে।

সকালে এসেছ? আমি যে তোমার কলেজে গিয়েছিলাম।

আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। নইলে সিসটার খোঁজ করবেন।

কী ব্যাপার?

পাঁচটার পর সিসটার ঘরে ঘরে দেখে যে।

তা নয়। আমি ভাবতেই পারিনি তুমি আসবে।

এলাম।

দুপুরে খাওনি?

না।

এ ভারি অন্যায়। মান্নানকে বললেই পারতে। বলা উচিত ছিল তোমার। কেন বলনি?

ও বলল আপনি আসবেন, এক্ষুণি আসবেন।

আমি খুব লজ্জিত, দুঃখিত। একটু খবর দিয়ে আসতে হয় না?

জাহেদা চুপ করে রইল। তারপর বলল, ফ্রীজ থেকে একটা কোকাকোলা খেয়েছি।

যাহ, শুধু ঐ খেয়ে দুপুর কাটায় নাকি? আমি এক্ষুণি ব্যবস্থা করছি। এক মিনিট।

না, না, আমি এখন যাব।

অসম্ভব। আগে খাবে, তারপর।

না, যেতে হবে যে!

তাহলে চল, কোথাও বসে খাই।

বাইরে যাব না।

সেই তো বলছি। মান্নান এক্ষুণি পরোটা বানিয়ে দেবে। ওমলেট দিয়ে খাও। আচ্ছা, স্যাণ্ডউইচ। কোল্ড বীফ আছে। আমি নিজে করে দিচ্ছি।

জাহেদা অস্পষ্ট একটু হাসল।

বাবর বলল, বিশ্বাস হলো না বুঝি? আচ্ছা, খেয়েই দ্যাখ আমি বানাতে পারি কি-না! দুমিনিট লাগবে।

খাবার ঘরে গিয়ে রুটি কেটে চটপট দুটো বড় স্যাণ্ডউইচ বানাল বাবর। কেটলিতে পানি চাপিয়ে দিল। তারপর ট্রেতে স্যাণ্ডউইচ, গেলাশ, ঠাণ্ডা পানি বোতল সাজিয়ে শোবার ঘরে এসে দেখে জাহেদা নেই; হৃদপিণ্ড ধ্বক করে উঠল তার।

চলে গেল?

ড্রইংরুমে এসে দেখে জাহেদা বড় সোফার মাঝখানে হাঁটু জড়ো করে বসে আছে। দেখে তার ভীষণ মায়া হলো। মনে হলো হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট একটি মেয়ে।

তুমি এখানে?

জাহেদা আবার অস্পষ্ট ম্লান হাসল।

খাও। আগে খেয়ে নাও। তারপরে কথা। কফি হচ্ছে। কই খাও? আচ্ছা আমি কফিটা দেখে আসছি।

দুপেয়ালা কফি বানিয়ে ফেরত এলো বাবর। দেখল জাহেদা তখন সবে একটা স্যাণ্ডউইচের কোণ ভেঙ্গেছে মাত্র।

কেন, ভাল হয়নি?

ক্ষিধে নেই।

তা বললে চলবে কেন? খেতেই হবে। না খেলে রাগ করব। আমি নিজ হাতে বানালাম তোমার জন্যে।

খাচ্ছি।

খাও। হোস্টেলে তো আর খেতে পাও না।

কী যে বলেন। আমরা বাইরে থেকে কত কিছু আনিয়ে খাই।

কফি খাও। কফির সঙ্গে ভাল লাগবে। কী আশ্চর্য, সকালে এসেছি, আর আমি কলেজে খুঁজে এলাম। আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি এসেছি, আমার সামনে বসে আছ, আমি তোমার জন্যে স্যাণ্ডইউচ বানিয়েছি, তুমি খাচ্ছি। মাঝে মাঝে বাস্তব এত ভাল মনে হয় যে মনে হয় স্বপ্ন, বেশি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, পাছে নষ্ট হয়ে যায়।কই আরেকটা রইল যে! ওটাও খেতে হবে। খাও। পারবে খেতে। তোমার কলেজে দুবার গিয়েছিলাম। আমি বলি, জাহেদা গেল কোথায়। আর তুমি আমার এখানে বসে আছ। নিজেকে ক্ষমা করতে ইচ্ছে হয় না। আরেকটু কফি দিই? দাও কাপটা দাও।

বাবর কাপটা নিয়ে খাবার ঘরে গেল; কাপের রীমে জাহেদার ঠোঁট থেকে আবছা রং লেগেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল বাবর। তারপর সেখানে ঠোঁট দিয়ে সমস্তটা রং তুলে নিল। মোমের মত মসৃণ লাগল এখন তার নিজের ঠোঁট। শিরশির করল সমস্ত শরীর। আবার সেই বিদ্যুৎ চলাচল করতে লাগল স্নায়ুতে। সে তাড়াতাড়ি কফি বানিয়ে ফিরে এলো জাহেদার কাছে।

বলল, বাবলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

এমন সাধারণ কণ্ঠে বাবর প্রশ্নটা করল যেন সিগারেট ধের করে দেশলাই আছে কি-না খ্রিgঠন দরিল্রক্ষ্।

জাহেদা উত্তর করল, বাবলি?

হ্যাঁ, ঐ যে তোমার বান্ধবী।

কাল এসেছিল।

কোথায়। হোস্টেলে?

হ্যাঁ।

ভাল আছে তো।

বোধ হয়।

বোধ হয় কেন?

বড্ড মনমরা দেখলাম।

প্রেমে ট্রোমে পড়েছে নাকি।

দূর।

দূর কেন? এই বয়সে একটা প্রেমে না পড়লে কেমন কথা?

যান। আপনি। কী যে বলেন।

তাহলে মনমরা দেখলে?

না, তাও ঠিক না। কেমন যেন। অনেকক্ষণ চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকল। তারপর আমি সুপারের কাছে গেলাম বাড়ি থেকে টাকা এসেছিল, আনতে। এসে দেখি বাবলি নেই।

শুনলাম চলে গেছে।

শরীর খারাপ ছিল না তো?

প্রশ্নটা শুনে জাহেদা ভীষণ লজ্জা পেল। এই বয়সের মেয়েরা শরীর খারাপ বলতে প্রথমেই একটা কথা বোঝে। তুলোর রোল চোখে দেখতে পায়। জাহেদা আড়চোখে একবার বাবরকে দেখল। তারপর বলল, না বোধহয়।

বাবর একবার ভাবল চিঠিটার কথা জিগ্যেস করে। আবার ভাবল, না, থাক। বাবলি যদি চুরি করে দেখে থাকে তাহলে জাহেদা খামকা বিচলিত হয়ে পড়বে। হয়ত তার সঙ্গে উত্তর বাংলায় যেতে রাজি হবে না। অথচ তাকে নিয়ে যাবে বলে মনে মনে পণ করে বসে আছে বাবর।

জাহেদা চুপচাপ কী যেন ভাবতে লাগল। কফির পেয়ালা হাতে করে।

আরেকটা স্যাণ্ডউইচ দিই?

না না।

চকোলেট খাবে?

না।

আজ সব কিছুতেই না করছি যে।

কই, না।

বলেই হেসে ফেলল জাহেদা। আবার একটা না বলেছে সে। বলল, আপনি কথা এত ধরতে পারেন!

যাদের পছন্দ করি তাদের কথা আমি মনোযোগ দিয়ে শুনি যে! তুমি বোধহয় আমাকে একটুও পছন্দ কর না।

কেন?

উদ্বেগ ভরা চোখে জাহেদা তার দিকে তাকাল।

এই জন্যে বলছি যে, তুমি আজ কিছু বলছ না। শুধু আমি বলে যাচ্ছি।

জাহেদা চুপ করে রইল।

বাবর বলল, কি সত্যি। কিনা, বল?

জাহেদা বলল একেবারে অন্য কথা, যেন কথা বলে প্রমাণ দিতে চায় বাবর যা মনে করে তা ভুল। বলল, এসে পরপর দুকাপ চা খেয়েছি। আপনার যত পুরনো ম্যাগাজিন ছিল সব পড়েছি।

এতক্ষণে বাবর বুঝতে পারল শিম্পাঞ্জির ছবিটা আমন খোলা পড়ে ছিল কেন?

জাহেদা বলে চলল, যা ঘুম পাচ্ছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর হঠাৎ শুনি আপনি চেঁচামেচি করছেন। শুনে কী যে ভয় করতে লাগল। কোনোদিন তো আপনাকে উঁচু গলায় কথা বলতে শুনিনি।

লজ্জিত কণ্ঠে বাবর বলল, এই ছেলেটাকে নিয়ে আর পারিনে। কাজে কর্মে শুধু ভুল করে। না চেঁচিয়ে উপায় থাকে না।–তাই বুঝি দরোজায় লুকিয়ে ছিলে?

লুকাইনি তো।

তবে তোমাকে দেখলাম না যে।

দেখবেন কী। আপনি তো এসেই দুম করে শুয়ে পড়লেন।

বাবর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, তা ঠিক।

জাহেদা মুখ গোল করে বলল, যদি কোনো চোর হতো।

কী আর হতো। চুরি করে নিয়ে যেত।

মুখে ও-রকম বলা যায়। চুরি হলে তখন দেখতাম।

চুরি যে হয়নি। তাই বা কী করে বলি?

বলেই বাবর চকিতে দৃষ্টি গাঢ় করে তাকাল জাহেদার দিকে। জাহেদা একটু অপ্রস্তুত, একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। তবু জেদ করেই যেন বলল, কী চুরি হয়েছে। আপনার শুনি?

তখন কথাটাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে, যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমনি আকস্মিকতার সঙ্গে বাবর বলে উঠল, আরে, লতিফার খবর রাখ?

কে?

লতিফা, লতিফা।

সেই যে আপনার ভাই-ঝি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। তার খবর শুনেছ? সে বিয়ে করছে।

মেয়েরা বিয়ে করে নাকি? তাদের তো বিয়ে হয়।

এটাকে বিয়ে করাই বলতে পার। ও নিজে সোধে বিয়ে বসছে।

কার সাথে?

আমারই এক ভাইপোর সাথে। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। ভালই তো। কবে বিয়ে?

এই সামনেই। তোমরা একে একে এভাবে বিয়ে করলে আমার কী অবস্থা বল তো। মনে হয় বুড়িয়ে যাচ্ছি।

বারে! বয়স হলে বুড়ো হবেন না?

তা ঠিক। না, ঠাট্টা নয়। তোমরাই আমার বয়সটা বাড়িয়ে দিলে। এই তো দ্যাখ না। দুদিন বাদে শাড়ি পরবে, তখন রীতিমত মহিলা। তোমাকে দেখে মনে হবে, নাহি সত্যি সত্যি সময় চলে গেছে।

আমি কোনোদিন শাড়ি পরব না।

কেন?

এমনি। আমার ভাল লাগে না।

আমারো ভাল লাগে না। তুমি ঠিক বলেছ। তোমার এই জামাতে তোমাকে যা ভাল লাগে, শাড়িতে তার অর্ধেকও লাগবে না।

জি না। শাড়িতেও আমাকে মানায়। সবাই বলে। মাঝে মাঝে শখ করে পরি।

তোমার নীল জামাটা কই?

কোন নীল জামা?

সেই যে, যেটা পরলে তোমাকে খুব ভাল দেখায়। একদিন আমার সঙ্গে নিউ মার্কেটে বই কিনতে গেলে, সেদিন পরেছিলে।

ও, সেইটা।

তাহলেই দ্যাখ, বলেছিলাম না তুমি আমাকে পছন্দ কর না?

এর মধ্যে ও-কথা কেন?

এই জন্যে যে, পছন্দ করলে আমার কথাটা মনে থাকত। আমি যখন যা বলি মনে রাখতে।

জাহেদা চুপ করে রইল কথা খুঁজে না পেয়ে।

বাবর বলল, আচ্ছা, সে যাকগে। এই জাফরান রংটাও খুব মানিয়েছে।

নতুন বানালাম। আজকেই পরেছি।

কী কাপড়?

সুতি।

দেখে তো অন্যরকম মনে হচ্ছে। বাহ দেখি।

বলে বাবর উঠে এসে জাহেদার কামিজের একটা কোণ হাতে নিয়ে দেখতে লাগল মনোযোগ সহকারে। আসলে, তার ভারি ইচ্ছে করছে আবার একটু স্পর্শ করতে। হাত সরিয়ে আনবার সময় ইচ্ছে করে একটু ছুঁয়ে দিল ঊরুটা। যেন একটা রাবার ফোমে

এক মুহর্তের জন্যে হাত রেখেছিল সে। হাতটা ফিরিয়ে এনে আপন চিবুকে ছুঁইয়ে রাখল সে।

জাহেদা বলল, আজকাল কত সুন্দর প্রিন্ট বেরিয়েছে।

বাবর আরেকটা সিগারেট ধরালা।

আপনি এত সিগারেট খান?

কী করব? এছাড়া আর তো নেশা নেই।

তাই বলে একটার পর একটা?

তাছাড়া থাকি একা। সিগারেট বন্ধুর মত কাজ দেয়।

তা হোক। খাবেন না এত। এইতো আপনার এই ম্যাগাজিনেই পড়ছিলাম সিগারেট খেলেই ক্যান্সার হয়।

ক্যান্সার হলেই মৃত্যু, তাই না।

তাই তো। মৃত্যু কীসে হয় না বল। আমার কোনোদিন মৃত্যু হবে না। যদি এ ভরসা দিতে পার, ছেড়ে দেব সিগারেট।

সে ভরসা কেউ দিতে পারে?

আসলে কী জান—

আবার বক্তৃতা দেবেন তো? আপনাকে চিনি না? থাক। আপনার যদি মরতেই ইচ্ছে করে, খাবেন সিগারেট।

আচ্ছা, তুমি বলছি, তোমার কথা কি ফেলতে পারি? খাব আজ থেকে কম করে। এই এটা ফেললাম। আসলে আমার কথা হচ্ছে, যতক্ষণ বেঁচে আছি যা ভাল তাই করব। একবারের বেশি দুবার তো বাঁচব না। এই সামান্য কদিনের জন্য কী হবে এত বিধিনিষেধ মেনে আত্মাকে কষ্ট দিয়ে? যে লোকটা সিগারেট খায় না, কিম্বা শুধু সিগারেট কেন, যা করতে ইচ্ছে করে তা করে না সে যে আমার চেয়ে ভাল আছে, তার জীবন যে আদর্শ জীবন, সুখের জীবন তাও তো নয়?

বুঝি না বাবা আপনার কথা।

বুঝবে। বয়স হলে বুঝবে। এখন তো ছেলেমানুষ। বড় হও। তখন বুঝবে।

আমি এখন কিছু কম বুঝি না?

কী বোঝ।

কী আবার? সব কিছু। কটা বাজে দেখুন তো।

পৌনে পাঁচটা। তোমার ঘড়ি কী হলো?

বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। উঠি।

আর একটু বস।

উহুঁ। তাহলে হোস্টেল থেকে বের করে দেবে।

দিক, আমার এখানে এসে থাকবে।

আপনি মেয়েদের হোস্টেল খুলেছেন নাকি?

ভরসা দাও তো খুলি।

জাহেদা হেসে উঠল, বলল, মেয়েদের ঝামেলা অনেক। মাথার ঘিলু নাড়িয়ে দেবে। জিজ্ঞেস করবেন আমাদের দারোয়নকে।

সে বেটা সেই জন্যই বোধহয় গলায় ক্রুশ বেঁধেছে।

জাহেদা দ্রুত স্লিপার পরে নিল। দরোজার কাছে গেল। গিয়ে একবার ইতস্তত করল।

বাবর বলল, আমার চিঠি পেয়েছিলে?

ঘাড় কান্ত করে নীরবে হ্যাঁ বলল জাহেদা। আর সেই সঙ্গে ভারি উদ্বিগ্ন দেখাল তাকে। বাবর জিগ্যেস করল, কোনো গোলমাল হয়েছে নাকি?

না।

তাও ভাল। আমি ভাবলম চিঠিটা সুপারের হাতে পড়েছে বুঝি।

ও চিঠি পড়লেই কী।

আমিও তাই বলি। তবে তোমার কাছে শুনেছিলাম যে বেটি নাকি একটা শকুন। কেবল ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। চিঠি খুলে খুলে পড়ে।

এটা পড়েনি। কিন্তু–

কী কিন্তু?

যাব কেমন করে?

আনন্দে লাফিয়ে উঠল বাবরের হৃৎপিন্ড। যাবে তাহলে জাহেদা। যাবে তার সঙ্গে। এত সহজে রাজি হবে সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। খুশিতে প্রায় জড়িয়ে এলো তার উচ্চারণ। কোনো মতে বলল, যাবে কী করে মানে? গাড়িতে যাবে।

সে নয়। হোস্টেল থেকে বেরুব কী করে?

পারবে না?

না।

কিছু একটা বলে? মাত্র তিন চার দিনের জন্য।

তিন-চার-দিন!

হ্যাঁ। যেতে একদিন, আসতে একদিন, একদিন দুদিন ঘোরাফেরা।

তাহলে থাক। অসম্ভব। বেরুনোই যাবে না।

খুব যাবে। আমি ব্যবস্থা করব।

কীভাবে?

দ্যাখ না তুমি।

তবু শুনি।

আমি একটু ভেবে দেখি।

আসলে বাবর আগে থেকেই ভেবে রেখেছে কী করে জাহেদাকে সে হোস্টেল থেকে বের করবে। চিঠিটা লেখার সময়ই ভেবে রেখেছে সে।

বলল, ভেবে দেখি কেমন? আমরা পরশু দিন সকালে রওয়ানা হবো। তুমি সকালে তৈরি হয়ে একটা স্কুটার ডেকে সোজা আমার বাসায় চলে এসো। আটটার মধ্যে। ঠিক আটটার সময় বেরুতে হবে। নইলে সন্ধ্যের আগে রংপুর পৌঁছন যাবে না।

উদ্বিগ্ন শংকিত চোখে নীরবে জাহেদা কথাগুলো শুনল। তার একটা মন রাজি হতে চাইছে না, আরেকটা মন কীসের আকর্ষণে যে এগিয়ে যাচ্ছে তা সে নিজেও জানে না, বারণও করতে পারছে না। কোনোমতে ঢোকা গিলে সে শুধু উচ্চারণ করল, আচ্ছা।

পরশু আটটার মধ্যে।

আচ্ছা।

আমি পৌঁছে দিয়ে আসি হোস্টেলে?

না।

আবার না বলছ?

জাহেদা করুণ ভাবে হাসল। তখন আবার সেই রকম মায়া হলো বাবরের। তাকে আদর করতে ইচ্ছে করল বাচ্চা মেয়ের মত। বদলে বলল, আচ্ছা, মান্নানকে বলছি স্কুটার ডাকতে। ততক্ষণ বস।

জাহেদা সোফার এককোণে চুপ করে জড়সড় হয়ে বসে রইল। তার কান পথের দিকে।

কখন কুঁটারের শব্দ শোনা যায়।

বাবর বলল, এখুনি এসে যাবে স্কুটার।

বাবর তাকে গভীর চোখে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে চারদিকের প্রতিটি বস্তু যেন অবলুপ্ত হয়ে গেল। রইল। শুধু জাহেদার মুখ। সে মুখে জামার জাফরান রংয়ের বিচ্ছুরিত আভা। জাহেদার ঠোঁট নড়ে উঠল একবার। টলটল করে উঠল যেন রংটা। জাফরান রংয়ের লিপিস্টিক। একটু আগে তার থেকে খানিকটা লেগেছিল। কফির পেয়ালায়। পেয়ালা থেকে নিঃশেষে তা বাবর তুলে নিয়ে নিয়েছে ঠোঁট দিয়ে। প্রত্যুত্তরে বাবরের ঠোঁটও যেন নেড়ে উঠল তার ইচ্ছার অপেক্ষা না করেই।

বাবর হাসল।

তখন জাহেদাও হাসল। তেমনি ভীত করুণ এক চিলতে হাসি। বলল, আজ সারাদিন কোথায় ছিলেন?

বাবর যেন কোনো কবিতার পংক্তি উচ্চারণ করছে এমনি সুরে বলল, কাজে। কাজে ছিলাম, জাহেদা। ব্যবসার কাজে। এত কাজ। যদি কাজ না করতে হতো।

জাহেদা আবার হাসল। সেই রকম।

বাবর তখন বলল, তুমি যদি যেতে না চাও তো ঠিক আছে। উদ্বিগ্ন তীক্ষ্ণ চোখে জাহেদা তাকাল। তোমার অসুবিধে হলে থাক না। পরে কখনো যাওয়া যাবে।

পরে কেন?

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, যেতে চাও না।

নাতো। কত কিছু দেখব। বাবা কোনোদিন কোথাও নিয়ে যাননি। যাব না কেন? যাব।

অনেক কিছু দেখতে পাবে। বাংলাকে জানবে। তোমরা সব ইংরাজি পড়। দেশ চেন না। নিজের দেশ না চিনলে হয়?

জানি।

সেই জন্যেই যাবার কথা যখন হলো, সবার আগে তোমার কথা মনে পড়ল। বাবা কোথাও নিয়ে যাননি তো কী হয়েছে? তুমি বড় হয়েছ। নিজেই যাবে। শুধু বাংলা কেন সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে। আমার এক বান্ধবী ফ্রান্সে আজ তিন বছর–

বাইরে স্কুটারের শব্দ শোনা গেল।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল জাহেদা।

যাই।

এসো জাহেদা। পরশু আটটার মধ্যে?

আচ্ছা।

আটটার আগেই এসো।

কী যেন ব্যবস্থা করবেন, বললেন না?

বাবরের একবার ইচ্ছে হলো, বলে দেয়। বলবে? না, থাক। এখন না বলাই ভাল। বলল, কাল ভোরে আমাকে টেলিফোন কোরো হোস্টেল থেকে। রাতটা ভেবে দেখি।

আচ্ছা।

জাহেদা স্কুটারে গিয়ে বসল। ড্রাইভার ভাবল, বাবরও বুঝি আসবে। বাবর তখন তাকে ইশারা করল যেতে। জাহেদা গলা বাড়িয়ে বলল, খোদা হাফেজ।

বাবর হাত নাড়ল। শূন্য ফটকে দাঁড়িয়ে ভাবল, মেয়েটা এত বিশ্বাস করে তাকে। হোস্টেল থেকে কী করে বেরুবে সেইটো জানার জন্যে সারাদিন এখানে বসেছিল। দ্বিতীয় বার অনুরোধ পর্যন্ত করতে হলো না।

বিশ্বাস?

বাবর হাসল। বিশ্বাস বস্তুটাই আপেক্ষিক, এই উপলব্ধি জাহেদার এখনো হয়নি। বিশ্বাস একটা পণ্যের নাম। এর কিছু জাত স্বদেশে তৈরি হয়, কিছু বিদেশে, আমদানি করতে হয়, কিছু রফতানী করি। অবিকল একটা পণ্য।

ঘরে এসে জাহেদার পেয়ালাটা ছোঁ মেরে তুলে নিল বাবর। পেয়ালায় আবার রং লেগেছে, জাহেদার ঠোঁটের রং, জাফরান লিপস্টিক। বাবর দুই ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরল সেখানে। সম্পূর্ণ রংটাকে গ্রাস করে নিল। ঠাণ্ডা কটু কফির তলানি দাঁতের ফাঁক দিয়ে মুখে চুকে গোল তার। কিন্তু সে ফেলে দিল না। পেয়ালার ভেতরে এখনো যেন জাহেদার নিঃশ্বাস ঘুরছে। তুষিতের মত এক ঢোকে সবটুকু উচ্ছিষ্ট পান করল সে। তারপর বিহ্বললের মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, একটা পোকা খাবার পর টিকটিকির মত স্ফীত স্তব্ধ হয়ে থেকে, সে টেলিফোনের কাছে গেল। দ্রুত পাতা উলটে বার করল রশিদ ট্র্যাভেল এজেন্সির নম্বর।

বাবর বলছি।

স্লামালেকুম স্যার, কী খেদমত করতে পারি?

খেদমত? এমন খেদমত করার সুযোগ তুমি আর কখনো পাওনি–মনে মনে বলল বাবর এবং হাসল।

কাল চাটগাঁয়ে যাব। কালই ফিরব। রিটার্ন টিকিট চাই।

কাল কখন?

ধরুন, যাব দশটা এগারটা নাগাদ, ঘণ্টাখানেক পরে।

আচ্ছা, আমি একটু পরেই জানাচ্ছি।

যে করেই হোক সিট দিতে হবে।

আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব স্যার।

ব্যবসার কাজে ভীষণ দরকার। না হলেই নয়। কাউকে ক্যান্সেল করিয়ে হলেও–

ও-কে স্যার।

টেলিফোন রেখে দিল বাবর। অধীর হয়ে পায়চারি করল বার কয়েক। হাঁ করে শিম্পাঞ্জির ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল, যেন এ জন্তু এর আগে সে কখনো দেখেনি। তারপর বসল। ঠিক সেই জায়গায় যেখানে এতক্ষণ জাহেদা বসেছিল। এতক্ষণ বসে থাকার ফলে সেখানে একটা কুলোর মত গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। গর্তটা নিখুঁতভাবে মিলিয়ে সেখানে নিজের নিতম্ব স্থাপন করল বাবর। হেলান দিল সোফার পিঠে। পা টান করে দিল সমুখে। ভাবতে লাগল জাহেদার কথা। আশ্চর্যজনকভাবে জাহেদার মুখটাকে মনে হলো অবিকল বাটপাতার মত।–তেমনি সবুজ, সপ্রাণ, পাতলা, তীক্ষ্ণধার।

সমস্ত কামরায় ঝনঝনি তুলে বেজে উঠল টেলিফোন।

হ্যালো।

ওপার থেকে তখুনি সাড়া এলো না। বাবর আবার অধীর গলায় বলল, হ্যালো।

তখন বাবলির গলা শোনা গেল।

আমি বলছি।

বল।

চুপ করে রইল বাবলি।

কই, বল। আমি শুনছি।

এটা কী করেছেন?

কোনটা?

বই।

ওহ, বই? হ্যাঁ, বইটা বেশ ভাল, পড়।

নিজেকে খুব চালাক মনে করেন?

কে না করে? কেউ নিজে বলে, সে বোকা?

বলে। চালাক যারা তারাই বলে। আর যারা বোকা তারা নিজেদের চালাক ভাবে। বুঝেছেন?

তোমার বয়স হয়েছে।

তার মানে?

তুমি বুদ্ধিমতির মত কথা বলতে শুরু করেছ। আমি খুব খুশি হলাম। আমার কাছে কাল না এলে আজ একদিনে এতটা বড় হতে না।

বইটা ফেরত নিয়ে যাবেন।

যদি না নিই?

নিয়ে যাবেন।

আমি যা দিই ফিরিয়ে নিই না। বাবলি, তুমি শুধু শুধু রাগ করছি। যদি সত্যি চাও, আমি আর কোনোদিন তোমাকে ডাকব না, তোমার কথা মনে করব না। আমি কখনো কারো ওপর জোর করি না। সেটা আমার স্বভাবই নয়। বাবলি, শুনছ? হ্যালো।

হ্যালো। নিষ্প্রাণ গলায় বাবলি সাড়া দিল।

বাবর তখন আবার মুখর হলো, আমি অপর পক্ষের ইচ্ছার খুব বড় দাম দিই। আমার কোনো ইচ্ছা নেই। বলতে গেলে ইচ্ছা কী?–তা আমি জানি না। বিশ্বাস কর। কাল যা হয়েছে তা মনে কর অন্য কারো জীবনে হয়েছে। সে তুমি নও, সে আমি নই। আর যদি মনে কর বইটা ফিরিয়ে দিলে তোমার ভাল লাগবে, দিও।

বাবলি চুপ করে রইল।

কিছু বল। কথাও বলবে না? বেশ তো।

হ্যালো।

বল বাবলি।

আপনি–আপনি আমার এ কী করলেন?

আমি তো কিছু করিনি।

আমিও তো নিজে কিছু–

আমি জানি। আমরা কেউ কিছু করিনি। হবার ছিল হয়ে গেছে। মনে কর একটা স্বপ্ন দেখেছি। খারাপ স্বপ্ন। আসলে এই অনুতাপ হওয়াটাই খারাপ। অনুতাপ কখনো করবে না। অনুতাপ করে চেহারা বদলান যায় না। তোমাকে একটা কথা বলি জীবনে কাজে লাগবে। অনুতাপ কখনোই করবে না। অনুতাপ জীবনের শত্রু। ভাল না লাগে, ভুলে যাবে। যা করতে ইচ্ছে হয়, তাই করবে। আসলে আমি জানি, তোমার মন বলছে আমার সঙ্গে আবার দেখা হোক। কিন্তু লোক-ভয়, সমাজের ভয়, কত রকম ভয় তোমাকে

ভাবিয়ে তুলছে। বাবলি একদিন এসো। যেদিন তোমার ইচ্ছে। যখন তোমার সময় হয়। আসবে? বাবলি। আসবে?

জানি না।

এও ভাল। ভুল জানার চেয়ে কিছু না জানা অনেক ভাল! এসো। কিন্তু! মন খারাপ কর না! আজ পড়াশোনা কর না। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। আমি হয়ত স্বপ্নে আসল।

কিছু বলল না বাবলি। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর টেলিফোন বেখে দিল সন্তর্পণে। ঘুমের মধ্যে খুঁট করে একটা শব্দ হলো যেন, আর কিছু নয়। অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিক। বাতিটা জেলে দিল বাবর। নানা আকারের ছযা মুহোর্ত ইতস্তত সৃষ্টি হলো চারদিকে, নানা ঘনত্বে আলো! দেয়ালে নিগ্নে। মেয়েটায় মুখ যেন হেসে উঠল। হঠাৎ। অকাবণে বায়াফ্রার কথা মনে পড়লে তার। মনে পড়ল সেই কথাটা বায়াফ্রার গোটা একটা পুরুষ ভুলে যাচ্ছে কী করে খেতে হয়, চিবোতে হয়, জিহ্বা ব্যবহার করতে হয়। নতুন করে তাদের শেখাতে হবে। আর এই সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা আর উলঙ্গ দেহে যুদ্ধের মধ্যেও রমণীরা সেখানে গর্ভবতী হচ্ছে, জন্ম দিচ্ছে চক্ষুসার উদরসর্বস্ব শিশুকে। সেই সব শিশুকে কি শেখাতে হবে সঙ্গম কী করে করতে হয়? উত্থিত শিশ্ন মুঠো করে ধরে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকবে তারা?

না।

বাবর হাসল। আহার এবং সঙ্গম কাউকে শেখাতে হয় না। বায়াফ্রার ওরা ঐ চমকপ্রদ কথা ছেড়েছে নিছক সহানুভূতি আদায়ের উপায় হিসেবে। অর্থাৎ আমাদের খাদ্য দাও, আমাদের বাঁচিয়ে রাখা। আমন কাব্য করে না বললে আমার গোলার দরোজা আমি খুলে দেব কেন?

কথা। শুধু কথা। কথা তার জীবিকা। কথা তার পন্থা। টিভিতে সে সুন্দর করে কথা বলে দুটো পয়সা আসে বলে। বাবলি জাহেদা ওদের সঙ্গে কথা বলে সঙ্গমে তাদের সম্মত করতে। সে যেমন চুরি ডাকাতি করে বাঁচতে চায় না, তেমনি ধর্ষণে বিশ্বাস করে না।

সেই গল্পটা মনে পড়ে গেল বাবরের। নতুন বিবাহিত স্বামী স্ত্রীকে বলছে, দ্যাখ, চাঁদ উঠেছে, আকাশে। কত তারা চিকমিক করছে, কী মিষ্টি বাতাস দিচ্ছে। স্ত্রী শুনে যাচ্ছে। স্বামী বলেই

চলেছে, বাগানে ফুল ফুটেছে, আর দ্যাখ—। তখন তাকে থামিয়ে স্ত্রী উত্তর করল, বুঝছি, তুমি আমারে করবার চাও।

অশিক্ষিতা হলেও গল্পের এই নায়িকাটি বুদ্ধিতে প্রখরা। সে জানে কথার পরিণামে কী আসবে।

এতটুকু বুদ্ধি আমাদের অনেক নাগরিকই রাখেন না। পল্টনে যখন বক্তৃতার তুবড়ি ছোটান নেতারা, কজন বোঝে, পরিণামে নতুন উপায়ে শোষণই হচ্ছে বক্তার লক্ষ্য?

রশিদ ট্রাভেল এজেন্সি থেকে টেলিফোন এলো।

স্যার, দশটা পঁয়ত্রিশে যেতে পারবেন, ফেরার সীট দুপুরে নেই, বিকেলেও নেই, লাস্ট ফ্লাইটে আছে, রাত সাড়ে নটায়। এতক্ষণ আপনার ফোন এনগেজড ছিল।

হ্যাঁ। তাহলে ঐ টিকিটাই করে রাখুন। আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কী নামে হবে?

কেন? আমার নামে।

ও-কে স্যার

৯. পতেঙ্গা এয়ারপোর্ট

পতেঙ্গা এয়ারপোর্ট থেকে সোজা শহরে এসে টেলিগ্রাফ অফিসে ঢুকল বাবর। একটা ফরম নিয়ে খসখস করে লিখল–কী লিখবে আগে থেকে ভাবা ছিল তারা—

এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম

জাহেদা ইসলাম

সেইন্ট মেরি কলেজ হোস্টেল

ইস্কাটন, ঢাকা

ফাদার সিরিয়াসলি ইল, কাম শার্প।

–মাদার।

পয়সা গুণে দিল বাবর। গলা বাড়িয়ে জিগ্যেস করল, টেলিগ্রামটা আজকেই পাবে তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

কখন পাবে? এই ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে।

ধন্যবাদ।

বাইরে বেরিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল বাবর, হাসল। একটা সিগারেট ধরাল যত্ন করে। জাহেদা আজ সকালে টেলিফোন করেছিল। তখন তাকে সে বলেছিল। এই রকম একটা নিয়ে। তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল জাহেদা।

না, না, বাবার অসুখ বলে দরকার নেই।

দূর পাগল অসুখ বললেই সত্যি সত্যি অসুখ হয় নাকি? ওসব কুসংস্কার।

যদি কেউ ধরে ফেলে।

কারো সাধ্য নেই। চাটগাঁ থেকে টেলিগ্রাম আসবে। তোমার বাবা তো ওখানেই থাকেন। কেউ ধরতে পারবে না। বলে বাবর আর বেশি সময় দেয়নি জাহেদাকে। চট করে যোগ করেছে, কাল আটটার মধ্যেই আসা চাই। কেমন? এখন রাখি।

জাহেদাকে কেবল যেটা বলেনি তা হচ্ছে সে নিজে চাটগাঁ যাবে টেলিগ্রাম করতে।

একটা রিকশা নিল বাবর। বেশ মিষ্টি, স্বচ্ছন্দ, সুন্দর লাগছে সব কিছু। অনেকদিন পর চাটগাঁ আসা হলো। কেমন নতুন লাগছে সব। সাইনবোর্ড, মানুষ, গাড়ি, উঁচু নিচু পথ, বাতাস, রোদ–সব কিছু। কোন দিকে যাবে? খানিক্ষণ ঘুরে বেড়ালে হয়। এখন আর কিছু করার নেই, ভাববার নেই। এখন শুধু অবসর। শুধু আলস্য।

বাবর রিকশা থেকে নেমে হাঁটতে লাগল।

আজ ঢাকায় ফিরে রাতেই গাড়িটা দেখেশুনে রাখতে হবে। লম্বা জার্নি। তেলও আজই কিনে রাখবে সে। মান্নানকে বলবে গাড়িটাকে একটা গোসল দিতে। অনেকদিন যত্ন নেয়া হয়নি। সেদিন ময়মনসিংহ থেকে ফেরার পথে লক্ষ করছিল ক্লাচে কেমন একটা শব্দ হচ্ছে চাপ দিলেই-অল্প বয়সী কুকুরের মত আর্তনাদ। কাল জাহেদার সঙ্গে দেখা হবে। কাল রাতে তারা থাকবে রংপুরে।

আজ শুধু অবসর। একটু ঘুমিয়ে নিলে হয়! হ্যাঁ, ঘুমুঝে সে। এখন মোটে সোয়া বারোটা বাজে। রাত সাড়ে নটায় তার ফিরতি প্লেন। স্কুটার নিয়ে হোটেল শাজাহানে এলো বাবর। হাসল। বাবরের ছেলে হুমায়ূন। হুমায়ুনের ছেলে আকবর। আকবরের ছেলে শাজাহান। যোগাযোগ মন্দ নয়। বাবা তার নামটা রেখেছিলেন বাজা বাদশার নামে। বেঁচে থাকলে বুড়ো আরামে থাকতে পারত। সারা জীবন তো ইস্কুলে মাস্টারি করে গেছেন। আলস্য পরম শত্রু, উর্ধ্বমুখে পথ চলিও না, ইক্ষুরস অতি মিষ্ট–লেখ বাবারা, হাতের লেখা লেখ। এরপর আঁক কষতে হবে-তিন তিরিক্কে নয়, তিন চারে বারো। এরপরে ইংরেজি আছেসান নেভার সেটস ইন ব্রিটিশ এম্পায়ার।

হাঃ। সত্য মাত্রেই আপেক্ষিক।

রেজিস্টারে নাম লেখাল বাবর। রিসেপসনিস্ট চাবি নিল বোর্ড থেকে। তখন চোখে পড়ল

বাবরের, একটা রুমের কার্ডে লেখা এম ডি ফিরোজ মাজমা। এ নাম তো গণ্ডায় গণ্ডায় থাকার কথা নয়।

সে জিগ্যেস করল, ভদ্রলোক ঢাকা থেকে এসেছেন?

বিজনেস ম্যান?

জি, হ্যাঁ।

লম্বা? ফর্সা মত? গোফ আছে সরু?

জি, তিনিই।

বাবর ওপরে এসে ম্যাজমাদারের কামরায় নক করল।

অন্দর আও।

ভেতর থেকে মাজমাদারের উর্দুই শোনা গেল। দরোজা ঠেলে ঢুকল বাবর। দেখল ফিরোজ বিছানায় কান্ত হয়ে শুয়ে তাস খেলছে, সমুখে এক ভদ্রলোক, মাঝখানে একরাশ টাকা খুচরো পয়সা।

আরে, আপনি? আসুন, কখন এলেন ঢাকা থেকে?

আজই। কাজ ছিল। তিন তাস?

এই আর কী! সময় কাটানো। ইনি আমার বন্ধু নজমুল হক।

ভদ্রলোক যন্ত্রের মত হাত বাড়িয়ে দিলেন নিঃশব্দ।

বাবর বলল, বোর্ডে আপনার নাম দেখলাম। কবে এসেছেন?

দিন চারেক হয়ে গোল।

ব্যবসার কাজে?

তাতো বটেই। তবে কাজ শেষ। এখন একটু অকাজের ধান্দায় আছি। বলে চোখ খাটো করলেন ফিরোজ মাজমাদার। ব্যাখ্যা করলেন, মানে বোঝেন তো? একটু টেষ্ট বদলানো। হক সাহেব বললেন ভাল ভাল জিনিস আছে, কোথায় যেন বললেন হক সাহেব?

নজমুল হক বিকারহীন উচ্চারণ করলেন শিয়ালকুক্কা।

শিয়ালবুক্কা কী? বাবর অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।

একটা জায়গা। রাঙ্গামাটি যেতে পড়ে।

অদ্ভুত নামতো।

হ্যাঁ। শিয়ালবুক্কা।

নজমুল হক উচ্চারণ করলেন না তো যেন শেয়ালের ডাক ডেকে উঠলেন। তারপর ঘোঁৎ করে একটা শব্দ তুলে তাসে মনোযোগ দিলেন।

ফিরোজ মাজমাদার বললেন, শিয়ালবুক্কায় নাকি খাসা পাহাড়ি মাল পাওয়া যায়। যেমন ঊরু, তেমনি দুধ, তেমনি শরীর! কি?

ভালই তো।

খ্যা খ্যা করে হাসতে হাসতে ফিরোজ গোলাশ চুমুক দিয়ে কাবার করলেন। বাবর এতক্ষণে দেখল একটা হুইস্কির বোতল টিপয়ের নিচে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে।

চলবে নাকি বাবর সাহেব?

কী?

হুইস্কি। যদি বলেন শিয়ালবুক্কায়ও হতে পারে। যাবেন?

নজমুল হক আড়ে একবার দেখে নিলেন বাবরকে।

বাবর বলল, আপনিই যান।

ভয় পেলেন নাকি? আরো আপনার ভয় কী সাহেব? বিয়ে করেননি, আছেন বেশ। আমরা শালা বিয়ে করে পস্তাচ্ছি। নিত্য অসুখ বিসুখ। মেজাজ মাশাল্লা বাঁধিয়ে রাখার মত। দিন রাত্রির খ্যাচ খ্যাচ ফ্যাচ ফ্যাচ। শুয়েও সাহেব শান্তি নেই। শালা রোজগার করি। কার জন্যে? জায়গাটার নাম যেন কী হক সাহেব?

শিয়ালবুক্কা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ শিয়ালবুক্কা। ফিরোজ মাজমাদার গা দুলিয়ে দুলিয়ে ছড়ার মত বার কয়েক নামটা উচ্চারণ করলেন। তারপর একটা গেলাশ নিয়ে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে বাবরের হাতে দিয়ে বললেন, চলুন না। ভাইসাব। বিকেলে যাব। হক সাহেবের গাড়ি আছে। রাতে থাকব। দুই ভাই মিলে খেলাধুলা করে আবার সকালে ফিরে আসব চলুন।

থাকগে।

আরে বললাম তো, বিশ্বাস না হয়। হক সাহেবকে জিগ্যেস করে দেখুন না, কেমন খাসা জিনিস। পম পমপম। মাল নয় তো পশমি মোজা। যেমন গরম, তেমনি আরাম, কী বলেন হক সাহেব।

দ্বিগুণ মনোযোগের সঙ্গে নজমুল হক তাস। শাফল করে চললেন। তারপর চূড়ান্ত গাম্ভীর্য সহকারে উচ্চারণ করলেন, মাল ভাল।

বললাম না? চলুন মজা হবে।

নজমুল হক তাস দিলেন ফিরোজ মাজমাদারের হাতে। তিনি তাস রেখে দিলেন। থাক, পরে খেলব।

তখন নজমুল হক নিজেই খেলতে লাগলেন বধির এবং কালার একটি আদর্শ উদাহরণ হিসেবে।

বাবর বলল, আপনার ব্যবসা কেমন চলছে বলুন মাজমাদার সাহেব? ঢাকায় তো দেখাই হয় না।

ব্যবসার কথা বলবেন না। এসেছিলাম। একটা ধান্দায়। যাওয়া আসাই সার।

কেন?

টু পারসেন্ট থাকলেও বুঝতাম। এক পারসেন্ট হয় কি-না সন্দেহ।

চালিয়ে যান।

আল্লা ভরসা ভাইসাব আল্লা ভরসা। অটোনমি না। আসা তাক শান্তি নাই। আগাখানি আর পাঞ্জাবিরাই মধু খেয়ে যাচ্ছে, আর আমরা শালা বুড়ো আঙুল চুষে চুষে নৃত্য করে গেলাম।

শেখ মুজিব তো এবার পাওয়ারে আসবেন মনে হচ্ছে।

অটোনমি পাব তবে?

ওঁর প্রোগ্রাম তো তাই।

আল্লার কাছে দোয়া করি, ভাইসাব। আমি শেখ মুজিবের পক্ষে। তার মত একটা বাঘের বাচ্চা হয় না, আপনাকে এই বলে রাখলাম হক সাহেব। কী বলেন বাবার সাহেব? ঠিক কিনা কেন? অত বড় কলিজাটা কার?

বাবর শেষ চুমুক দিয়ে গেলাশটা খালি করল। সঙ্গে সঙ্গে ভরে দিলেন ফিরোজ মাজমাদার। ঢেলে দিতে দিতে বললেন, এই বলে রাখছি। হক সাহেব, শেখ মুজিব ছাড়া অন্য কারো বাকসে ভোট দেবেন তো আপনার সাথে আর কথা নাই।

নজমুল হক বিকারহীন কণ্ঠে মন্তব্য করলেন, ইলেকশন হয় কি-না দেখেন।

হবে না মানে? ঊরুতে চাপড় দিয়ে উঠলেন ফিরোজ মাজমাদার।

ভাসানীর কথাটা মনে রাখবেন। নজমুল হক তাসের দিকে চোখ রেখে বললেন।

রেখে দিন ভাসানী। অটোনমি চাই। অটোনমি না হলে রক্ষা নাই। আপনার মার্গেও বাঁশ, আমার মার্গেও বাঁশ। বুঝলেন? শেখ সাহেব আছে বলেই দেশটা এখন চোখে দেখেন। কী বলেন ভাইসাব?

বাবর হাসল। বলল, পলিটিকস আমি বুঝি না।

আঃ হা। ফিরোজ মাজমাদার বিরক্ত হয়ে উঠলেন। পলিটিকস না বোঝেন নিজের ভাত কাপড় তো বোঝেন?

চুপ করেন, চুপ করেন। নির্মীলিত চোখে মৃদুকণ্ঠে নজমুল হক বললেন। বলে একটা বিলাসী হাই তুললেন দীর্ঘক্ষণ ধরে। লোকটার অর্ধেক দাঁত নেই, লক্ষ করল বাবর।

নীরব হয়ে গেলেন ফিরোজ মাজমাদার। একটা বড় ঢোক হুইস্কি গিলে অনাবিল হাসি সৃষ্টি করে বাবরকে বললেন, রেখে দিন পলিটিকস। শালার ওসব মানুষে আলোচনা করে? সময় নষ্ট। হ্যাঁ ভাইসব, যাবেন শিয়ালবুক্কায়? অ্যাঁ?

বাবর বলল, আসলে কী জানেন, ওসব বাইরে টাইরে আমি কখনো যাই না।

তা যাবেন কেন? আপনার টেলিভিশনে অভাব কী?

ছি, ছি, তা নয়। আরে, ঢাকায় আমিও থাকি। সেদিন দেখলাম এক সুন্দরীর সাথে কাফে আরামে বসে আছেন। বয়সটা কমই দেখলাম। কে?

আমার ভগ্নি।

দুরো সাহেব! বন্ধু-বান্ধবের সাথে মিছে কথা কইতে নাই। প্রেম-ট্রেম করেন নাকি?

কী যে বলেন।

তাহলে আর আপত্তি কী? চলুন শিয়ালবুক্কায়।

আপনারাই যান।

বুঝেছি, বুঝেছি, প্রেম নাহলে চড়তে মজা লাগে না আপনার।

মনের মধ্যে কোথায় যেন হোঁচট খেল বাবর। ফিরোজ মাজমাদারের কথাটা কি সত্যি? না। যদি হবে তাহলে পাহাড়ি মেয়ের সঙ্গে টাকার বিনিময়ে শুতে বাধা কী?

লতিফার সঙ্গে তার কীসের সম্পর্ক ছিল? বাবলির সঙ্গে কী সম্পর্ক সে তৈরি করতে চেয়েছিল? জাহেদাকে কেন নিয়ে যাচ্ছে উত্তর বাংলায়। তাদের কাছে তো ঐ একটা বস্তুই সে আশা করে যা শিয়ালবুক্কাতেও পাওয়া যায়। তবে বাধাটা কোথায়?

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন ফিরোজ মাজমাদার।

কি, ঠিক বলিনি?

বাবর উঠে দাঁড়াল। বলল, আপনি খাওয়া-দাওয়া একটু বেশি করেছেন। আমার আবার কাজ শেষ হয়নি, এক্ষুণি আগ্রাবাদ যেতে হবে। চলি।

বলে সে নিজের ঘরে এসে হুইস্কির হুকুম করল। জামা জুতো খুলতে খুলতে একরোখার মত দুপেগ নীট উজার করে নিঃশ্বাস নিল একটা। তারপর সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়। বলল, বেয়ারা, সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় আমাকে জাগিয়ে দিও। আর কেউ আমাকে খোঁজ করলে বলবে সাহেব কামরায় নেই।

১০. রাতের আকাশ

প্লেনে রাতের আকাশ দিয়ে ঢাকায় ফিরতে ফিরতে তার মনে পড়ল আজ দুপুরে পরপর সে কয়েকটা স্বপ্ন দেখেছে। কোনটা আগে কোনটা পরে এখন আর মনে নেই। খুঁটিনাটিও মনে পড়ছে না। কেবল কয়েকটা ছবি।

একটাতে তার বাবা ছাতা মাথায় বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। গালের দাড়ি বেয়ে টপটপ করে ঝরছে বৃষ্টির ধারা। হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, ভিজে গেছে। বাবা ধুতি পরতেন। সে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল কিন্তু বাবা একটা কথাও বললেন না।

আরেকটাতে দেখেছে, তার গলা কেটে কারা যেন ফেলে রেখেছে। তার পাশে চুল খুলে কাদছে অচেনা একটা মেয়ে। পাশ দিয়ে শেখ মুজিব যাচ্ছিলেন। তার পা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কী যেন বলতে লাগল সে। শেখ একবার চোখের ওপর হাত রেখে নাবিকের ভঙ্গিতে আকাশ দেখলেন, তারপর ধীরপায়ে চলে গেলেন কুয়াশার মধ্যে।

একটা স্বপ্ন–তার গাড়ির কাচ ভাঙ্গা। একেবারে খোলা। হু হু করে। বাতাস আসছে ঠেলে। কিছুতেই গাড়ি চালানো যাচ্ছে না।

আরো অনেক কিছু দেখেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

হ্যাঁ, একটা মনে হয়েছে।

চিড়িয়াখানায় একটা রোগা সিংহ খুব ল্যাজ খাড়া করে খাঁচার মধ্যে এপাক ওপাক করছে। সিংহের চেহারাটা অবিকল কাজী সাহেবের মত। আর বাবর তাকে একটা মর্তমান কলা সাধছে খাবার জন্যে। কিন্তু সিংহ সেদিকে ভ্রক্ষেপ পর্যন্ত করছে না।

আরেকটা স্বপ্ন— বাবর ক্রমাগত এ-আকাশ ছেড়ে ও-আকাশে, আকাশের পর আকাশ উড়ে যাচ্ছে। আকাশটা মেঘহীন।

দয়া করে আপনাদের সিট বেল্টগুলো বেঁধে নিন।

কোমরে হাত দিয়ে বাবর দেখল সেই যে উঠার সময় বেঁধেছিল, আর খোলা হয়নি। সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলল সে। এক গ্লাশ পানি চেয়ে খেল।

নিচে ঢাকার আলো দেখা যাচ্ছে। ছেলেবেলার জোনাক জ্বলা বনের মত। মাগো, আমার কাজলা দিদি কই?

যাবার সময় এয়ারপোর্টে গাড়িটা রেখে গিয়েছিল। এখন রাত দশটায় একেবারে একাকী দাঁড়িয়ে আছে। অবিকল আমার মত–ভাবল বাবর। গাড়িটার হাতলে সস্নেহে হাত রাখল সে।

তারপর ইচ্ছে করে জাহেদাদের কলেজের সমুখ দিয়ে দুএকটা জানালায় জ্বলা বাতির দিকে তাকাতে তাকাতে বাড়ি ফিরল বাবর।

বাড়ি ফিরে নিজেকে বড় ক্লান্ত, ব্যয়িত কিন্তু ক্ষুব্ধ মনে হলো বাবরের। চোখের ভেতরে জ্বলজ্বল করতে লাগল ফিরতি পথে দেখা জাহেদার হোস্টেলের জানালায় তীব্র আলোর আয়তক্ষেত্রগুলো।

কেন যেন মন খারাপ লাগছে খুব।

কেন?

কিছুতেই সে বুঝে পেল না। অসহায়ের মত টের পেতে লাগল সেই সব কিছু শূন্য করে তোলা অনুভূতিটা বৃহৎ থেকে কেবলি বৃহত্তর হচ্ছে। অস্থির হয়ে উঠছে আত্মা। ভেতরটা ছটফট করছে। কী করলে যে শান্ত হবে তাও বোঝা যাচ্ছে না।

মান্নান এসে বলল, খাবার দেব?

না।

সে চলে গেলে বিছানায় চোখ বুঝে শুয়ে রইল বাবর। হাতে পুড়তে লাগল সিগারেট। কোথায় একটা বেড়াল অবিরাম ম্যাও ম্যাও করে চলছে। তার কী হয়েছে কে জানে?

ছেলেবেলায়, মাঝরাতে, বেড়াল ঐ রকম কাঁদলে মা তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরতেন। বুকের শীতল কোমল মাংসে মশলা হলুদের ঝাঝের ভেতর মাথা ডুবিয়ে থাকতে থাকতে কেমন নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আসত সব অনুভূতি। পৃথিবী গুটিয়ে আসত মায়ের বুকে। অর্ধশূন্য থলের মত মায়ের বুক হয়ে উঠত একমাত্র অবলম্বন।

বাবর বালিশে মুখ ডুবিয়ে রইল অনেকক্ষণ। ভেতর থেকে একটা কান্না পাচ্ছে কিন্তু কিছুতেই বাইরে আসছে না। বাইরে আসছে না বলে ভীষণ ভয় করছে। ভয় করছে এই ভেবে যে স্মৃতিও বুঝি তার কাছে আর যথেষ্ট নয়।

বাবর উঠে দ্রুত হুইস্কির বোতল বার করে সরাসরি খানিকটা পান করল। তারপর গোলাশ খুঁজে খানিকটা ঢেলে বরফ দিয়ে ভরে নিল। বসল। মোড়ার ওপর। অন্যমনস্ক হাতে গোলাশটা ধীরে ধীরে ঘোরাতে লাগল ঘড়ির উল্টো দিকে; শীতল কাচ একবার চেপে ধরল গালে, চোখের গহবরে, কপালে, চিবুকের নিচে।

মাকে যেদিন কবর দেয়া হয় সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল।

বাবর পায়ের নিচে সিগারেটটা পিষে নিবিয়ে দিল।

হাসনু। তার ছোট বোন, বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। ঠোঁট দুটি বিযুক্ত। যেন এই মাত্র কিছু বলেছে বা বলবে।

মাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বাবা?

আল্লার কাছে।

কেন?

আল্লার কাছে সবাইকে যেতে হয় যে, খোকা।

কেন যেতে হয়?

যেতে হয়, তাই।

কেন? আল্লা কে?

তিনি আমাদের সব। তিনি আমাদের তৈরি করে পাঠিয়েছেন। আবার তিনি আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তোমার মাকে তাই আজ নিয়ে গেলেন।

সেখানে বুঝি ঘুমিয়ে যেতে হয়।

হ্যাঁ খোকা, তাই।

হাঃ হাঃ হা।

বাবর চেষ্টা করল। চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল তার। সে একটা দীর্ঘ চুমক দিল গেলাশে।

আজ বাবাকে প্লেনে আসতে আসতে স্বপ্নে দেখেছে সে। বৃষ্টিতে তার দাড়ি ভিজে টপটপ করে পানি পড়ছে। মাঠের ভেতর দিয়ে আসছিলেন তিনি। একটা কথাও বলেননি। বাবরের খুব কষ্ট হতে লাগল। বাবার কথা মন থেকে তাড়াবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে বার কয়েক পায়চারি করল সে। ক্যালেন্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি দেখল। একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাল। ওয়ার্ডরোব খুলে জামা কাপড়ের সুগন্ধ বুক ভরে নিল। গোলাশটা শেষ করে আবার কানায় কানায় সুরায় বরফে ভরে নিল বাবর। যা হাসনু যা। যা এখান থেকে। যা বলছি। হাসনু তো যাবেই না। বরং হাসনু ক্রমশ বড় হতে লাগল তার চোখের ভেতরে।

টেলিফোনটা বেজে উঠল হঠাৎ। জাহেদা? লতিফা? না, লতিফা হবে না। বাবলি?

হ্যালো।

খুব ভারি গলায় কে যেন জিগ্যেস কয়ল, রোজারিও সাহেব আছে?

রং নম্বর।

বসবার ঘরে এসে বসল বাবর। আবার টেলিফোনটা বেজে উঠল। আবার বোধহয় রোজারিওকে চাইছে। বাবর আর ধরল না। কিছুক্ষণ বেজে বেজে ক্লান্ত হয়ে থেমে গেল টেলিফোন। নেমে এলো অখণ্ড নীরবতা।

হাসনু যা বলছি।

দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটি ছুঁড়ে মারল বাবর। ঘুরতে ঘুরতে শূন্যেই নিভে গিয়ে ঘরের কোণায় থুবড়ে মুখী পড়ে গেল।

হাসনুরে, কী চাস তুই?

হাসনুর দুটো দাঁত পোকা খাওয়া ছিল। হাসলে ভারি মিষ্টি লাগত। হাসনু হেসে ফেলল এখন। নিঃশব্দে, দীর্ঘক্ষণ ধরে, শ্লথগতি চলচ্চিত্রের মত।

এখান আরো এক লাগল বাবরের। রক্তের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক তাদের কথা মনে পড়তেই এই বোধটা বিরাট হয়ে উঠেছে যে এখন তার চারপাশে এ দেশে কেউ নেই। আপনি কাকে বলে সে তুলে গেছে বলেই যারা আপন তারা তাকে এমন একা করে যাচ্ছে। বহুদিন পর এ-রকম আবার হচ্ছে বাবরের।

সে ঢকঢক করে খানিকটা পান করল।

হাঃ হা। আমার কেউ নেই। কেউ নেই। কোনো কিছু আমার নয়। না মাটি, না মন, না। মানুষ। বর্ধমানে লেবু গাছটায় লেবু ধরেছে? কানা ফকিরটা বেঁচে আছে না মরে গেছে হাসনু?

দূর, তুই বলবি কী করে? তুই ও তো মরে গেছিস।

সত্যি?

না, বিশ্বাস হয় না, তুই হয়ত বেঁচে আছিস।

তোকে কত খুঁজলাম, পেলাম না।

ওরা তোকে কষ্ট দিয়েছে রে?

বাবর স্পষ্ট দেখতে পায় মাঠের ওপর থমথমে সন্ধে নেমে এসেছে। এতটুকু শব্দ নেই কোথাও। হাঁটতে গিয়ে পায়ে পায়ে আঁঠার মত জড়িয়ে যাচ্ছে অন্ধকার। হাসানুর হাত শক্তি করে ধরে সে তবু হাঁটছে। প্রাণপণে হাঁটছে। বাড়ি পৌঁছুতে হবে। রাতের আগেই পৌঁছুতে হবে যে।

কোথায় গিয়েছিল দুজন মনে নেই। মনে রাখার কোনো প্রয়োজনও নেই। যেন জন্মের পর থেকেই সে আর হাসনু অবিরাম দ্রুতপায়ে সেই অন্ধকার ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে চলেছে।

কে যেন পেছনে আসছে।

কই না।

আবার তাকিয়ে দেখল বাবর। কাউকে দেখল না, তবু মনে হলো কেউ তাদের অনুসরণ করছে। তার হাত ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে ধরবার জন্যে। চট করে হাসনুকে টেনে সে পোলের পাশে ঝোঁপের মধ্যে লুকাল।

হাসনু প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল, দাদা।

চুপ।

হাসনুকে নিয়ে ঝোঁপের মধ্যে মুখগুঁজে পড়ে রইল বাবর। মশা কাটতে লাগল। যন্ত্রণা হতে লাগল। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল তারা। নিচে পোলোর থামে পানি আঘাত করছে, করতালির মত শব্দ উঠছে থেকে থেকে।

হঠাৎ দুটো মানুষের সাড়া পাওয়া গেল পোলের অপর দিকে, নিচে। সাড়া ঠিক নয়, নিঃশ্বাসের শব্দ। তার ভেতরে একজনের যেন হঠাৎ খুব শীত লেগেছে, দাঁতে দাঁতে শব্দ হচ্ছে তাই। আবার কখনো মনে হচ্ছে নিচু গলায় হি হি করে হাসছে।

কী করছে ওরা ওখানে?

বাবর কান খাড়া করল। অন্ধকারে হাসনু তার মুখের দিকে তাকাল। তারার আলোয়, নাকি ভয়ে, শাদা শাদা লাগছে হাসনুর মুখ।

দাদা।

চুপ।

হাসনুর মুখ চেপে ধরে বাবর কান পেতে রাখল ঐ শব্দের উৎসের দিকে। তার মেরুদণ্ড দিয়ে হঠাৎ ঠাণ্ডা তরল কী যেন নামছে অতি দ্রুত। তারপর হঠাৎ উরুর ভেতরটা ভিজে গেল উষ্ণতায়।

ঘড়ঘড় একটা শব্দ হলো সেই মুহূর্তে, ওপারে।

ফিসফিস গলায় কে যেন জিগ্যেস করল, বল শালা, হিন্দু না মুসলমান?

উত্তরে দ্বিতীয় লোকটা হি হি করে হেসে উঠল যেন।

বল।

চাপা গলায়। গর্জে উঠল প্রথম।

আঁ করে একটা শব্দ করল দ্বিতীয়।

তারপর শোনা গেল, হি হি মা, হি হি না, হি হি না না।

চুপ শালা।

বাড়িতে আমার বৌ আছে বাবা। না-আস্তে-না-না।

চিৎকারে ছিঁড়ে যাচ্ছিল অন্ধকারটা, কে যেন চেপে ধরে তা বন্ধ করল। সেই সঙ্গে ধানের বস্তা নামাবার সময় যেমন বুক থেকে শব্দ ওঠে কুঁলিদের সেই রকম একটা রুদ্ধশ্বাস ভারি শব্দ উঠল। আবার, আবার।

তারপর সব চুপ হয়ে গেল।

বাবর হাসনুকে টেনে তুলে দৌড় দিতে যাবে, একেবারে সামনে পড়ে গেল লোকটার। হাতে রক্তমাখা ছুরি। গলায় একটি মাদুলি চকচক করছে। আর কিছু চোখে পড়ল না তার।

আর কিছু মনে নেই বাবরের।

কেবল মনে আছে বাবর মাঠের ভেতর দিয়ে প্রাণপণে দৌড়ুচ্ছে।

আর পেছনে হাসানুর আর্তচিৎকার আকাশে বাতাসে হা হা করছে–দা—দা।

আরো খানিকটা হুইস্কি ঢালল বাবর।

হাসনুকে আর পাওয়া যায়নি।

কেন সে হাসনুকে ফেলে পালাল। কেন লড়াই করল না। কেন? কেন?

কোনটা স্বাভাবিক? পালিয়ে আসা? না, লড়াই করা? গল্পে উপন্যাসে মানুষের আদর্শে রুখে দাঁড়ানোটাই চিরকাল নন্দিত। সিনেমা হলে তালি পড়ে। বই পড়তে পড়তে প্রশংসায় পাঠকের মুখ লাল হয়ে ওঠে। কিন্তু সে নিজে, নিজের প্রাণ নিয়ে, পালিয়ে এসেছে। আমি কি ঘৃনিত বলে চিহ্নিত হবো?

নাকি আদর্শটাই ভুল।

মানুষ যা পারে না। তাই বড় করে দেখতে চায়, দেখানো হয়।

I know they do not know, but I
who have followed so many times
the road from the murderer to the murdered
from the murdered to the punishment
and from the punishment to the other murder, groping
the inexhaustible purple
that night of homecoming
when the Furies began to whistle
in the sparse grass–
I saw snakes crossed with vipers Entained on the Vile Generation
our destiny.

কতদিন পরে জর্জ সেফারিসের বইটা খুলল বাবর। পড়তে পড়তে চোখ ভরে এলো পানিতে। বইটা বন্ধ করে হাত বুলাতে লাগল নরম কভারে। ধুলা জমে আছে। ধুলোয় কিচ কিচ করছে মলাট। পকেট থেকে রুমাল দিয়ে সযত্নে মুছে আলমারিতে রেখে দিল বাবর। গোলাশটা শেষ করল।

হাসনু, আর কোনোদিন আসিস না। তুই যা।

হাসনু গেল না।

আলমারির ভেতরে খুঁজে দেখার ইচ্ছে হলো বাবরের। একবার কয়েকটা কবিতা অনুবাদ করবার চেষ্টা করেছিল সে। কাগজগুলো কই?

হাসনু তুই কি আমাকে মেরে ফেলবি?

এই তো কাগজগুলো। এই তো একটা অনুবাদ সম্পূর্ণ করেছিল সে। ঐ তো আরেকটার কয়েকটা লাইন। ঐ তো বাকিগুলো।

আমি পালিয়েছি বেশ করেছি। একশ বার পালাব। কার তাতে কী।

কাগজগুলো ভাঁজ করে একটা খামে পুরে রাখল বাবর।

সব শালাই পালায়। কিন্তু গল্প করার সময়, লেখার সময়, বক্তৃতায় উল্টোটা বলে। আমি সব জানি। সবাইকে আমার চেনা আছে।

হাসনুরে তুই যাবি না?

শূন্য গোলাশটা ছুঁড়ে মারল বাবর। দেয়ালে লেগে ঝনঝন করে ভেঙ্গে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝিম ধরে উঠল মাথার ভেতরে। চমৎকার কাজ করতে শুরু করেছে। সুরা? বাবর দরোজা খুলে বেরুল বারান্দায়। এক ঝলক বাতাস তার মুখ ধুইয়ে দিয়ে গেল। হঠাৎ। হাত ঘড়ির দিকে তাকাল সে। কই, রাত তো বেশি হয়নি?

কাউকে দেখতে ইচ্ছে করছে। কারো সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে ভাল হতো। কোথাও গেলে হতো। ঘরের ভেতরে গেলেই হাসনু আবার তার পোকা খাওয়া দাঁত নিয়ে হাসতে থাকবে। আর শোনা যাবে সেই আর্তচিৎকার। দা-দা!

বাবর গাড়ি স্টার্ট দিল।

সড়াৎ করে বেরিয়ে এল বড় রাস্তায়। একটানা চালিয়ে জাহেদার হোস্টেলের অদূরে গাড়ি রাখল সে। সিগারেট ধরিয়ে পেছনে মাথা হেলিয়ে পা লম্বা করে দেখতে লাগল হোস্টেলের জানালায় আলোর ছক।

দুপ দুপ করতে লাগল বুকের ভেতরে। সকাল হতে এখনো অনেক বাকি। সকালে জাহেদ আসবে।

জাহেদা

ভাল জাহেদা।

আমার ভাল জাহেদা।

এই আবৃত্তি ক্রমশ অমৃতের মত মনে হতে লাগল তার। প্রশান্ত হয়ে আসতে থাকল আত্মা।

হ্যাট।

ঐ দ্যাখা হ্যাট।

ঐ দ্যাখ কালো হ্যাট।

ঐ দ্যাখ জনের কালো হ্যাট।

ঐ দ্যাখ জনের কালো হ্যাট টেবিলে।

ঐ দ্যাখ জনের কালো হ্যাট টমের টেবিলে।

হাঃ।

এইভাবে শূন্য থেকে এক, এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার, এইভাবে, এইভাবে। শূন্যতা থেকে শুরু করা যায়। শূন্য থেকে আমি। আমি থেকে তুমি। আমি তুমি থেকে সে। আমি, তুমি, সে থেকে অনেকে।

অনেক কি আমরা হয়?

আমি বিশ্বাস করি না।

আমি বলছি, আমি বিশ্বাস করি না। জাহান্নামে যাও।

হাসনু যা। যা বলছি।

না, সুরা পানে কিছু হবে না। কাউকে দরকার। কোনো একটা জীবন্ত মানুষ। অনর্গল কথা কলতে হবে। নইলে আজ রাতে সে মারা যাবে। সেই রক্তাক্ত ছুরিটা সে চোখে দেখতে পাচ্ছে, বর্ধমানের অন্ধকারে, মাঠে, পোলের পাশে, ঝোঁপের ধারে।

দা–দা!

উদ্দাম গতিতে গাড়ি চালিয়ে দিল বাবর।

অনেকক্ষণ গাড়ি একভাবে চালাবার পর কান পাতল বাবর। না, চিৎকারটা আর তাড়া করছে না। তাকে। বাচা গেছে। তবু হাসনুর চেহারা একবার মনে করতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু শত চেষ্টা করেও মনে করা গেল না। তখন স্বস্তিও হলো, আবার একটু দুঃখিতও হলো সে।

চারদিকে তাকিয়ে দেখল বাবর।

সমস্ত শহর ভারি অচেনা মনে হলো তার। পেট্রল পাম্পে এলো সে। ট্যাংক ভর্তি করে তেল নিল।

টেলিফোন আছে?

আছে স্যার।

লাফ দিয়ে নেমে কাচঘেরা ঘরের মধ্যে গেল বাবর। ডায়াল করল।

হ্যালো।

কে, হাসু?

জি।

ভাল আছ, হাসু?

হাসুর নামটা উচ্চারণ করতে ভারি মিষ্টি লাগে বাবরের।

ভাল। আপনি বাবার চাচা?

হ্যাঁ। তোমার বাবা কই, হাসু।

মাদারিপুরে।

মা?

আছেন। ডেকে দিই?

কী করছেন? ঘুমিয়ে? তা হলে থাক।

না, না। মা জেগেই আছেন। মা—আ।

টেলিফোনে ডাকটা শুনতে পেল বাবর। শুনতে পেল চটির শব্দ। শুনতে পেল মিসেস নফিসের খানখনে গলা।

হ্যালো।

আমি বাবর।

নিস্তব্ধতা।

আমি বাবর। হাসুব কাছে শুনলাম জেগে আছেন। কী করছেন?

কিছু না।

আমি আসছি।

দরকার আছে?

আছে।

টেলিফোন রাখল বাবর। মিসেস নাফিস সত্যি তার ওপর রাগ করেছেন। কেমন নিস্তাপ, নিস্পৃহ করে রেখেছেন গলাটা। সেদিন সত্যি সত্যি কয়েকটা কড়া কথা বলা হয়ে গেছে। রসিকতা হয়ে গেছে বড় বেশি নির্মম। আজ পুষিয়ে দেবে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, মিসেস নাফিসকে দেখলেই তার জিবে চুলবুল করে ওঠে। খোঁচাতে ইচ্ছা করে। কেন সে টেলিফোন করতে গেল তাকে? কী দরকার ছিল?

বোধহয় মনে মনে সে এখন এমন কাউকে খুঁজেছিল যার সঙ্গে বিরোধ পদে পদে। যাকে দেখলেই নখগুলো শানিয়ে নিতে ইচ্ছে করে। যদি কোণঠাসা করে প্রতিশোধ নেবার প্রবৃত্তিটা শান্ত করা যায়।

কিন্তু প্রতিশোধ কেন? কার ওপর?

দরোজা খোলাই ছিল। বাবরের পায়ের শব্দে কাজের ছেলেটা বেরিয়ে এলো। নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকল সে।

সোফার ওপর সবুজ চটিতে পা পেতে বসে আছে মিসেস নাফিস। হাতে আজ সকালের বাসী কাগজ। বাবরের মনে হলো রঙ্গমঞ্চে পর্দা উঠেছে। সে তাই হাসল। সেই হাসিটাকেই দীর্ঘ করে চটুল কণ্ঠে বাবর বলল, ভাল তো?

মিসেস নাফিস তীক্ষ্ণ চোখে নিঃশব্দে মাথা ওঠানামা করলেন আস্তে আস্তে। নিঃশব্দ সেই বার্তাঁর অর্থ হতে পারে, হ্যাঁ। অর্থ হতে পারে আমার চোখে আপনি এখন কাচের মত স্বচ্ছ। বাবর আবার বলল, আপনার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তাই। কারণ–। অবিশ্যি রাত বেশ হয়েছে–।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

সুরা এত বেশি কাজ করেছে যে বাক্যগুলি কিছুতেই শেষ করা যাচ্ছে না। বাবর একটা সিগারেট ধরাল অক্ষমতাকে ধামাচাপা দেবার জন্যে। জিগ্যেস করল, নসিফ সাহেব মাদারিপুরে কেন?

ওর মামাকে রেখে আসতে।

সেই মামা?

হ্যাঁ।

যার অপারেশন গল ব্লাডারে?

গল ব্লাডারে নয়, চোখে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, চোখে। চোখেই তো বলেছিলেন। এখন ভাল?

বোধহয়।

বোধহয় মানে?

জিগ্যেস করিনি।

ঠিক, ঠিক। বাইরে আপনার গাড়ি দেখলাম?

বাইরে যাচ্ছিলাম।

ও; কেন?

বলবেন না। একটু আগে হাসুকে নিয়ে খেতে গিয়েছিলাম। রেস্তোরাঁয় চাবি ফেলে এসেছি। এখুনি না গেলে হয়ত আর পাওয়াই যাবে না।

মিসেস নাফিস উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে রইলেন। ভেতরেও গেলেন না, বাইরেও না। এক জোড়া তীক্ষ্ণ চোখ তার ক্রমশ ধার হারাতে লাগল।

বাবর বলল, কোন রেস্তোরাঁ?

কাফে আরাম।

বাবর হাসল। যেন চাবি ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছেন মিসেস নাফিস। সে উঠে দাঁড়াল। বাইরে বেরুল তারা এক সঙ্গে।

মিসেস নাফিস বললেন, দেখা হবে।

বলেই তিনি গাড়িতে সরব করলেন এঞ্জিন। বাবর হাত নেড়ে তারটায় বসল। যতক্ষণ না তার গাড়ি বেরুল বাবর চাবিতে পর্যন্ত হাত দিল না। মেয়েরা গাড়ি চালালে তাদের থেকে দূরে থাকাটা বুদ্ধিমত্তার একটি উজ্জ্বল প্রমাণ মনে করে সে।

বাবর বেরিয়ে পেট্রল পাম্পে এলো তেল নিতে। কাল রংপুরে যাবার এই শেষ তৈরিটা বাকি আছে। চাবি খুলে ছেলেটাকে দিতে যাবে হঠাৎ তার চোখে পড়ল ট্যাঙ্কে তেল ভর্তি।

ওহো তাই তো। একটু আগেই না তেল নিয়েছে? হঠাৎ করে মাথাটা এমন শূন্য হয়ে গেল কেন?

হাঃ খেলে যা। ভাল করে খেলে যা। ব্রাভো খেলারাম।

ধন্যবাদ। হাঃ হাঃ হাঃ।

গাড়ি ছুটিয়ে দিল সে। পেট্রল পাম্পের ছেলেটা বিড়বিড় করে বলল, শালা মাতাল। তারপর তার মুখেও নিঃশব্দ এক টুকরো। হাসি ফুটে উঠল এবং অচিরেই হাসিটা হাইয়ে রূপান্তরিত হলো। তার ঘুম পাচ্ছে।

পুরনো পেন্টিংয়ে দেখেছে ইংল্যান্ডের জলাভূমিতে ঘোড়ায় চেপে শিকার করতে চলেছেন লর্ড। তার সমুখে শিকারী কুকুর। ঠিক তেমনি পেট সরু করে ছুটতে লাগল বাবর নির্জন

অন্ধকার রাজপথ দিয়ে। তীব্র গতিতে টায়ারে অবিরাম একটা হুইসিল বাজতে লাগল তার কানে।

অতিকায় একটা খেলনার মত দেখাচ্ছে ইন্টারকন্টিনেন্টালকে। কাচের দরোজার ওপারে মানুষকে মনে হচ্ছে রঙিন চলচ্চিত্রের চরিত্র। বাবর ভেতরে ঢুকলা চারদিকে দেখল, একবার ভাবল কাফে আরামে যায়, না থাক; সে ছিপ ফেলে একটা সোফায় বসল।

সবুজ শাড়িতে পুকুর ভরা শ্যাওলার মত মন্থর ঢেউ তুলে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন মিসেস নাফিস। বাবর তাকে ডাকল ও না, উঠেও দাঁড়াল না। নিঃশব্দে বিকশিত হাসিতে অপেক্ষা করে রইল।

মিসেস নাফিস কাঁধের চুল চলতে চলতে সরাতে গিয়ে বাবরকে দেখলেন এবং দুপায়ের মাথায় গিয়ে থামতে পারলেন।

বললেন, আপনি!

হ্যাঁ, আমি। বাবর কাছে উঠে এলো! আবার বলল, আমি। আপনি কি আমাকে এখানে আসতে বলেননি।

হ্যাঁ, আমি।

তাহলে ভুল শুনেছি।

কিন্তু–।

হ্যাঁ, আমিও তাই বলি। কিন্তু আপনি যেন বলেছিলেন, দেখা হবে। তাই চলে এলাম।

ও।

হঠাৎ নিঃশ্বাস ফেলে হেসে উঠলেন মিসেস নাফিস।

বাবর বলল, চলুন, কফি খেতে খেতে কথা বলি।

কফি?

হ্যাঁ, কফি।

আপনি তো হুইস্কি ছাড়া কিছু খান না শুনেছি।

কার কাছে?

কেন, আপনারই কাছে। সেদিন অত করে বললাম চা খেতে।

খেয়েছিলাম তো। পরে নিজেই চেয়ে খেলাম না?

সেটা আপনার ভদ্রতা।

দাঁড়িয়ে কথা ভাল দেখায় না। চলুন।

কোথায়? বারে না রেস্তোরাঁয়?

দুটোর কোনোটাতে নয়।

তবে? আমার এক বন্ধু থাকে ওপরে। তার সুইটে চলুন। যাবেন? আমার খুব ভাল বন্ধু। আপনি কি চিনবেন? জামাল?

জামাল? জামাল শেখ?

না, জামাল চৌধুরী। জামাল শেখ কে বলুন তো?

চিনবেন না। আছেন একজন।

বাবর লিফটের বোতাম টিপল। জ্বলে উঠল একটা তীর। যেন সূক্ষ্ম বিদ্রুপ করে কেউ হাসতে লাগল কোথাও।

মিসেস নাফিস নাভি ভেতরে টেনে চোখ গোল করে বলে উঠলেন, সত্যি সত্যি ওপরে নিয়ে যাচ্ছেন নাকি?

হ্যাঁ।

না, না, ভাল দেখাবে না।

ছোট্ট একটা মেয়ের মত খিন খিন করে উঠলেন মিসেস নাফিস। কথাটা প্রতিবাদ নয়, সিদ্ধান্ত নয়-কিছুই নয়। বলার জন্য বলা। তাই দেখে বাবর হেসে ফেলল।

হাসছেন কেন?

না, কিছু না।

সে মুহূর্তে দরোজা খুলে গেল লিফটের। ভেতরে পা দিলেন মিসেস নাফিসই প্রথমে। বাবর এসে বোতাম চাপ দিল। নয়ের বোতাম।

নাইনথ ফ্লোরে?

হ্যাঁ।

কিছু যদি মনে করেন?

কিছু মনে করবেন না। আপনাকে দেখলে খুশি হবে। আর আমিও খুশি হবো যদি আমার জন্যে আপনার একটি বন্ধু বৃদ্ধি হয়।

তার মানে তার কাঁধে চাপাতে চাইছেন? এই জন্যেই আমরা মেয়েরা বলি, পুরুষ মানুষকে যত শেখাও যত পড়াও ভদ্র হয় না, সভ্য হয় না।

বাবর হঠাৎ বলল, আপনার ছেলের নাম হাসু?

হ্যাঁ, কী হয়েছে?

মিসেস নাফিসকে ভারি উদ্বিগ্ন দেখাল।

না, কিছু না। ভারি মিষ্টি নাম। আমার এক বোন ছিল তার নাম হাসনু।

কই, কোনোদিন বলেননি তো!

কী?

আপনার বোন আছে।

বলিনি। বলার কী আছে? বোন থাকাটা বিশ্বের কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয়। হাসনু তুই যা।

কী বললেন?

শেষ কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে যাবার পর টের পেয়েছে বাবর। এক মুহূর্ত বোকার মত তাকিয়ে রইল সে মিসেস নফিসের দিকে। পরে হেসে ফেলল। বলল, কই কিছু বলিনি তো!

লিফট এসে থামল। দরোজা খুলে গেল, যেন স্বপ্নলোকের দিকে। বাবরের মনে হলো জনশূন্যযানে তারা এখন রয়েছে।

করিডোরে পা রেখে মিসেস নাফিস বললেন, আজ খেয়েছেন?

সুরার কথা বলেছেন? হ্যাঁ, না। অতটা খাইনি।

থমকে দাঁড়াল মিসেস নাফিস। দাঁড়াল বাবর। মিসেস নাফিস জানলেন হাসল বাবর। এক পা পিছুলেন।

বাবর বলল, হাসু! হাসনু!

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিলেন মিসেস নাফিস। খসখসে ভয়ার্তা গলায় উচ্চারণ করলেন, আজ কী হয়েছে আপনার?

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল বাবর।

মিসেস নফিসের মনে হলো এই লোকটিকে এর আগে কোনোদিন দেখেননি। তিনি। আরো দুপা পিছুলেন। তারপর দ্রুত ছুটে গিয়ে লিফটের বোতামে চাপ দিলেন তিনি।

বাবর কিছু বলল না।

বর্ধমানের সেই অন্ধকার। সেই চিৎকার। সেই পোল। তার চারদিকে চক্রের মত ঘুরছে, ফেটে পড়ছে। আচ্ছন্ন হয়ে আসছে তার দৃষ্টি। হঠাৎ সে দেখে মিসেস নাফিস নেই। কখন চলে গেছেন।

তখন ধীর পায়ে ফিরে যেতে লাগল সে, বাবর নিজেও। তার বুকের মধ্যে এক ধরনের কান্না পকিয়ে উঠতে থাকল, যার পরিণামে কোনো শব্দ হয় না, অশ্রু হয়।

বাবর এসে তার বিছানায় শুয়ে বিড়বিড় করে অবিরাম ডাকতে লাগল, হাসু হাসনু, হাসুরে। আর দুহাত শূন্যে তুলে শূন্যতার মধ্যে হাসনুর মুখ নির্মাণ করে আদর করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল।

১১. জাহেদা

আজ সকালে বেশ কুয়াশা পড়েছিল। এখন কুয়াশা নেই, কিন্তু চারদিকে সূর্য ওঠার অনেক আগে যেমন অন্ধকার-অন্ধকার তেমনি করে আছে। শীত করছে। হাতের তোলো মরা মাছের মত মনে হচ্ছে। কী যেন কোথায় হলে তারই অপেক্ষায় মুগ্ধ হয়ে আছে বস্তুপুঞ্জ। দ্যালানগুলো যেন ঝুঁকে পড়েছে সম্মুখে, পথটা উঠে গেছে দূরে, যেমন পাহাড়ে। একটা করে গাড়ির শব্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে সময়কে তোলপাড় করে চলে সাচ্ছে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে। মানুষগুলো পর্যন্ত খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলে হাঁটছে।

তখন জাহেদা এলো। তার স্কুটার ফটক পেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে আবার ঘুরে এসে ভেতরে ঢোকার জন্যে নাক বাড়াল। হাত দিয়ে থামাল জাহেদা। নেমে অত্যন্ত মনোযোগ নিয়ে পয়সা খুঁজতে লাগল ব্যাগে।

আটটা বাজতে আঠার মিনিট বাকি।

বাবর এতক্ষণ বারান্দাতেই দাঁড়িয়েছিল। ফটকে ঢুকেই তাকে দেখেছে জাহেদা। আর বাবরও দেখেছে স্তব্ধ, উদ্বিগ্ন, পাণ্ডুরতাকে। যেন ফাঁসির মঞ্চে যাচ্ছে জাহেদা। পরনেও তার কালো পাজামা, কালো কামিজ, পায়ে কালো ফিতের স্যান্ডেল।

বাবর তার পয়সা দেয়া দেখল বারান্দায় দাঁড়িয়েই। যেন সে ভুলে গেছে চলা, এক মুহূর্তা অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর টিকটিক করে নেমে এসে সামনে দাঁড়াল। হাসল একটু।

জাহেদা জবাবে হাসল না, কথা বলল না, পয়সা গুণে দিল স্কুটারিওলাকে। বাবর তার ছোট সুটকেশটা নিয়ে বারান্দায় গেল। পেছনে পেম্বনে এলো জাহেদা। দরোজা খুলে ধরল বাবর। মাথা নিচু করে জাহেদা দ্রুত ঢুকল, সমুখেই যে আসন পেল তাতে বসে পড়ল। সুটকেশটা রেখে বাবর হাসল আবার।

এবার জাহেদা ছোট একটু হাসল। কিন্তু চোখ উদ্ভাসিত হলো না সে আলোয়। সেখানে তখনো উদ্বেগ আর শঙ্কায় শাসন।

চা খেয়েছ?

জাহেদা মাথা নাড়ল।

নাশতা হয়নি?

তেমনি নিঃশব্দে মাথা নাড়ল জাহেদা। কোনো কথা না বলে, শুধু গভীর চোখে জাহেদার চোখ একবার বিদ্ধ করে বাবর তখন ভেতরে গেল। জাহেদার জন্য নাশতা সে বানিয়েই

রেখেছিল। ভেতরে এসে একবার দেখে নিল সব ঠিক আছে কি-না। মান্নানকে গরম দুধ দিতে বলল। চায়ের জন্যে পানি বসাল বাবর। তারপর বাইরে এসে বলল, এসো।

জাহেদা প্রশ্নের চোখে তাকাল।

নাশতা করবে।

নীরবে জাহেদা তাকে অনুসরণ করল। এসে ডাইনিং টেবিলে বসল। তার বিপরীতে, দূরে বসল বাবর। জাহেদা এক চামচ কর্নফ্লেকস খেল, এক টুকরো রুটি মুখে দিল, ওমলেটের একটা কোণ ভাঙ্গল। একটা ছোট চুমু দিল বাবরের বানিয়ে দেয়া চায়ে।

বাবরের একবার মনে হলো বলে, এত কম খাচ্ছে কেন?–কিন্তু বলতে পারল না। কেমন যেন একটা সম্মোহন তাকেও পেয়ে বসেছে। জাহেদাকে একই সঙ্গে চেনা এবং অচেনা মনে হচ্ছে তার। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে তাকিয়ে রইল ঐ কালো কামিজের ওপর জীবন্ত গম্ভীর কোমল মুখখানার দিকে।

জাহেদা একবার চোখ তুলে তাকাল তার দিকে। পরীক্ষণে চোখ নামিয়ে রুটি ছিড়ল একটু। কিন্তু সেটা মুখে দিল না। আবার তাকাল বাবরের দিকে।

বাবর বলল, টেলিগ্রামটা কখন পৌঁছেছিল?

বিকেল। পাঁচটায়।

অসুবিধে হয়নি তো?

জাহেদা মাথা নাড়ল নীরবে।

সুপার কী বললেন?

কিছু না।

কদিনের ছুটি পেলে?

কিছু বলিনি।

জাহেদা মনোযোগের সঙ্গে চা খেতে লাগল। বাবর তাকে জিগ্যেস করল, তোমার খারাপ লাগছে?

জাহেদা প্রথমে মাথা নাড়ল। তারপর সেটা যথেষ্ট মনে না করে মুখে ছোট্ট করে বলল, না। তারপর চোখ তুলে সে হঠাৎ প্রশ্ন করল, আর কেউ আসেনি?

কে আসবে?

আর কেউ?

তখন বাবর বুঝল জাহেদার কথাটা। জাহেদা মনে করেছে আরো দুএকজন যাচ্ছে তাদের সঙ্গে। বাবর ভাবল একটা কিছু বানিয়ে বলে, পরমুহূর্তেই সামলে নিল নিজেকে। এমন কিছু সময় আসে যখন সত্যি বলা অনেক ভাল।

সে বলল, আর কেউ আসার কথা নেই। তুমি তাই মনে করেছিলে নাকি?

জাহেদা-চায়ের কাপ ধরে চুপ করে রইল।

তুমি আর আমিই যাচ্ছি। ভেবেছিলাম একাই যাব। প্রত্যেক বছর এই রকম দুচারদিন ঘুরতে বেরোই। এবার তোমার কথা মনে পড়ল। এই দ্যাখ আটটা পাঁচ বাজে। এক্ষুণি না বেরুলে আরিচার ফেরি পাব না। ওঠ।

বলে সে নিজে ওঠে দাঁড়াল। জাহেদার উঠতে একপলক দেরি হলো। সেই পলকটিকে অনন্ত বলে মনে হলো বাবরের। জাহেদা উঠে দাঁড়াতেই বাবর স্নিগ্ধ হেসে বলল, তুমি গাড়িতে গিয়ে বস।

জাহেদা ইতস্তত করতে লাগল।

কী হলো?

আপনি যান, আমি আসছি।

ও, আচ্ছা।

বাবর বাইরে বেরিয়ে মান্নানকে সব বুঝিয়ে দিল। হুঁশিয়ার করে দিল, বাসা ছেড়ে এক পাও যেন না নড়ে। টাকা দিল কয়েকটা। তখন বাথরুম থেকে জাহেদা বেরিয়ে এলো। বাবর যেন তা বুঝেনি এমনি নির্বিকার মুখে বলল, গাড়িতে যাও। বলে সে দিবোজা বন্ধ করে চাবি দিয়ে জাহেদার পাশে বসে সুটকেশটা পেছনের সিটে ফেলে দিয়ে এঞ্জিন স্টার্ট করল। খুব সন্তর্পণে ফটক দিয়ে বেরিয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে পড়ল বড় রাস্তায়। বলল, তোমার চশমা নেই?

আছে।

পরে নাও।

অতি বাধ্য ছাত্রীর মত ব্যাগ খুলে কালো চশমা পরে নিল জাহেদা।

গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিল বাবর। গতি বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের মাতামাতিতে জাহেদার গা থেকে মিষ্টি সৌরভ এসে নাকে লাগল বাবরের। সে আপন মনেই হাসল।

পার হয়ে গেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল। তারপর বুড়ো গাছের ছায়া। আরে, রোদ উঠেছে? ডাইনে মাঠ, বায়ে জলা, কয়েকটা বাড়ির পুঞ্জ। পুল, মীরপুরের বাজার। মীরপুর পুলের কাছে গিয়ে পেল লালবাতি। উল্টো দিক থেকে গাড়ি আসছে এখন। বাবর একটা সিগারেট ধরাল।

কিছু বলছ না।

কই, না।

বলে জাহেদা একটু নড়েচড়ে বসল। যা চোখে পড়ল বলল, এখানে এত বালি কেন?

নৌকো করে এনে ফেলেছে যে! বাড়ি তৈরিতে লাগে। দেখছি না। ট্রাক বোঝাই শহরে যাচ্ছে।

ও।

জাহেদা চোখ নিচু করল। বাবর লক্ষ করল আশেপাশে লোকেরা খুব উৎসাহ নিয়ে সরস চোখে জাহেদাকে দেখছে। একজন সমস্ত কটা দাঁত বের করে হাসছে। পকেটে নীল চিরুনি।

লাল বাতিটা সবুজ হলো! ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে পার হলো পুলটা। তারপর ঢালুতে নেমেই বাড়িয়ে দিল গতিবেগ। এবার বাতাস আরো দাপাদাপি করে উঠল। সুবাসে, চুলে, বাতাসের হিম স্পর্শে বাস্তব যেন স্বপ্নে রূপান্তরিত হল। দুপাশে খেত, মাঠ, বাড়ি, জলা, নৌকো, রোদ দ্রুত সরে যাচ্ছে পেছনে। টায়ার থেকে শন শন শব্দ উঠেছে একটা। আর কিছু না। আর কোনো ধ্বনি নয়। গাড়ির ভেতরটা জাহেদার উপস্থিতিতে, রোদের আদরে, উষ্ণ হয়ে উঠেছে।

চুপ করে আছ!

এমনি।

মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে যেতে লাগল ওরা। পার হলো কর্ণ নদীর পুল। নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বাবর বলল, তুমি গাড়ি চালাতে পার?

না।

শিখবে?

জাহেদা ম্লান একটু হাসল।

আমি শেখাতে পারি। শিখে নিও। কেমন?

আচ্ছা।

আবার নেমে এলো সেই বিদ্যুৎপৃষ্ট নীরবতা। বাবর জানে, এখন জাহেদা আর ফিরতে পারবে না। এখন সে ঘটনার হাতে। কিন্তু কোথায় যেন মায়া করতে লাগল তার ওকে ওমান চুপচাপ দেখে। অনেকক্ষণ সেই মায়াটাকে বাড়তে দিয়ে আবার সে বলল, কিছু ভাবছ?

নাহ।

কাল রাতে ঘুম হয়েছিল?

হ্যাঁ।

তোমার ঘরে তুমি একা থাক?

না, আরো দুজন আছে। পাপ্পু আর শরমিন।

তখন নাশতা খেলে না?

খেয়েছি তো।

পাপ্পু কী পড়ে?

আমার সাথে।

শরমিন?

আমার এক ক্লাশ ওপরে।

আচ্ছা, ইকনমিক্স তোমার শক্ত লাগে না।

জাহেদা জবাবে একটু হাসল।

বাবর বলল ইকনমিক্স খুব ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট। ওটা সবার পড়া দরকার। মানুষের যা কিছু কাজ, যা কিছু সে বিশ্বাস করে, যা কিছু তার অর্জন, উপলব্ধি-তার পিছনে ইকনমিক্স যে কীভাবে কাজ করে তা তোমাকে বললে অবাক হয়ে যাবে।

জাহেদ হাসল আবার। কিন্তু কোনো কথা বলল না।

বাবর বলল, চুয়িংগাম খাবে? এই নাও।

ড্যাশবোর্ড থেকে বার করে দিল বাবর। বার করতে গিয়ে কাঁধ ছোঁয়াছুয়ি হয়ে গেল। জাহেদা তার বায়ে সরে গেল অনেকখানি।

বাবর একটু হাসল।

খাও, খুব ভাল গাম।

এখন থাক।

সাভার ডেইরী ফার্ম পার হয়ে গেল তারা।

বাবর বলল এরপরে ছোট্ট একটা শালবন আছে। খুব সুন্দর।

কিছুক্ষণ পর শালবনের ভেতর এসে পড়ল তারা; দুধারে সারি সারি গাছ। পথটা একটু উঁচু হয়ে গেছে। লালমাটি। এই একটা নিচু জলা এলো। এই আবার শালবন। একঝাক পাখি ভারি মাতামাতি করছে।

বাবর জিজ্ঞেস করল, ভাল না?

হুঁ।

একদিন তোমাকে রাজেন্দ্রপুর নিয়ে যাব।

জাহেদা চুয়িংগাম মুখ থেকে বের করে সযত্নে কাগজে মোড়াতে লাগল; একটা বল বানাল ছোট্ট। তারপর জানোলা দিয়ে ছুঁড়ে দিল। চুপচাপ গাড়ি চালাতে লাগল বাবর।

দূরে হাতের ডাইনে, ঘোড়াপীরের মাজার।

বাবর বলল, এখানে একটা মাজার আছে জান? একটা বুড়ো বটগাছ আছে। তার ডালে অসংখ্য সব লাল কাপড়ের টুকরো বাধা।

কেন?

যাদের ছেলে হয় না, তারা মানত করে, কাপড় বেঁধে দিয়ে যায়। হাজার হাজার। সবুজ পাতা আর লাল কাপড়ের টুকরোয় ভারি সুন্দর লাগে। ছবির মত। আমাদের যে কত অন্ধ বিশ্বাস, কত কুসংস্কার। একদিন নিয়ে যাব তোমাকে।

জাহেদা মুখ নিচু করল।

বাবার বলল, তোমার যখন বিয়ে হবে, আমি বলে দিচ্ছি, প্রথমে মেয়ে হবে তোমার। আমি মেয়ে খুব পছন্দ করি। অথচ লোকে কী মন খারাপ করে মেয়ে হলে। লোক দেখান হাসে বটে। কিন্তু ভেতরে নিজেকে খুব ছোট মনে করে। এক সময় তো মেয়ে

হলে গলা টিপেই মারত। আমার এক বন্ধুর কথা বলি। তার সঙ্গে তাদের দেশের বাড়িতে গিয়েছিলাম। দেখি একটা গোল কবর। অবাক কাণ্ড। জিজ্ঞেস করলাম, কার? আমার দাদির?

কবরটা গোল কেন?

আমিও তাই জিগ্যেস করলাম। শুনলাম। ওখানে একটা ইঁদারা ছিল আগে। ওর দাদির তখন অল্প বয়স। কেবল এক ছেলের মা হয়েছে। সেই সময় বাড়িতে কীসের জন্যে যেন কাওয়ালীর আসর হয়েছিল। দাদি ভেতর বাড়ি থেকে চিক তুলে লুকিয়ে তা দেখছিল। সেই কথা জানতে পেরে আমার বন্ধুর দাদা বৌকে সেই রাতেই গোসল করিয়ে, নতুন কাপড় পরিয়ে, ঐ ইদারায় ফেলে দেয়। তারপর সিমেন্ট করে দেয় মুখটা। পরে আমার বন্ধুর বাবা সেখানে একটা মার্বেল পাথরে নাম লিখে দিয়েছেন। বুঝে দেখ, ঐ টুকুন অপরাধ।

সত্যি?

হ্যাঁ আমি নিজে দেখে এসেছি কবরটা। তোমার মন খারাপ করে দিলাম?

জাহেদা কোনো জবাব দিল না। ঠোঁট কামড়ে ধরে বসে রইল সে সমুখের দিকে চেয়ে। দূরে নয়ারহাটে অর্ধসমাপ্ত পুল। তীরের মত ক্রমাগত কাছে আসছে।

গাড়ি থামিয়ে ফেরির টিকিট কিনে ফিরে এলো বাবর। ঢালু বয়ে সন্তর্পণে নামল ঘাটে। ফেরি দাঁড়ানই ছিল। খালাসিরা হাত ইশারা করে ডাকতে লাগল বাবরকে। বাবর বলল, কপাল ভাল সঙ্গে সঙ্গে ফেরি পেলাম। এই রকম সব কটা পেলে চারটের মধ্যে রংপুর পৌঁছে যাব।

রংপুরে থাকব?

হ্যাঁ আজ রাতে। কাল আবার বেরুবা। কাল দিনাজপুরে। পচাগড় পর্যন্ত যাব। ফেরার পথে বগুড়া। বগুড়ার উপর দিয়েই যাব, কিন্তু আজ থামব না।

আগে থেকেই ইপিআরটিসির একটা কোচ দাঁড়িয়েছিল ফেরিতে। বাবরের গাড়ি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল। কলকল জল সরিয়ে ওপারে যেতে লাগল ফেরিটা। জাহেদা অবাক হয়ে দেখতে লাগল দুটো নৌকা এক সঙ্গে বেঁধে কেমন পারাপারের ব্যবস্থা হয়েছে।

বাবর বলল, এতক্ষণে সত্যি সত্যি ঢাকা ছেড়ে চললাম।

গাড়ির সঙ্গে গা ঠেকিয়ে জাহেদা দাঁড়িয়ে রইল। নদীর প্রফুল্ল বাতাসে তার চুল মিহি ঝাউয়ের মত মুখে উড়তে লাগল। ভারি চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। যেন জীবনমৃত্যুর চিন্তা করছে জাহেদা।

কী ভাবছ?

কিছু না।

জাহেদা এবার সকালে এই প্রথম নির্মল হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভারি অবাক লাগল। বাবরের। এতক্ষণ এই নির্মলতাই সে প্রার্থনা করছিল, কতবার কতভাবে কথা বলতে চেয়েছিল সে জাহেদাকে, আর এখন কী এমন হলো, কী এমন কথা তার ঐ ছোট্ট মাথায় পাখির মত বসল যে আমন সুন্দর হয়ে উঠল তার মুখ? বাবর কিছু বুঝতে পারল না, কিন্তু প্রত্যুত্তরে সেও প্রশস্ত হাসিতে নিজেকে সুন্দর করার চেষ্টা করল নদীর ওপর ভাসতে ভাসতে।

ওটা কী লেখা?

জাহেদা খালাসিদের বুকে আঁটা পেতলের তকমার দিকে চোখ ইশারা করল।

তুমি তো বাংলা পড়তে জান না। ওখানে লেখা জনপথ। মানে, হাইওয়ে বলতে পার। তোমাকে বাংলা শেখাব আমি।

জানেন, খুব অসুবিধা হয়। আজকাল একটু একটু বুঝতে পারি। জাহেদা হঠাৎ মুখ তুলে বাবরকে বলল, বাবা আমাকে ইংরেজি মিডিয়ামে পড়িয়েছেন। মা জানেন না ইংরেজি। তাকে চিঠি লিখতে পারি না। লিখলে ইংরেজিতে লিখতে হয়।

তোমার বাবা সেটা পড়ে দেন মাকে?

হ্যাঁ। কিন্তু সব সময় তো সব কথা বাবাকে জানিয়ে লেখা যায় না।

তা ঠিক। এই দ্যাখ না-বাবর একটু কাছে এলো জাহেদার। বলল, তোমার সঙ্গে এতক্ষণ ইংরেজিতে কথা বলেছি, একেক সময় মনে হয়, যদি তুমি বাংলা বুঝতে।

বুঝি তো। আপনি বাংলাতেই বলবেন। জাহেদা এই প্রথম বাংলায় বলল আজ সকালে।

বলতে পারি। কিন্তু সব কথা, বাংলা সব কথা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না বলে ভয় হয়। কথার একটা অর্থ, সাধারণ অর্থ, সেটা বোঝা যায়, আরেকটা অর্থ দেশের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে, বাতাসের সঙ্গে, মানুষের মনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। রক্তের মধ্যে থাকে সেই অর্থটা। সেটা বুঝতে হলে তোমাকে ছেলেবেলা থেকে বাংলা পড়তে হতো। এই যেমন ধর–শ্রাবণ। শ্রাবণ কী জান?

জাহেদা হেসে বলল, জানব না কেন? শ্রাবণ একটা বাংলা মাসের নাম।

শুধু তাই নয়। যদি বাংলা কবিতা পড়তে, বাংলা গান শুনতে, যদি বাংলা তোমার স্মৃতির মধ্যে থাকত তাহলে শ্রাবণ কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বপ্নের জগৎ খুলে যেত।

তোমার চোখে। একটা গম্ভীর গান শুনতে পেতে। একটা আকুলতায় তোমার মন হু হু করে উঠত।

আপনি আমাকে শেখাবেন?

কেন শেখাব না? তোমার জন্য আমি সব করতে পারি।

জাহেদা হঠাৎ জিগ্যেস করল, আর কা‌েটা ফেরি আছে?

এরপর একটা। তারপর বড় ফেরি আরিচা থেকে নগরবাড়ি। তারপর আর একটাই মোটে।

আরো তিনটে! জাহেদা মুখ গোল করে বলল।

ওপারে এসে গাড়িতে ঠিকঠাক হয়ে বসে বাবর বলল, তুমি কিছু বল, আমি শুনি। আমি কী বলব?

বলার কথা কত আছে। তোমার কথা বল।

আমার কোনো কথা নেই।

তবু।

ভাবছি, একটা কথা ভাবছিলাম।

কী কথা।

আমি, আমি এখানে কী করছি?

আমার সঙ্গে আছ। কথা বলছ। আমি গাড়ি চালাচ্ছি। আমরা এখন মানিকগঞ্জে আছি। এই।

আমার বিশ্বাস হয় না। মনে হয় কোথায় যেন আছি, জানি না।

বাবর বলল, তুমি আছ অতীত ভবিষ্যতের মাঝখানে, আগেও যেখানে ছিলে, পরেও সেখানে থাকবে।

বাবর শুধু বলল না-কথাটা তার নিজের নয়। নীরবে সে দেখতে লাগল দূরে দ্রুত কাছে আসা বাড়ি, গ্রাম, মানুষ, নৌকো, মুদি দোকান আসছে, সরে যাচ্ছে, আবার সরে যাচ্ছে। এক আধটা বাস ট্রাক সরাৎ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। চকিত ঝড় তুলে।

বাবর বলল কিছু বল।

জাহেদ চুপ করে রইল।

বাবর তখন বলল, গল্প শুনবে?

কী গল্প? আপনার?

আমি কি গল্প লিখি নাকি? এই এদিকে যা পড়েছি। একটা মজার গল্প বলি কেমন? একটা চুটকি। এক লন্ড্রীর দোকান। লন্ড্রীওয়ালা ছোকরা মানুষ। মেয়েদের দিকে ভারি চোখ তার। বসে আছে কাউন্টারে। এমন সময় এক তরুণী এলো খুট খুট করে। পরনে তার মিনিস্কার্ট। মিনি তো মিনি-যাকে বলে মিনি, কোমরের তলায় এসেই শেষ। ছোঁকরা হা করে তাকিয়ে আছে দেখে তরুণী বলল, ভারি বেয়াদব তো আপনি। ছোঁকরা একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে উত্তর দিল, বেয়াদব নয় ম্যাডাম। ভাবছিলাম। আমাদের লন্ড্রীতে কাপড় ধুলে তো এত খেপে যাবার কথা নয়। বোধহয় পাশের লন্ড্রী থেকে ধুয়েছিলেন?

হা হা করে হেসে উঠল বাবর।

জাহেদা বলল, যাঃ। এটা আবার গল্প নাকি?

আচ্ছা আরেকটা শোন। এক পাগল। রাস্তায় এক দেয়ালে কান লাগিয়ে কী যেন শুনছে। দূর থেকে গোফওয়ালা এক পুলিশ দেখে ভাবল ব্যাপারটা কী? ব্যাটা আধা ঘণ্টা ধরে

কান লাগিয়ে শুনছেটা কী? সেও এসে পাগলের পাশে কান লাগিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু কিছু শুনতে পেল না। অনেকক্ষণ কান লাগিয়ে রাখল, তবু কিছু শোনা গেল না। তখন মহা খাপ্পা হয়ে পুলিশটা বলল, এই ব্যাটা, এখানে তো কিছু শোনা যাচ্ছে না। পাগল তার জবাবে একগাল হেসে বলল, জি, আমিও কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

জাহেদা খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, যা এ রকম হয় নাকি?

আরো শুনবে।

জাহেদা হাসতে হাসতে আরেকটা চুয়িংগাম বের করে মুখে পুরল। তার গোলাপি জিভ টুকু বেরিয়েই ভেতরে চলে গেল। মুগ্ধ হয়ে গেল বাবর। বলল, আরেকটা খাও।

এক সঙ্গে কটা খাব?

ঠিক বলেছ।

কথাটাতে বেশ একটু ওজন আরোপ করল বাবর। জাহেদা লক্ষ করে রাঙ্গা হয়ে গেল যেন।

বাবর জানে এখন কথা বলতে নেই। সে নীরবে গাড়ি চালাতে লাগল। মানিকগঞ্জের সাইনবোর্ড তাদের অভ্যর্থনা জানাল এবং কিছু পরে বিদায়।

জাহেদা বলল, কই, আরেকটা গল্প বলবেন যে!

ভাবছি, কোনটা বলব?

খুব সুন্দর দেখে একটা।

আচ্ছা

বাবর সত্যি মনে করতে পারছিল না কোন গল্প। মনের মধ্যে হাতড়াতে লাগল সে। একটা সিগারেট ধরাল। তারপর হঠাৎ একটা মনে পড়ে গেল। এই গল্পটা একটু বড়। হাসির নয় কিন্তু। আবার হাসিরও।

তা হোক।

এক দেশে ছিল এক চাষী। তার ছিল এক মেয়ে।

এতে রূপকথা।

কেন, খুব বয়স হয়ে গেছে নাকি তোমার?

হয়েছেই তো।

তোমার মা রূপকথা বলতো?

না বাবা বলতেন, বাংলাতে শুনলে নাকি আমার ইংরেজি খারাপ হয়ে যাবে।

শোননি রূপকথা?

কনভেন্টে কত শুনেছি। সিন্ডারেলা, আলাদিন এন্ড ওয়ান্ডার ল্যাম্প, সেভেন ডোয়াফর্স।

আজ একটা শোন। একটা শুনলে বুঝবে বড়দের জন্যেও রূপকথা হয়। জাহেদা নড়েচড়ে গ্যাঁট হয়ে বসল, যেন বসার ভঙ্গিতে প্রমাণ করতে চেষ্টা করল, সে খুঁকি নয়, রীতিমত মহিলা।

বাবর বলতে শুরু করল এক দেশে ছিল এক চাষী, তার ছিল এক মেয়ে। একদিন সে রাজাকে বলল, তার মেয়ে খড় থেকে সোনা বানাতে পারে। বুঝে দেখ, যেন রাজার সঙ্গে তার রোজই দেখা হচ্ছে, এমনি একটা ভাব।

রূপকথায় ওরকম হয়।

শুধু তাই নয়, চাষীর কথাটাও মিথ্যে। বাহাদুরি দেখাবার জন্যে রাজাকে বলেছে তার মেয়ে সোনা বানাতে পারে। মেয়েকে খুব ভালবাসত কিনা? এখন বিপদ দ্যাখ, রাজা চাষীর মেয়েকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে বলল, এখানে এক গাদা খড় রইল, যদি কাল ভোরের মধ্যে সব সোনা বানিয়ে দিতে না পার, তাহলে গর্দান যাবে। এই বলে রাজা চলে গেলেন তার প্রাসাদে। কী রকম গর্দভ দেখ রাজা ভদ্রলোকটি। প্রথম কথা একবারও তার মনে হলো না, এই মেয়ে যদি সোনাই বানাতে পারবে তা হলে তার বাপের এত গরীবী হাল কেন? দুই নম্বর, আমি রাজা হলে তো সেই ঘরে গদীনসীন হয়ে বসে দেখতাম কেমন করে খড়কে সোনা বানায়। রূপকথার রাজাদের কোনো কৌতূহল নেই।

আপনার টিপ্পনি রাখুন।

আরে, টিপ্পনি না কাটলে তো এটা বাচ্চাদের গল্প হয়ে যাবে। তুমি আর বাচ্চা নও।

গল্প বলুন।

বলছি।

বাবর একটা ট্রাক পেরিয়ে নিশ্চিন্তে গাড়ি চালাতে চালাতে বলতে লাগল, সারারাত সেই খড়ের গাদার ওপর বসে হোত পা ছড়িয়ে কাঁদল মেয়েটা। সে তো আর সত্যি সোনা বানাতে জানে না। এখন কে তাকে উদ্ধার করবে। এই বিপদ থেকে? এমন সময়ে

ঘরের মধ্যে টুক করে লাফিয়ে পড়ল দেড়হাত লম্বা একটা মানুষ। লোকটা সব শুনে টুনে বলল, ঠিক আছে এই খড় সব সোনা বানিয়ে দিচ্ছি, বদলে তুমি আমাকে কী দেবে? চাষীর মেয়ে বলল, আমার গলার এই হারটা দেব। লোকটা সোনা বানিয়ে হারটা নিয়ে চলে গেল। পরের দিন রাজা তাকে আরো একটা বড় ঘরে আরো বেশি খড় দিয়ে বলল, এগুলোও সোনা বানিয়ে দাও। মেয়েটা সারারাত কাঁদল, আবার সেই দেড় হাত মানুষটা এলো। মেয়েটা এবার তাকে হাতের আংটিটা খুলে দিল। পরদিন ঘর ভর্তি সোনা দেখে রাজা মহাখুশি। আরেকটা ঘর ভর্তি খড়কে যদি তুমি সোনা বানিয়ে দিতে পার তাহলে তোমাকে আমি আমার রাণী বানাব, আর যদি না পার তাহলে গর্দান যাবে। রূপকথার শাস্তি শুরুই হয় গর্দান নেয়া থেকে। তাই না?

জাহেদা হাসল। ভাগ্যিস তখন জন্মাইনি।

বাবর বলে চলল, সেদিন রাতেও মেয়েটা কাঁদতে বসল। এলো সেই দেড় হাতি মানুষটা। তাকে বলল সব।

তারার ঘাটে ফেরি পাওয়া গেল না। ফেরি তখন ওপারে। জাহেদা জিগ্যেস করল, কতক্ষণ লাগবে?

এই এক্ষুণি এসে যাবে। তারপর শোন, লোকটা বলল আমি সব সোনা করে দিচ্ছি। কিন্তু আজ তুমি আমাকে কী দেবে? মেয়েটা বলল, আর যে কিছু নেই আমার।

জাহেদা বলল, চাষীর মেয়ে হার আর আংটিই বা পেয়েছিল কোত্থেকে?

রূপকথার চাষীর মেয়েদের ওরকম থাকে। এবার কিন্তু তুমি টিপ্পনি কাটছ।

সঙ্গদোষে।

হেসে উঠল বাবর। বলল লোকটা তখন একটা জিনিস চাইল।

কী?

না, তাকে নয়।

যাহ।

সে চাইল, তুমি যখন রাণী হবে, তারপর যখন ছেলে হবে, সেই ছেলে দিতে হবে। রাজি হয়ে গেল মেয়েটা। ভেবে দেখ, জ্বলজ্যান্ত নিজের ছেলেকে দিতে রাজি হয়ে গেল সে। একেই বলে স্ত্রী বুদ্ধি।

কী বললেন?

কিছু না। তারপর মেয়েটার তো বিয়ে হলো? এক বছর গেল। সত্যি একটা ছেলে হল মেয়েটার। একদিন দোলনায় তাকে ঘুম পাড়াচ্ছে এমন সময় সেই দেড় হাতি লোকটা এসে হাজির। বলে, ছেলে দাও।

তারপর? মেয়েটি কেঁদে বলল, তোমাকে টাকা পয়সা হীরে জহরৎ যা চাও তাই দেব, তুমি শুধু আমার ছেলেকে নিও না। কী বুদ্ধি! যে লোকটা খড়কে সোনা বানাতে পারে তাকে কি-না সে সাধছে টাকা পয়সা।

গল্পে ওরকম হয়। তারপর?

লোকটা তার কান্না শুনে একটু নরম হলো। বলল, ঠিক আছে, তোমার ছেলে নেব না এক শর্তে, যদি তুমি আমার নাম বলতে পার। তিন বারের মধ্যে বলতে হবে। বলতে না পারলে ছেলে চাই। মেয়েটি বলল। আচ্ছা। তারপর সে চারদিকে চর পাঠাল–দেড় হাত একটা লোক, যাদু জানে, তার নাম কেউ বলতে পারে? সাত দিন সাত রাত পরে চর এসে জানাল, হ্যাঁ মহারাণী নাম জানা গেছে।

কী নাম? জাহেদা জিগ্যেস করল।

বাবর বলল, ফেরি এসে গেছে। আগে ফেরিতে উঠেনি।

ফেরিতে উঠে গাড়ি থেকে বেরুল ওরা। ফেরির পেছন দিকে একটা রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল বাবর। তার পাশে জাহেদা। জাহেদার কালো ছায়া পড়েছে পানিতে। ঢেউয়ের দুষ্টুমিতে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। বাবর একটু সামনে ঝুঁকিল। এবার তার ছায়াটা স্পর্শ করল। জাহেদার ছায়া। প্রীতি চোখে তাকিয়ে রইল সেদিকে বাবর। তারপর চোখ ফিরিয়ে দেখতে পেল বাতাসে পাজামা কামিজ সেঁটে গেছে জাহেদার ঊরুতে। একটা গভীর Y-এর সৃষ্টি হয়েছে। নিটোল দুটি ঊরু, স্বাস্থ্যে ফেটে পড়ছে যেন। মনে মনে বাবর সেখানে মুখ রাখল। বেড়ালের মত ঘষল খানিক।

জাহেদা বলল, গল্পটা কী হলো?

তখন চমক ভাঙ্গল বাবরের। সে জাহেদার দিকে তাকিয়ে হাসল!

ওপারে গিয়ে বলব। এখন একটু নদী দেখি।

জাহেদা নদীর দিকে তাকিয়েই দেখতে পেল তার ছায়া বাবরের ছায়া ছোঁয়াছোঁয়ি হয়ে আছে। তারপর আকাশের দিকে চোখ রাখল। চিবুকের তলায় লাল কয়েকটা সূক্ষ্ম শিরা তখন দেখতে পেল বাবর। রোদুরে যেন স্বচ্ছ হয়ে গেছে তার গ্রীবা। একটু নিরিখ করলে যেন ভেতরে সব কিছু দেখা যাবে।

চুল উড়ছিল খুব। জাহেদা গাড়ির ভেতর থেকে একটা রুমাল নিয়ে এলো। মুঠি করে বাঁধল চুলগুলো। টানটান হয়ে চুল বিছিয়ে রইল কপালের দুপাশে; তখন নতুন মনে হলো জাহেদাকে। একেবারে অন্য চেহারা।

বান্দর বলল কালো কামিজে তোমাকে মানায়নি।

খুব মানিয়েছে।

সকালে ভালই লাগছিল। এখন ততটা না। তোমাকে নীলটা মানায়।

আছে সুটকেশে।

তাই নাকি? পরশু তো চিনতেই পারলে না যখন বললাম।

হোস্টেলে গিয়ে খুঁজে বের করেছি।

তোমাদের হোস্টেল সুপার কিছু সন্দেহ করেনি তো?

কেন?

যদি ধরা পড়তে।

বাবা আমাকে আস্ত রাখত না।

ধর, আমি যদি তোমাকে চুরি করি।

ইস, আমাকে চুরি করা সোজা নয় সাহেব।

চলে এলে বিশ্বাস করে?

এসেছি তো?

মুখে বলল বটে কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখে জাহেদা নতুন করে বাবরের দিকে তাকাল। আবিষ্কার করতে চেষ্টা করল কিছু। বাবর তখন হেসে বলল, গল্পটা শোন। আটদিনের দিন সেই দেড়হাতি লোকটা এসে হাজির। বল, আমার নাম বল। তিন বারের মধ্যে বলতে হবে। মেয়েটি জানে তার নাম, তবু স্বভাব তো, মেয়েলিপনা করে বলল, তোমার নাম গিরিশৃঙ্গ। উহুঁ হলো না। তাহলে, উড্ডটবর্তুল? না তাও নয়। তোমার নাম দেড় আংলা। তখন লোকটা বলল, হাঁ হয়েছে কিন্তু ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল তার, সে দাঁড়াম করে পড়ে মরে গেল।

সে-কী!

হ্যাঁ।

লোকটা বোধহয় ওকে ভালবেসেছিল।

সে তোমরা বলতে পারবে; তারপর শোন। আগে নামি।

বাবর জাহেদার হাত ধরে গাড়িতে নিয়ে এলো। গাড়ি যতক্ষণ না ফেরি থেকে রাস্তায় এলো ততক্ষণ কোনো কথা বলল না। তারপর সড়কে পড়তেই গতি বাড়িয়ে বলতে শুরু করল সে, একদিন রাজা বলল, রাণী, আজকাল তুমি আর সোনা বানাও না যে। তখন মেয়েটি বলর, সোনা তো আমি বানাতাম না, বানাত একটা দেড় হাতি লোক। বলে সব ঘটনা রাজাকে জানাল সে। রাজা তো রেগে কাঁই। রাণীর মুঠি ধরে জিগ্যেস করল, তার মানে তুমি বলতে চাও একটা অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে পরপর তিন রাত তুমি কাটিয়েছ। তোমার ছেলেকে এক বছর পরে এসে সে চেয়েছে। তারপরও তুমি বলতে চাও এ ছেলে তার নয়, আমার? আমাকে বুদ্ধ, গাধা, গোবর-গণেশ পেয়েছ?

ওমা, সে-কী কথা।

মহারাণী, এই হচ্ছে রূপকথা। বল তো ছেলেটা আসলে কার?

কী যে বলেন।

বল না? তিন রাত লোকটা মেয়েটার ঘরে এসেছে। কিছু হয়নি? শুধু হার আংটি নিয়েই খুশি থেকেছে সে?

দেখুন, দেখুন, সামনে একটা কত বড় পুল। জাহেদা অন্য কথা বলল। তোমার কী মনে হয়ে বল না?

এর পরে তো আরিচা?

হ্যা; আমার কী মনে হয় জান, রাজা আসলে অতটা গর্ধভ নয়। ও ছেলেটা ঐ ব্যাটা দেড় আংলারই।

জাহেদা মনোযোগের সঙ্গে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগল। বাবর মনে মনে বলল, তুমিও আমার সঙ্গে তিন দিনের জন্যেই যাচ্ছ। কল্পনায় সে স্পষ্ট দেখতে পেল নিজেকে– জাহেদার ওপর শুয়ে দম বন্ধ করা চুমোয় বেঁধে রেখেছে তাকে। মুখের ভিতরটা সরসর করে উঠল। বাবরের। মাথার ভেতরে কেমন একটা ঝিম সৃষ্টি হল যেন। ঠোঁটে একটা অর্থহীন হাসি। সে গাড়ি চালাতে লাগল।

ছোট্ট একটা হাই তুলল জাহেদা। বাবর ভাবল, এরপর বোধহয় কিছু বলবে। কিন্তু বলল না। মাইলের পর মাইল পার হয়ে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ পর বাবর বলল, কিছু বলছি না।

এমনি।

তবু কিছু বল।

কী বলব?

কেন, নিজের কথা।

আমার কোনো কথা নেই। বলেই একটুখানি হাসল জাহেদা।

হাসছ যে।

আপনার কথা শুনে মনে পড়ল, ইস্কুলে রচনা লিখতে দিত, একটি পয়সার আত্মজীবনী, একটি ছাতার আত্মজীবনী, একটি পেন্সিলের আত্মজীবনী–এইসব।

সেই রকম করেই না হয় বল। আমি একজন মেয়ে। আমার একটি নাক, দুইটি কান ও দুইটি চোখ আছে। চোখ দিয়ে আমি দেখিয়া থাকি। কান দিয়া শ্রবণ করি।

চাপা হাসিতে প্রায় উপুড় হয়ে পড়ল জাহেদা। তার পিঠে আলতো একটা চাপড় দিয়ে বাবর বলল, খারাপ বলেছি?

বাবর জানে এইভাবে এগুতে হয়। এখন একটি চাপড় দিলেও জাহেদা কিছু মনে করবে: না। সত্যি জাহেদা সেটা লক্ষও করল না। হাসতে হাসতে মাথা তুলে বলল, আপনার সঙ্গে কথায় পারা মুশকিল। সত্যি আমার কিছু বলার নেই।

ভুল। সবারই বলার কথা আছে। তুমি আমাকে বলতে চাও না।

বিশ্বাস করুন।

হ্যাঁ, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি।

বিশ্বাস না কচু। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করল বাবরের। দু পয়সা দাম দিই না। আমি যা চাই তা এমনি তোমার পাজামা ছিঁড়ে ভেতরে যেতে। কী ক্লান্তিকর এই অভিনয়, এই সহাস্য মুখ তৈরি করা, এই কথার মালা গাঁথা। আমি যদি হঠাৎ এখন তোমাকে জড়িয়ে ধরে মুখে রুমাল গুঁজে ধর্ষণ করি? কে বাধা দেবে?

কিন্তু সে হাসল। এবং আরেক বার বলল, তোমাকে বিশ্বাস করি। কণ্ঠ যথাসম্ভব ভিজিয়ে নির্বিকার চিত্তে সে দ্বিতীয় মিথ্যে যোগ করল, আমি চাই তুমি আমাকেও বিশ্বাস কর। কর না?

করি।

আমি কৃতার্থ।

কী যে বলেন।

জান, এর আগে, আর কোনদিন, কেউ, কখনো আমাকে এতটা বিশ্বাস করেনি। নইলে তুমি আসতে না। এই বাস্তবটা স্বপ্ন হয়ে থাকত। প্রিয়জনের সঙ্গে বাস্তবও স্বপ্ন হয়ে যায়, যেমন এখন হয়েছে। বাংলাটা তুমি বুঝতে পারছ?

হ্যাঁ।

তুমি খুব অল্প দিনে শিখতে পারবে। আমি নিজে তোমাকে শেখাব।

বাবর প্রসঙ্গ বদলালো ইচ্ছে করে। জাহেদাকে সে ভাববার অবকাশ দিতে চায় না। একমুখী একটা ঝড়ের মত তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়, সেখানে–যেখানে সে নিজেকে দেখছে। জাহেদার সঙ্গে শুয়ে আছে। সদ্য জাত দুটি শিশুর মত।

আর কোনো কথা বলল না কেউ। ওরা আরিচায় এলো। শুনল ফেরি আসতে এখনো এক ঘণ্টা দেরি।

কিছু খাবে জাহেদা? এখানে কি পাওয়া যায়?

আমার সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ আছে। এখান থেকে মিষ্টি খেতে পার। চমচম খাবে? ছেলেবেলায় আমি খুব পছন্দ করতাম। খাও না?

জাহেদা মাত্র আধখানা চমচম খেল।

খাও, একটা খেলে এমন কিছু মোটা হয়ে যাবে না।

আপনি কী মনে করেন? সব সময় ফিগারের কথাটা চিন্তা করি?

বকুনি খাওয়া শিশুর মত কাচুমাচু হলো বাবর। দেখে হেসে ফেলল জাহেদা। বলল, আচ্ছা, বলছেন যখন। যা মিষ্টি। এই জন্যে খেতে চাচ্ছিলাম না।

চা খেয়ে নদীর পার দিয়ে হাঁটতে লাগল ওরা। কত অসংখ্য নৌকো। ছোট, বড়, ছৈওলা, মহাজনি, ডিঙ্গি, শালতি কোষা, ছিপ। একটা নৌকা ভারি চোখে ধরল। বাবরের। ঝকঝকে ছৈ, গলুইয়ে গাঢ় কমলা রঙের সারি সারি ত্রিভুজ আঁকা, তিমি মাছের লেজের মত সর সর করে পানি কাটছে গাব দিয়ে মাজা হাল। ভেতর থেকে নীল শাড়ি পরা একটা বৌ বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে চলমান পাড়ের দিকে।

হঠাৎ যেন বাবর দেখতে পেল এই রকম একটা নৌকোয় জাহেদাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে সে। নিচে কুলকুল করছে পানি। টিপটিপ করছে জাহেদার বুক। তার দুপায়ের

ভেতর স্বপ্ন গুঁজে বিভোর হয়ে শুয়ে আছে সে। বাবর অস্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করল, তোমাকে একবার নৌকোয় চাই।

কিছু বললেন?

নাতো। হেসে ফেলল বাবর। নৌকোটা ভারি সুন্দর। বৌ বোধহয় বাপের বাড়ি যাচ্ছে।

কী করে বুঝলেন?

শ্বশুর বাড়ি হলে অমন চোখে বাইরে তাকিয়ে থাকত না।

অবাক হয়ে গেল জাহেদা? বলল, সত্যি, এত কথাও আপনার মাথায় ঢোকে। এই রকম একটা ধাঁধা ছিল না আপনার টিভিতে।

ছিল। বাহ তোমার মনে আছে তো?

হোস্টেলে আমাদের সেট আছে যে। খাবার পর এক ঘণ্টা দেখতে দেয়।

বাবর অন্যমনস্কভাবে হাসল। এখনো তার চোখে নৌকোর স্বপ্নটা ভাসছে। নৌকোয় সে কখনো কোনো মেয়েকে নিয়ে যায়নি। কথাটা মনেই হয়নি তার। এবারে মনে রাখবে। একদিন জাহেদাকে নিয়ে যাবে সে।

বাবর বলল, চল, ওদিকে যাই। মাছ বিক্রি হচ্ছে। দেখবে।

হাঁটতে হাঁটতে বাঁ দিকে চলে গেল তারা যেখানে জেলেরা বড় বড় রুই অবলীলাক্রমে দুহাতে তুলছে, দাম বলছে, মাথা নাড়ছে, আবার মাছটা রেখে দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখল ওরা।

একটা মাছ নেবে?

নিয়ে কী হবে? জাহেদা অবাক হয়ে জিগ্যেস করল।

এমনি দেখতে কত ভাল লাগছে।

চলুন, চলুন। যা ভাল লাগে। তাই কিনতে হয় বুঝি। কী সাংঘাতিক লোক আপনি। চলুন তো।

জাহেদা প্রায় টেনে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে আনল! দূরে দেখা ফেরি জাহাজটা ধীরে ধীরে আসছে। সাদার রংটা প্রায় মিশে গেছে নদীর রূপালি পানির সঙ্গে। স্মৃতি বিস্মৃতির মাঝখানে ভাসমান একটা স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে।

বাবর বলল, ঐ আমাদের ফেরি।

কই?

আরে ঐ তো।

কই, দেখছি নাতো।

এইখানে দ্যাখ। বাবর ডান হাত তুলে বাঁ হাতে জাহেদার মাথাটা ঘুরিয়ে জাহাজের দিকে করে দিল। এবার দেখতে পাচ্ছে?

হ্যাঁ।

বাবর হাতটা সরিয়ে নিল ওর মাথা থেকে। চুলগুলো অদ্ভুত খসখসে। বোধহয় ঘন করে স্প্রে ছড়ায় জাহেদা। কেমন আঠাল আর ভারি।

বাবর বলল, চুলে এত স্পে দাও কেন?

জাহেদা বাবরের চোখের দিকে তাকাল হঠাৎ।

এতটা দিও না। এত সুন্দর চুল, নষ্ট হয়ে যাবে!

আপনি কী জানেন? প্রে না দিলে চুল বানানো যায়?

বানানো মানে?

তাও জানেন না। চুড়ো ফুলে থাকবে কী করে? চুর হবে কী করে?

জাহেদা যেন ভারি মজা পেয়েছে, খিলখিল করে হেসে উঠল।

বাবর গম্ভীর হবার অভিনয় করে বলল, ও, জানতাম না। শিখলাম।

থাক, মেয়েদের এসব শিখতে হবে না।

কোনো কথাই ফেলা যায় না। কখন কোনটা কাজে লাগে।

টিভিতে ধাঁধা দেবেন না কি? বাবর একটু আহতই হলো। তার কি আর কোনো ক্ষেত্র নেই ধাঁধা ছাড়া? সবাই তাকে ঐ একটা ছকে ফেলে দেখে কেন। আবার হঠাৎ মাথার ভেতরে বাঘটা লাফিয়ে উঠল তার। ইচ্ছে করল, নিষ্ঠুর একটা চুমোয় সবটা রক্ত শুষে নেয় জাহেদার, তার পেছনে প্রচণ্ড একটা চাপড় দেয় যেন হাতের পাঁচটা আঙুল নীল হয়ে বসে থাকে।

বাবর স্পষ্ট দেখতে পেল চোখের সমুখে, আকাশ জোড়া, ঈষৎ রক্তাভ একটি নিতম্ব, তাতে পঞ্চনদের মত আঙুলের পাঁচটি নীল দাগ।

হাঁটতে হাঁটতে বাবর বলল, জানি, ছেলেবেলায় স্বপ্ন দেখতাম বড় কবি হবো।

হলেন না কেন?

কবি কি হওয়া যায়?

ইচ্ছে থাকলেই হওয়া যায়। আপনি হতে পারতেন।

পারতাম?

হ্যাঁ। আমার বিশ্বাস আপনি হতে পারতেন।

কিন্তু হইনি। ক্লাশ এইটে যখন পড়তাম তখন শেফালি ফুল নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলাম; আর একটা লিখেছিলাম কলেজে থাকতে, তাজমহলের উপর। প্রেম সম্পর্কে খুব বড় বড় কথা ছিল ওতে। এখন হাসি পায়।

কেন?

কী, কেন?

হাসি পায় কেন?

হাসি পায়, প্রেম তখন সাংঘাতিক একটা কিছু বলে মনে হতো, তাই।

জাহেদা হঠাৎ আনমনা হয়ে গেল! এক পলক কোথায় যেন অন্তর্হিত হলো মেয়েটা। বাবর কথাটাকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বলল, চল, আরেকটু চা খাইগে। গাড়ির কাছে এসে বলল, তুমি গাড়িতে বসে খাও। আমি টিকিটটা করে আনি।

ফিরে এসে দেখে, জাহেদা দুহাতে চিবুক রেখে চুপ করে বসে আছে। আর তার কাছে হাত

পাখা বিক্রি করবার চেষ্টা করছে একটা বুড়ো লোক। বাবরকে দেখে লোকটা এগিয়ে এসে কয়েকটা পাখা পাড়িয়ে দিল।

শীতকালে হাতপাখা দিয়ে কী হবেরে বাবা?

নিয়া যান, কত কামে লাগে, আমাগো সাহায্য হয়।

আচ্ছা, দাও একটা।

জাহেদাকে দিয়ে বলল, কেমন, সুন্দর না?

হুঁ!

ও-রকম করে আছ যে? চা খেয়েছ?

হ্যাঁ। আপনি খান।

দাও।

জাহেদা সন্তর্পণে চা ঢেলে দিল বাবরকে। জাফরান রং করা নখগুলো ঘিরে ধরল প্লাস্টিকের পেয়ালাটা। পরশু যে রংটা লাগিয়েছিল আজও সেটা আছে। পাঁচটা সযত্ন ফোঁটার মত দেখাচ্ছে কোনো নববধূর কপোলে! বাবরের ইচ্ছে করল। ছুয়ে দেখে। বাবর সেই ভবিষ্যতকে দেখতে পেল, যখন কম্পিত আঙুলের ডগায় অন্ধকারে তার পিঠে এসে বসবে ঐ জাফরান ফোঁটাগুলো। বাবর তার ট্রাউজারের ভেতরে বাসনার সঞ্চরণ এবং উত্থান অনুভব করতে পারল। দগ্ধ হতে লাগল। উত্তাপে। কিন্তু এ উত্তাপ পোড়ায় না, পরিণামে ছাই করে না, নিরবধি শুধু বিকীর্ণ হতে থাকে এবং কিছু করা যায় না।

অসহ্য এই অভিনয়। এই ছলাকলা। এই শোভন সদালাপ। তার চেয়ে যদি এমন হতো, স্পষ্ট বলা যেত। আর সে শুনত।

দাঁতে দাঁত ঘষল বাবর।

জাহেদা এই প্রথম জিগ্যেস করল, চুপ করে আছেন যে!

কই, না।

হেসে ফেলল বাবর। সুন্দর করে হাসল। তার সেই বিখ্যাত রমণীমোহন হাসিটাকে বের করে দেখাল সে। আর মনে মনে বলল, খেলারাম খেলে যা।

১২. আরিচার পর বাঘাবাড়ি

আরিচার পর বাঘাবাড়ি। শেষ ফেরি এটাই। তারপর সোজা একটানা রংপুর। বাঘাবাড়িতে এসে রেস্ট হাউস দেখে জাহেদা বলল, একটু দাঁড়ান।

তার ছোট্ট সুটকেশটা নিয়ে জাহেদা ভেতরে চলে গেল।

একটা বাবলা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রইল বাবর। ওপাশে নিচু জমিতে একটা মরা গরু পড়ে আছে। কয়েকটা শকুন খুবলে খুবলে খাচ্ছে তাঁর পচা মাংস। বহুদূরে একটা কুকুর বসে বসে জিভ বার করে তাই দেখছে। কয়েকটা ন্যাংটা ছেলে এসে ভিড় করেছে। বাবরের চারপাশে। সে গাড়ি থেকে তাদের একটা বিস্কুটের প্যাকেট বার করে দিল। তারা তো প্রথমে বিশ্বাস করতে চায় না, তাদের দেয়া হয়েছে। তারপর যখন বিশ্বাস হলো, প্যাকেটটা নিয়ে দে ছুটি কলরব করতে করতে। বাবর হা হা করে হেসে উঠল। তার ফেলে দেয়া সিগারেটের টুকরো পথ চলতে পেয়ে গেল বুড়ো। নির্বিকার মুখে টানতে টানতে সে মাঠের মধ্যে নেমে গেল।

জাহেদা বেরিয়ে এলো।

মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল বাবর। জাহেদা কালো পোশাকটা পালটে নীল জামা নীল পাজামা পরে এসেছে। মাথায় একটা নীল রিবণ দিয়েছে। রং বুলিয়েছে ঠোঁটে। মুখে

মিহি গোলাপি পাউডারের আভা। চোখের কোলে একটুখানি পেন্সিল পরেছে, আরো গভীর এবং সজল। লাগছে এখন।

বাবর প্রসন্ন হাসিতে উজ্জ্বল হলো। জাহেদাও হাসল তারপর ঘুরে যখন গাড়িতে বসল। তখন তার প্রশস্ত নিতম্ব দুলে উঠল। গুরুভার একটা কোষার মত।

বাবর বলল, কিছু খেয়ে নেবে?

ক্ষিদে নেই।

আরিচা থেকে আবার স্তব্ধতা পেয়ে বসেছে জাহেদাকে। ফেরিতে সারাক্ষণ উদাস হয়ে বসেছিল সে।

গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে বাবর বলল, তোমার ভাল লাগছে না?

হ্যাঁ।

অনেক কিছু দেখার আছে। মহাস্তান দেখব, রামসাগরে যাব, কান্তজীর মন্দির–সারা উপমহাদেশের পোড়া মাটির ফলকে তৈরি একমাত্র মন্দির, সেটা দেখবে। আর এভারেস্ট দেখবে পচাগড় থেকে! পাহাড় দেখেছি কখনো?

চাটগাঁয়ে দেখেছি।

সে তো বাচ্চা পাহাড়। তোমার মত।

বাবর রসিকতা করল এবং হাসিটা দীর্ঘস্থায়ী করে রাখল। জাহেদাও হাসল, কিন্তু কেমন যেন আনমনা সে।৩খন বাবর আর কিছু বলল না। খুব চড়া রোদ দেখে কালো চশমা পরে নিল।

কিছুক্ষণ পর ডানে দেখিয়ে বলল, এই রাস্তা দিয়ে শিলাইদহে যাওয়া যায়। ফেরার পথে তোমাকে নিয়ে যাব। রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে এখানে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছ?

হ্যাঁ শুনেছি। কী মনে করেন? আমি তার গানও শুনেছি।

ভাল লাগে তোমার?

লাগে। তার একটা গল্পও পড়েছি। দি হোম কামিং।

দি হোম কামিং? বাবর মনে করতে পারল না কোন গল্পের কথা জাহেদা বলছে। সে আবার জিগ্যেস করল, কী আছে বলতো ওতে?

একটা ছোট্ট ছেলে। মানিক না ফটিক নাম।

ওহো। বাংলায় ওটার নাম ছুটি। অতি বিখ্যাত গল্প। ইংরেজিতে দি হোম কামিং নাকি? জানতাম না। রবীন্দ্রনাথ এই শিলাইদহে বসে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প, গান আর কবিতা লিখেছেন। তুমি যখন বাংলা শিখবে তখন তার বই পড়তে দেব।

পড়ব।

জাহেদার উচ্চারণে এমন একটা মিনতি ছিল যার অর্থ আমাকে একটু চুপ করে থাকতে দাও। বাবর তাই দিল। নীরবে গাড়ি চালাতে লাগল সে। উল্লাপাড়া পার হয়ে গেল। আজ বোধহয় এখানে হাটবার। দলে দলে লোক চলেছে কত রকম জিনিস নিয়ে। বাচ্চারা দৌড়াদৌড়ি করছে। আড় হয়ে পড়ে আছে কোথাও কয়েকটা গরুর গাড়ি। এরই মধ্যে হঠাৎ একটা পালকি দেখা গেল। দু বেহার হুম হাম করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। খয়েরি রংয়ের ওপর সাদা চুণে লতাপাতা আঁকা পালকির গায়ে। দরোজা বন্ধ। বোধহয় বৌ যাচ্ছে।

বাবর গাড়ির গতি কমিয়ে বলল, ওটা কী দেখেছ? পালকি। আজকাল দেখাই যায় না। আমিও প্রায় পঁচিশ বছর পরে দেখলাম।

মিষ্টি করে হাসল জাহেদা। কিন্তু তেমনি অন্যমনস্ক।

আবার বাঁধান রাস্তায় টায়ারের শনশন আর এঞ্জিনের একটানা আওয়াজ শোনা যেতে লাগল শুধু। বাবরের একটু মাথা ধরেছে, এইমাত্র বুঝতে পারল সে। ঠিক মাথা ধরা না, যেন কিছুক্ষণ পর ধরবে।

জাহেদা হঠাৎ জিগ্যেস করল, আচ্ছা আপনি একা থাকেন কেন?

বাবর ভাবল, আবার সেই প্রশ্ন। কতজন কতভাবে এই এক কথা জিগ্যেস করেছে। মনে হয় মায়ের থেকে বেরিয়েই এ কথা শুনতে শুরু করেছে সে। একা থাকেন কেন? বিয়ে করে বৌয়ের সঙ্গে বেশি তাল দিলে লোকে প্রশ্ন করবে, উনি অতটা স্ত্রৈণ কেন? বৌ থেকে দূরে দূরে থাকলে তারা মুখর হয়ে উঠবে, বৌকে ভালবাসেন না কেন? বাচ্চা না হলে, বাচ্চা হচ্ছে না কেন? বাচ্চা যদি হয়, আর কত বংশবৃদ্ধি করবেন? আর যদি কিছুই না করে ঘরে খিল দিয়ে থাকা যায়, প্রেমে ব্যর্থ হয়েছিল নাকি ভদ্রলোক? নাকি নপুংশক। মুক্তি নেই।

বাবর মুখে বলল, একা থাকি মানে?

মানে, বিয়ে করবেন না নাকি?

বাবরের খুব পছন্দ হলো জাহেদাকে এখন। খুব সুন্দর পছন্দ গলায় বলেছে কথাটা। বোধ হয় ওরা যাকে বিশ্বাস বলে থাকে তারই ফলে কণ্ঠ এ-রকম স্বচ্ছন্দ হয়।

হাসছেন কেন?

না, হাসছি না। কী জবাব দেব ভাবছি।

বাবর ভাবল যা সত্যি তা বললে ও বুঝতে পারবে না। বিয়ে সে করবে। কেন? শরীরের জন্যে? সে প্রয়োজন বিয়ে না করেও মেটান যায়। বরং তাতে তৃপ্তি আরো অনেক। বিবাহিত বন্ধুদের কি সে শোনেনি। স্বীকারোক্তি করতে? বৌয়ের সঙ্গে শুয়ে সুখ নেই। বন্ধুরা কি তাকে বলেনি, দে না একটা মেয়েটেয়ে যোগাড় করে? বিয়ে করবে সন্তানের জন্যে? সন্তান সে চায় না। চায় না তার উত্তরাধিকার কারো উপরে গিয়ে বর্তক। আমার জীবনের প্রসারণ আমি চাই না। মৃত্যুর পরেও আমি বেঁচে থাকতে চাই না। আমার এমন কিছু সম্পদ নেই, অর্জন নেই, উপলব্ধি নেই। যা যক্ষের মত আগলে রাখার স্পাহা বোধ করি ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্যে। এ জীবন আমি চাইনি, অতএব কারো জীবনের কারণও আমি হতে চাই না। বিয়ে করব ভালবেসে? ভালবাসা বলে কিছু নেই। ওটা একটা পন্থা। পন্থা কখনো লক্ষ্য হতে পারে না, নিবৃত্তি নেই তাতে। ভালবাসা একটা অভিনয়ের নাম।

কিন্তু জাহেদা এতসব বুঝবে না। কিম্বা সে বোঝাতে পারবে না। লোকে যতই বলুক, সে সুন্দর করে কথা বলতে পারে, সে নিজে জানে অনেক কথাই সে গুছিয়ে বলতে জানে না, এবং তাদের সংখ্যাই অধিক। তাই আর দশজনের মত সে বলল এবং মিথ্যে হলেও বলল, তোমাকে সত্যি কথা বলতে কী? একজনকে ভালবাসতাম। তার ভালবাসা পাইনি, তাই একা আছি।

জাহেদা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাবর প্রীত হলো একটি অনবদ্য মিথ্যা কথা সুন্দর করে বলতে পেরেছে ভেবে।

সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি।

কোনোদিন বলেননি তো?

কোনোদিন তো জিগ্যেস করনি।

কে সে?

বাবর একটু হাসল। এইভাবে অবকাশ নিল দ্বিতীয় মিথ্যে রচনার। বলল, তাকে তুমি চিনবে না। সে এখানে নেই। বিলোতে আছে এখন।

বিলেতে?

হ্যাঁ, ওর স্বামী ওখানে এমব্যাসিতে আছে।

কবে বিয়ে হয়েছে?

সে পনের বছর আগে। তুমি তখন বোধ হয়। টলমল করে হাঁট। কত বয়েস হবে তখন তোমার? তিন? চার।

জাহেদা তার জবাব না দিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে আর দেখা হয় না?

হবে কী করে? সে বিলোতে, আমি ঢাকায়। হ্যাঁ, মাঝখানে একবার দেশে এসেছিল। এয়ারপোর্টে হঠাৎ দেখা। ব্যাগেজের জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি কী একটা কাজে ভেতরে ঢুকেছিলাম। বাবর থেমে থেমে বানিয়ে বানিয়ে বলে যেতে লাগল, যেন সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে এখন। দেখি ওর পায়ের কাছে ছোট্ট ফুটফুটে একটা বাচ্চা মেয়ে।

কথা হলো না?

না।

না? প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। বলল, কেন?

ও বলল না। আমাকে দেখেও দেখল না। আমি চলে এলাম।

জাহেদা উদাস হয়ে গেল। যেন কল্পনা করতে লাগল এয়ারপোর্টের ছবিটা। বাবর আপনি মনেই হাসল। কত সহজে বিশ্বাস করে ওরা। তার চমৎকার মিথ্যেটাকে সত্যি মনে করে বুকের ভেতর ভাঙ্গন অনুভব করছে মেয়েটা।

জাহেদা অফুট স্বরে জিগ্যেস করল, আচ্ছা, ভালবাসা তবে কী?

মনে মনে বাবর বলল, খুব ভাল কথা তুলেছি। তোমাকে বলব। তাহলে তোমাকে পাওয়া সহজ হবে। পাজামা খুলতে এতটুকু গ্লানি বোধ করবে না তুমি।

কিন্তু সরাসরি তার জবাব না দিয়ে সে একটু খেলা করতে চাইল। বলল, কোনোদিন তুমি ভালবেসেছ জাহেদা?

না।

মুখে বলল, এবং একই সঙ্গে মাথা নাড়ল জাহেদা। পরে হেসে ফেলল। কোলের উপর আসা কামিজটাকে নামিয়ে দিয়ে মসৃণ করতে লাগল ভাজগুলো।

বিশ্বাস করি না।

সত্যি বলছি।

হতেই পারে না। আমাকে বলতে কী? বল?

জাহেদার মুখ থেকে হাসিটা হঠাৎ নিভে গেল। তারপর দপ করেজ্বলে উঠল বাতিটা। মাথাটা কাৎ করে দরোজার হাতল বাঁ হাতে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, কী শুনবেন? সে অনেক আগের কথা।

তবু শুনব। বল তুমি।

না।

বল। ছেলেটা তোমার কাজিন ছিল, না?

কী করে জানলেন?

আমি জানি।

ইস, অন্ধকারে একটা ঢিল লেগে গেছে, বুঝি, বুঝি।

বাবর হাসল। নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল। সে জানে, জাহেদা না বলে পারবে না। শুধু একটু সময় নিচ্ছে।

জাহেদা বলল, একদিন, আমার এখনো মনে আছে, ছাদের ওপর আমরা সন্ধেবেলায় হাত ধরাধরি করে বসেছিলাম।

তোমাদের বাসায় থাকত?

না। বেড়াতে এসেছিল। একটা ছাই রংয়ের সুটকেশ ছিল ওর। টিনের (একদিন ওর জামার পকেট থেকে টুক করে পড়ে গেল চাবিটা। আমি পা দিয়ে চেপে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমার সামনেই সারা ঘর তোলপাড় করল চাবির জন্যে। তারপর হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই আমি আর হাসি রাখতে পারিনি। হেসে ফেলেছি।

খুব চালাক তো?

ভীষণ চালাক ছেলে। আমাকে ও মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখল। চোখে যেন আগুন। আমাকে পুড়িয়ে ফেলবে। ভয়ে আমার বুকও শুকিয়ে এসেছিল। হঠাৎ ও হেসে ফেলল। হাসলে ওকে ভারি সুন্দর দেখাত জানেন?

কল্পনা করছি। বল।

তারপর একটি কথা না বলে আস্তে আস্তে আমার পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসল। একটা হাত রাখল ঠিক যে পায়ের নিচে চাবি ছিল তার ওপর। আমার কী হলো আমি পা

সরিয়ে নিতে পারলাম না। ও সরিয়ে দিয়ে চাবিটা নিয়ে মাথা নিচু করে ঘর থেকে দৌড়ে চলে গেল। আর আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম তো থাকলামই।

তারপর?

তারপর আর কিছু নেই। এখন কেন বলছি কে জানে? হঠাৎ মনে পড়ল। আপনি জিগ্যেস করলেন, তাই।

তারপর?

বললাম তো, আর কিছুই নেই। বলে জাহেদা হাসল, ঠিক যেমন ঘুমের মধ্যে বাচ্চার হাসে নিঃশব্দে। সেই হাসিটা অস্পষ্ট হতে হতে যখন মিলিয়ে গেল, তখন চকিতে বাবরের দিকে তাকাল। বাবর বলল, তারপর কী হয়েছিল আমি জানি।

ইস।

সত্যি জানি। বলব?

বলুন তো।

তারপর রাতে তুমি ঘুমিয়েছিলে। হঠাৎ জেগে উঠে দ্যাখ তোমার পায়ে চুমো খাচ্ছে সে। জাহেদার চোখ হঠাৎ উদ্বেগে ভরে উঠল।

তুমি কিছু বলতে পারলে না। তোমার শরীরের ভেতরে আরেকটা শরীর যেন তৈরি হতে লাগল। সে এবার সাহস পেয়ে তোমার গালে চুমো দিল। ছেলেমানুষ তো, তাই জানে না, ঠোঁটে চুমো দিতে হয়।

যাহ।

লাল হয়ে উঠল জাহেদা।

তারপর অনেকক্ষণ শুয়ে থেকে আবার চুমো খেল সে। হঠাৎ একটা কীসের শব্দ হলো কোথাও। লাফ দিয়ে পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

কি ঠিক বলিনি?

জবাব দিল না জাহেদা।

মিলে গেছে? বল না। আমার কাছে লজ্জা কী?

না।

কাউকে না কাউকে বলতে হয় বল।

প্রায় ঠিক বলেছেন। জাহেদা ফিসফিস করে বলল। কী করে বললেন?

তোমার চেয়ে আমার বয়স যে অনেক বড়। আমার মত বয়স হলে তুমিও বলতে পারতে।

বাবর নিজেও অবাক হয়ে গিয়েছিল আর অনুমানটা সত্যি হয়ে যেতে দেখে। কী করে বলল সে। এ-রকম যোগাযোগ সাধারণত হয় না। হঠাৎ খুশি কাটিয়ে মনে পড়ল তার জাহেদা বলেছে, প্রায় ঠিক বলেছেন। সে জিগ্যেস করল, প্রায় ঠিক বলেছি, না? আসলে আর কী হয়েছিল?

জাহেদা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না, সে রাতে তার প্যান্টের বোতামগুলো খুলে ফেলেছিল। তখন বাধা দিয়েছিল সে। কিন্তু বাধা মানেনি। কী ভীষণ লজ্জা করছিল তার। মরা একটা মাছের মত পড়েছিল সে। উন্মুক্ত ঊরু হঠাৎ কাঁটা দিয়ে উঠেছিল তার। খুব ঠাণ্ডা লাগছিল। গলার কাছে দম একটা ছিপির মত আটকে ছিল তার। কিন্তু ছেলেটা কিছুই করেনি। একমুহূর্ত পর প্যান্টটা টেনে দিয়ে চুমো খেয়েছে তাকে। তারপর সত্যি কোথায় যেন একটা খড়মের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। কিন্তু লাফ দিয়ে পালায়নি ছেলেটা। চট করে পাশে সটান হয়ে শুয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর উঠে গেছে আস্তে আস্তে। বাবর বলল, কী ভাবছ? মনে পড়ছে সব?

জাহেদা অস্পষ্ট করে হাসল।

বাবর জিগ্যেস করল, ছেলেটা কোথায়?

এখন ফাইনাল ইয়ারে আছে।

ঢাকায়?

হ্যাঁ, ঢাকায়।

দেখা হয় না?

না। জানেন? হঠাৎ জাহেদা খুব স্বচ্ছন্দ হবার চেষ্টা করল। ঝরঝরে গলায় বলল, জানেন ও এখন প্রেম করছে ওরই ক্লাশে পড়ে। পাশ করে বেরুলেই বিয়ে হবে। বিলেতে যাবে।

যাক, যারা বিলেতে যেতে চায়, যাক কী বল?

দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল।

জাহেদা বলল, আপনি সিগারেট কিন্তু বেশি খাচ্ছেন!

তাই নাকি? আর খাব না।

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বাবর। পথের ওপর ঘুরতে ঘুরতে পড়ে দ্রুত পেছনে সরে গোল ধিকি ধিকি আগুনটা। বাবর হাসল।

কী, হাসছেন যে?

না, এমনি। হাসি কান্না এসব শরীরের একেকটা অবস্থা। মনের অবস্থা অনুযায়ী লোকে কাঁদে হাসে, আবার কখনো কখনো শরীরের অসংখ্য কোষে হঠাৎ সাড়া জাগে, পেশিগুলো নিজে নিজেই এমন বিন্যাসে হঠাৎ পড়ে যায় যে তখন হাসি হয়, কান্না পায়। বুঝেছি? কিছু ভেবে হাসছি না।

আপনার কথা আমি একটুও বুঝতে পারি না।

বলে জাহেদা সীটে মাথা এলিয়ে চোখ বুঝল। হঠাৎ চোখ খুলে একবার দেখে নিল বাবরকে। না, এখন আর সে হাসছে না। একটু পর বাবর তার দিকে চোখ ফেরাল। তার ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল জাহেদার দুচোখে চুমো দেয় সে। জিভের ডগা দিয়ে তার সাদা দাঁতগুলো মেজে দেয়। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটু একটু চোখ পড়ছে। ঠোঁটে

খাড়া কয়েকটা ভাঁজ। সোনালি রোমগুলো চিকচিক করছে আলোয়; বাবর জানে যখন চুমো খাবে তখন ঐ রোমগুলো তার শরীরে তুলবে শিহরণ।

গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিল বাবর।

এক সময়ে জাহেদা হঠাৎ চোখ মেলল।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছ।

এটা কোথায় এলাম?

এই তো বগুড়া। একটু পরেই সাতমাথা আসবে। সাতটা রাস্তা এক জায়গায় এসে মিলেছে। ছেলে ছোঁকড়ারা খুব আড্ডা দেয় এখানে।

এই যে।

সত্যি তো।

গলা বাড়িয়ে জাহেদা সাতমাথার মোড় দেখল। তারপর গাড়ি এগিয়ে গেলে পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখল।

বাবার বলল, কিছু খেয়ে নেবে?

কত খাব?

কিছুইতো খাওনি?

তবু। আর কিছু খাব না। চমচম খেয়ে পেট ভরে গেছে।

স্যাণ্ডউচ্চ তো ছুঁলেই না। আচ্ছা, একটু চা খাও। চা কিনে নিই। রংপুর এখনো অনেক দূরে। গাড়ি থামিয়ে চায়ের খোঁজ করল বাবর। চা পাওয়া গেল না। বগুড়ায় বিকেলে নাকি চা হয়। না। পাঁচটা বাজবে, তখন চায়ের কেতলি বসবে উনুনে। অনেক খোঁজাখোঁজি করে এক দোকান পাওয়া গেল। সেখান থেকে চা কিনে গাড়িতে বসে খেল ওরা। তারপর বগুড়া ছাড়ল।

ফেরার সময় এখান থেকে রসকদম নিয়ে যাব।

রসকদম কী? জাহেদা জিগ্যেস করল।

এক ধরনের মিষ্টি।

মিষ্টি বুঝি খুব ভালবাসেন আপনি?

হ্যাঁ! এবারে ছাড়তে হবে। বয়স হচ্ছে। ডায়বেটিসের ভয় আছে। এই যে বাঁয়ে মহাস্থানগড়। ফেরার পথে থেমে তোমাকে দেখাব।

জাহেদা হেসে উঠল।

হাসির কী হলো?

আপনি সেই সকাল থেকে সব কিছু ফেরার পথে দেখাবেন বলে রাখছেন। যাওয়ার পথে কিছু দেখার নেই নাকি?

বাবর একটু লজ্জিত হলো। কথাটা একবারও তার মনে হয়নি। কিন্তু হেরে যাবে না সে। মিষ্টি হেসে বলল, যাওয়াটাই বাঁ কম কীসে? এই চলা, তুমি সঙ্গে আছ, কথা বলছি; ঢাকায় থাকলে হতো? নতুন লাগছে না।

তা লাগছে। কিন্তু আমরা দেখতে যাচ্ছি কী তাও তো বললেন না?

অনেক কিছু।

কী, অনেক কিছু?

গেলেই বুঝবে।

বাবর প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু কথা খুঁজে পায় না। এ-বকম সচরাচর হয় না তার। নিজের ওপর, বিশ্বের ওপর, সময়ের ওপর ক্রোধ হয় তার। কী ক্লান্তিকর অভিনয় তার করতে হচ্ছে। কী দীর্ঘ প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে তাকে। মাথার ভেতরে জ্বলন্ত বর্ণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে জাহেদার সাথে সঙ্গমরত তার ছবিটা। সে গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। জাহেদা কি এখনো বুঝতে পারছে না, সে কী চায় তার কাছে? এতই সে নাবালিকা যে তার সঙ্গে ওভাবে হোস্টেল থেকে বেরিয়ে এতদূর এসেছে অথচ একবারও মনে হয়নি যা বাবরের মনে মনে আছে?

বাবরের ভেতরে তীব্র ইচ্ছে ফণা তুলে দুলতে লাগল–এখন, এই পথের ওপর আর কিছু না হোক জাহেদাকে একটু স্পর্শ করতে।

ইচ্ছে করে হঠাৎ ব্রেক করল সে। যা চেয়েছিল তাই হলো। জাহেদার মাথা ঠুকে গোল সামনের কাচে। সামলে নিয়েছে মেয়েটা, জোরে লাগেনি।

বাবর বলল, দ্যাখ, দ্যাখ, লোকটাকে পাশ কাটাতে কী হয়ে গেল। বলে সে গাড়ি একেবারে থামিয়ে জাহেদার কপাল, দুহাতে ধরল।

দেখি, কোনখানে লেগেছে। ইস।

জাহেদা হেসে মাথা নাড়ল। না, লাগেনি তেমন।

লেগেছে, শব্দ পেলাম যে।

বলে সে তার কপালে করতাল রাখল। আস্তে আস্তে ঘষে দিতে লাগল। জাহেদা চেষ্টা করল মুক্তি পেতে। কিন্তু পারল না। বাবর বলল, ছেলেমানুষি কর না। একটু বুলিয়ে দেই। নইলে মাথা ধরবে।

আমার লাগেনি, বললাম।

মিথ্যে বল না।

সত্যি। ছেড়ে দিন। রংপুর কদ্দূর?

বাবর কপাল ছেড়ে এবার দুহাতের মধ্যে জাহেদার মুখটাকে নিয়ে নাড়া দিতে দিতে বলল, আমি খুব দুঃখিত। ওভাবে ব্রেক করা উচিত হয়নি।

জাহেদার মুখের কোমলতা যেন হাত ভরে রইল বাবরের। সে হাত ফিরিয়ে এনে নিজের মুখে রাখল, যেন এটা খুব স্বাভাবিক। যেন সে নিজেও ক্লান্ত। আর শরীর দিয়ে টের পেল তার করতল থেকে সঞ্চারিত জাহেদার মৃদু উত্তাপ তার মুখে। হাত দুটো যেন অন্য কারো হয়ে গেছে, এমন লাগছে তার। নিজের হাতের দিকে চকিতে তাকিয়ে আবার গাড়ি স্টার্ট দিল সে। বলল, এই রাস্তাটা খুব ভাল। প্রায় সোজা। মাইলের পর মাইল। রংপুর পর্যন্ত। দুদিকে কী সুন্দর আখের খেত দেখেছ? দ্যাখ, একটু কুয়াশার মত লাগছে না? ও কুয়াশা না। রান্নার ধোঁয়া। বিকেলের দিকে গ্রামে এই রকম একেকটা ধোঁয়া থমকে থাকে মাঠের ওপর।

চোখ ভরে দেখতে লাগল জাহেদা।

বাবর যখন পাশে ঝুঁকে দুহাতে জাহেদার কপাল ধরেছিল তখন জাহেদা বিব্রত হয়ে হাসতে হাসতে হঠাৎ হাসি থামিয়ে ঠোঁট ফাঁক করে দিয়েছিল। খুব উচ্চগ্রামে কম্পন্ন হলে যেমন হয়। তেমনি দেখা যায় কি যায় না। কাপছিল তার ঠোঁট। সে কি ভাবছিল বাবর তাকে চুমো দেবে হঠাৎ? দিলে হতো। হয়ত তৈরি ছিল জাহেদা তখন।

বাবর বলল, জাহেদা।

কী?

তখন তুমি ভালবাসার কথা জিগ্যেস করছিলে না?

হুঁ।

বিশ্বাস কর ভালবাসা বলে কিছু আছে?

আছে তো।

সবাই বলে তাই না?

সবাই কেন বলবে। আমি নিজেই জানি।

না, তুমি জান না।

জাহেদা প্রায় চমকে উঠল। নিঃশব্দে একটা চোখের তীর তুলে তাকিয়ে রইল সে অনেকক্ষণ।

বাবর বলল, যাকে ভালবাসা বলে আমরা সবাই জানি সেটা ভালবাসা নয়। ভুল জানি আমরা।

কেন?

আচ্ছা, তুমি বল, ভালবাসা একটা আবেগ, একটা অনুভূতি, না?

হ্যাঁ, তাইতো। মানুষের যত আবেগ আছে, যত অনুভূতি আছে, যত রকম প্রতিক্রিয়া আছে তার, আমি বলি, মূলত তা দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। বাবর অনেকক্ষণ পর এই কথাগুলো ইংরেজিতে বলতে লাগল। যাতে জাহেদা বুঝতে পারে। আর তা ছাড়া ইংরেজিতে অনেক নগ্ন কথা স্বচ্ছন্দে স্বাভাবিকভাবে বলা যায়। সে বলে চলল, মন দিয়ে শুনছ তো?

হ্যাঁ, শুনছি। আপনি বলুন।

দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে তার রক্ত মাংসের অনুভূতি, জান্তব অনুভূতি, তার মৌলিক অনুভূতি, আবেগ। আর একটা তার অর্জিত অনুভূতি–যা সে শিক্ষা দীক্ষা চিন্তা ভাবনা সভ্যতার ফলে অর্জন করেছে। একটা ভেতরের, আরেকটা বাইরের।

যেমন?

মনে কর আমার কারো ওপর খুব রাগ হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি সে আমার শত্রু। তখন আমার মৌলিক আবেগ হবে তাকে হত্যা করা।

শিউরে উঠল জাহেদা। বলল, না, না।

বাবর হেসে বলল, ভয় পাবার কী আছে? এটাই হচ্ছে সত্যি। প্রাণীজগতে এইই দেখবে। মানুষও একটা প্রাণী। কিন্তু–কিন্তু আমরা হত্যা করি না, সাধারণত করি না। আদিম কালে, যখন আমরা উলংগ থাকতাম, পাথর ছুঁড়ে প্রাণী হত্যা করে তার মাংস ঝলসে খেতাম, যখন ইতিহাস ছিল না, ভাষা ছিল না, তখন আমরা ক্রুদ্ধ হলে হত্যা করতাম। তখন সেটা স্বাভাবিক ছিল। এখন যে করি না তার কারণ আমরা আইন করে নিয়েছি, কতকগুলো নিয়ম বানিয়েছি। আর মনে রাখবে, নিয়ম কানুন আইন এসব দুর্বল মানুষেব সৃষ্টি। আমরা এখন হত্যা করি না, দয়া করি, সহানুভূতি দেখাই। দয়া হচ্ছে অর্জিত আবেগ। মানুষের রক্তে তা নেই, সভ্যতা যার নাম তারই একটা অবদান ঐ দয়া। আমরা ক্রোধ দমনকে একটা মহৎ গুণ বলে সবাই স্বীকার করে নিয়েছি। যার ক্রোধ নেই তিনি মহাপুরুষ। কিন্তু এটা প্রকৃতির নিয়ম নয়।

যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে অথচ বিশ্বাস করা যাচ্ছে না এমনি একটা দোল জাহেদার চোখে।

বাবর গাড়ি চালাতে চালাতে সমুখের দিকে স্থির চোখ রেখে নির্মল স্থির একটা হাসির উদ্ভাস সৃষ্টি করে বলে যেতে লাগল, দৈহিক মিলন মৌলিক অনুভূতি, প্রেম অর্জিত অনুভূতি, জাহেদা।

জাহেদা চোখ নামিয়ে নিল।

বাবর বলল, এখন বড় হয়েছ, এসব কথা শুনে লজ্জা পাবার কিছু নেই। প্রকৃতির নিয়মটা কী জান? এই যে গাছ, তার একটা নির্দিষ্ট আয়ু আছে, তারপর মরে যাবে। কিন্তু ধারাটা তাই বলে শেষ হয়ে যাবে না। প্রকৃতির নিয়মেই একটা গাছ থেকে আল, একটা দুটো দশটা গাছ হবে, হয়ে এসেছে, এইভাবে জগৎ চলে এসেছে। একটা মানুষ আরেকটা মানুষকে জন্ম দেবে। ফুলের রেণু ভোমরার পায়ে অন্য ফুলে ছড়ায়। একটা বিপ্লব ঘটে যায়। বীজ হয়। বীজ থেকে গাছ। কার্পাসের তুলোটা প্রকৃতির একটা কারসাজি–বীজটাকে উড়িয়ে অন্যখানে নিয়ে যাবার জন্যে। আমাদের লেপ তোষক তৈরির জন্যে তার সৃষ্টি হয়নি। পুরুষ মিলিত হয় স্ত্রীর সঙ্গে, প্রকৃতির বিধানেই তাকে হতে হয়, কারণ স্ত্রীকে গর্ভবতী হতে হবে, সে আরেকটা মানুষের জন্ম দেবে। মানুষ নামে প্রাণী এইভাবে বেঁচে থাকবে। প্রকৃতির মূল তাগিদ হচ্ছে এইই। মিলন, নিজের আকৃতিতে সৃজন, সঙ্গমের মাধ্যমে জীবনের বিস্তার। এটা আমাদের রক্তে মাংসে আছে। কিন্তু আমরা সভ্য হয়েছি, চিন্তা করতে পারি, তাই একটা সুন্দর নাম দিয়েছি সেই জান্তব আকর্ষণের, নামটা প্রেম, ভালবাসা। ভালবাসা না হয়ে এর নাম কাঁঠাল বললে, লোকে ভালবাসাকে কাঁঠালই বলত। তাই নিয়ে গান হতো, কবিতা হতো, ছবি আঁকা হতো।

বিমূঢ় একটা হাসি ফুটে উঠল জাহেদার ঠোঁটে। তার ভেতরে একটা ঝড় হচ্ছে যেন। একটা শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর গোপনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে রাজ্যের বাতাস।

বাবর মাইল পোস্টটা দেখে নিল গাড়ির গতি একটু কমিয়ে। রংপুর আর মাত্র দশ মাইল দূরে। বেলা পড়ে আসছে। আকাশের একটা কোণ লাল হয়ে উঠেছে। তার আলোয়

আরো কোমল হয়ে উঠেছে জাহেদার মুখ। স্টিয়ারিং-এর ওপর নিজের হাতের শিরাগুলো অনাবশ্যকভাবে পর্যবেক্ষণ করল বাবর কিছুক্ষণ।

তারপর বলল, আর বিয়ে কেন আবিষ্কার করেছে মানুষ জান? তখন বলেছিলাম না, ইকনমিক্স বড় মজার সাবজেক্ট। আমাদের এই জীবনটা কম্পাসের কাটার মত। ইকনমিক্সের পাল্লায় পড়ে বেচারা আর অন্য দিকে মুখ ফেরাতে পারে না। নিজের সম্পত্তি মানুষ এমন একজনকে দিতে চায় যে তার নিজেরই একটা প্রসারিত অস্তিত্ব–অর্থাৎ তার সন্তান। আগে, অনেক আগে আমরা যে যার সঙ্গে মিলিত হতাম। একটা গোষ্ঠীতে যে পুরুষেরা থাকত তারা নিজেদের সব মেয়ের সঙ্গেই সহবাস করতে পারত। মা বাবা ভাই বোন বলে কিছু ছিল না। হয়ত নিজের মেয়ের সঙ্গেই, মায়ের সঙ্গেই, বোনের সঙ্গেই ভাইয়ের সঙ্গেই হচ্ছে। এতে মালিকানার গোলমাল দেখা দিল। মানুষ সভ্য হচ্ছে যে, তাই বুঝতে পারল এভাবে তো চলে না। মানুষের স্বার্থ বুদ্ধি জন্ম নিচ্ছে যে, তাই সে চিন্তিত হয়ে পড়ল, আমার বলে কিছু থাকছে না যে। অতএব একটা নিয়ম কর, আইন কর। বিয়ে আমরা আবিষ্কার করলাম। এখন আর কোনো গোল রইল না, এই আমার সম্পত্তি এই আমার সন্তান–আমার সম্পত্তি পাবে আমার সন্তান-পুরো গোষ্ঠী নয়। বিয়ে আমাদের স্বার্থ রক্ষার একটা আদর্শ ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই নিজের বৌ ফেলে অন্যের বৌয়ের দিকে তাকান পাপ। এক সঙ্গে দশটা মেয়েকে একজন পছন্দ করলে তাকে পশু বলে গাল দিই, দশ জন পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হবে কোনো মেয়ে এ কল্পনা করলেও শিউরে উঠি।–জাহেদা?

হুঁ! কিছু বলছ না।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

শুনছি।

বুঝতে পারছ?

কিছু কিছু।

আমার কাছ থেকে শুনে নাও, বয়স হলে তখন নিজেই বুঝতে পারবে, প্রেম বলে কিছু নেই। প্রেম একটা অভিনয়। আসলে আমরা একজন আরেকজনের সঙ্গে শুতে চাই। বিশুদ্ধ এবং কেবলমাত্র শয়ন; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আনন্দ, সম্পূর্ণ তৃপ্তি, চূড়ান্ত উল্লাস এবং নিঃশেষে বিজয় প্রকৃতি একমাত্র সঙ্গমেই দিয়েছে। কে একজন খুব বড় কবি, বলেছিলেন, একটা ভাল কবিতা লিখলে তার যে সুখ হয় তা রতিসুখের তুল্য। আমি বিশ্বাস করি তাকে। আমরা, লক্ষ করে দেখবে, আমাদের সমস্ত সুখানুভূতি ঐ মানদণ্ডে মেপে থাকি। সারারাত কীর্তন গেয়ে জিকির করে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের যে চরম সুখ আমরা পেতে চাই তাও ঐ রতিসুখের মানদণ্ডেই বিচার্য। একজন তন্ময় তদগত ঈশ্বর প্রেমিকের মোহাবিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ, যদি বিশ্বাস না হয়। কী? কিছু বল? জাহেদা পথের দিকে তাকিয়ে রইল। বিহবল চোখে। তারপর সেদিকে চোখ রেখেই বলল, হয়ত আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু যা বলছেন, এতে কোনো নিয়ম থাকবে না যে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি যায়?

জাহেদা বাবরের দিকে তাকাল।

বাবর সময় নিল উত্তর দিতে। তারপর খুব ধীরে ধীরে বলল, যাক। সভ্যতার নামে মানুষ সৌন্দর্য সৃষ্টি যেমন করতে চেয়েছে, তেমনি ধ্বংসও করেছে। মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে একটু একটু করে অভিনয়ের শিক্ষানবিশী করতে করতে এখন বড় একজন পাকা অভিনেতা হয়ে উঠেছে। উদ্দেশ্য ভুলে গেছে সে। লক্ষ্য ভুলে গেছে। অভিনয়টাই জীবনের সার মনে করেছে। ফলে তার নিজের মুখ বিকৃত থেকে বিকৃততর হচ্ছে। এই বিকৃত মুখ থাকার চেয়ে না থাকলেই ভাল। বন্ধুত্বের নামে শোষণ করছে, মানুষ শান্তির নামে যুদ্ধ, মুক্তির নামে বন্ধন, ধর্মের নামে অন্ধত্ব। আমরা যা ভাবি তা বলি না, যা বলি তা করি না। যা করি তাতে আমাদের মনের সায় নেই। আত্মার যে কণ্ঠ তা আমরা শুনি না। আর কত বলব? আমি একা লড়তে চাই। আর কেউ আমাকে বুঝুক বা না বুঝুক, আমার পক্ষে থাক না থাক, আমাকে পৃথিবীর জঘন্যতম লোক বলে তারা চিহ্নিত করুক, আমি স্বভাবের প্রতিষ্ঠা চাই। আমি বেঁচে থাকতে চাই। বেঁচে থাকার আনন্দ পেতে চাই। প্রতিমুহূর্তে আমি অনুভব করতে চাই আমি বেঁচে আছি।

না না। জাহেদা উদ্বেগভরা গলায় বলে উঠল, আপনাকে কেউ জঘন্য বলছে আমি ভাবতেও পারি না।

তুমি বলবে না?

কখনো না।

বাবর হাসল। বলল, সত্যি?

জাহেদা চোখ নামিয়ে নিল কিন্তু কিছুই বলল না। আর। আস্তে আস্তে হেলান দিয়ে বসল। যেন ভীষণ একটা শারীরিক পরিশ্রমের পর বিশ্রামে আলস্যে শিথিল হয়ে যাচ্ছে সে। বাবর তার হাতে একটা ছোট্ট করে টোকা দিয়ে বলল, দ্যাখ, আমরা রংপুরে এসে গেছি।

১৩. ডাক বাংলোয়

সার্কিট হাউজে কামরা খালি নেই। ডাক বাংলোয় পাওয়া গেল। ঠিক তখন সন্ধে। দোতলার একটা ঘর খুলে দিল চৌকিদার। জাহেদা বলল, এত টায়ার্ড লাগছে।

লাগবে না? কতদূর এসেছে। গাড়িতে একভাবে বসেছিলে।

বাতি জ্বালালো চৌকিদার। দুটো খাট। একটা ড্রেসিং টেবিল। তার ওপরে কবেকার একটা মেঘলা গ্লাশ পড়ে আছে। ঘরে ঢুকে জাহেদ, যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। একবার শুধু উচ্চারণ করল, এই ঘর?

হ্যাঁ। এক্ষুণি সব ঝেড়ে মুছে ঠিক করে দিচ্ছে; চৌকিদার ভাল করে বিছানা করে দিও। কম্বল দিও। পরিষ্কার সব চাই। একেবারে পরিষ্কার! মেমসাহেব যেন পছন্দ করেন। বুঝেছ?

হ্যাঁ। সে বুঝেছে। সে এক্ষুণি সব গুছিয়ে দিচ্ছে। গরম পানি আগে চাই? কইরে পানি গরম কর। না, এখানে তো খাবার ব্যবস্থা এখন করা যাবে না। কাল হতে পারে। আজ বাইরে থেকে খাবার এনে দিক সে। আচ্ছা, আপনাদের মর্জি, বাইরেও ভাল ভাল হোটেল আছে। সকালে কি নাশতার ব্যবস্থা করব? ডিম কেমন খাবেন, পোচ, ওমলেট?

জাহেদাকে বাবর বলল, গরম পানি হলেই হাত মুখ ধুয়ে চল কোথাও থেকে খেয়ে আসি। চটপট। তুমি বেরুলে আমিও মুখটা ধুয়ে নেব।

অন্য কিছু ভাববার অবকাশ দিতে চায় না বাবর। ঝড়ের মত কথা বলে চলে। চৌকিদারকৈ আরেকটা তাগিদ দিল গরম পানির জন্যে। একবারও সে জাহেদার দিকে তাকাল না। চৌকিদার বাইরে গেলে বাবর বলল, আমি আসছি। সিগারেট নিয়ে আসি।

বাইরে এসে চৌকিদারকে ধরল সে। বলল, কম্বল একটাই দিও। কেমন? আর একটা আমাদের আছে।

অন্ধকার মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় এলো বাবর। ফুটপাথে অসংখ্য দোকান বসে গেছে। হারিকেন, হ্যাজাক, বিজলী বাতি আর মানুষের কণ্ঠস্বরে গমগম করছে সন্ধ্যাটা। বাবর দুতিন দোকান ঘুরে অবশেষে একটাতে তার সিগারেট পেল। জিগ্যেস করল। এখানে খাবার ভাল রেস্তোরাঁ আছে? নাম ঠিকানা শুনে নিল তার কাছ থেকে। তারপর ধীর পায়ে ফিরে এলো বাংলোয়।

দেখে, জাহেদা ঘরে নেই। ধক করে উঠল তার বুকের ভেতরে। তারপর হেসে ফেলল, জাহেদা তো বাথরুমে। পানির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বসে বসে আরো দুটো সিগারেট শেষ করল সে। সব তার ভেবে ঠিক করা আছে। যেন একটা নাটকে দীর্ঘদিন মহড়া দিয়ে আজ মঞ্চে নেমেছে। পার্ট মনে আছে সব, তবু কেমন যেন একটা উদ্বেগ হচ্ছে থেকে থেকে।

বাথরুম থেকে বেরুল জাহেদা। বেরিয়ে তাকে দেখেই থমকে গেল যেন। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে গেল আয়নার দিকে। চুল ঠিক করতে লাগল। বাবর জানে এখন কোনো সংলাপ নেই। এখন শুধু মঞ্চে নিঃশব্দে পদচারণা। সে ভেতরে গিয়ে মুখ ধুয়ে নিল। জাহেদার তোয়ালে দিয়ে ঘষে ঘষে মুছল মুখ, একবার চেপে ধরে সুগন্ধি নিল। আয়নায় নানা রকম মুখভঙ্গি করে মুখের জড়তা ভাঙ্গল। তারপর বেরিয়ে এলো।

জাহেদা শাদা একটা পুলওভার পরে নিয়েছে। আয়নার সামনে তখনো নিজেকে দেখছে সে। নিঃশব্দে। অতি ধীরে। আর চৌকিদার বিছানা করছে। নিজের সুটকেশ থেকে কর্ডের জ্যাকেটটা বের করে গায়ে চড়াতে চড়াতে বাবর বলল, চল, চল।

বলে সে বাইরে এসে দাঁড়াল। জাহেদা যেন একযুগ পরে এলো।

চল, শহরটা ঘুরে আসি। খেয়েও নেব। খুব ক্ষিদে পেয়েছে। সারাদিন গাড়ি চালিয়ে হাত পা ভেঙ্গে আসছে যেন।

কথাটা মিথ্যে। বাবর এখন ছাত্রীসেনার মত সতেজ, প্রস্তুত, অস্থির।

কিন্তু ফল হলো। জাহেদা মুখ খুলল।

আবার এখন গাড়ি চালাতে চান?

না। রিকশা নেব।

তখন সিগারেট কিনতে যাবার সময় মাঠে একটা ছোট্ট বাঁধান নালা দেখেছিল বাবর। প্রায়

পা পড়ে মাচকাচ্ছিল। আর কী। সেখানে এসেই চটু করে জাহেদার হাত ধরে বলল, সাবধানে।

তারপর হাত ছাড়ল না। গেট পর্যন্ত ঐ ভাবেই হাঁটল। গেটের কাছে এসে জাহেদা নিজেই হাত ছাড়িয়ে নিল। মুখে বলল, এত ভিড়।

এইতো বেচাকেনার সময়।

কথাটা বলেই বাবর বুঝল, আরো একটা অর্থ হয় এর। কে জানে জাহেদা তাই বুঝল কিনা। জাহেদা আর কিছু বলল না। রিকশায় উঠে বসল। ওরা। উরুতে উরু লাগল। বাবর টের পেল জাহেদা একবার ছাড়াতে চেষ্টা করল সন্তর্পণে, কিন্তু পারল না। মনে মনে হাসল বাবর। মুখে বলল, রিকশা, নবাবগঞ্জের দিকে চল।

এর আগে কখনো কোনো মফঃস্বল টাউনে এসেছ?

না। জাহেদা তাকে অবাক করে দিয়ে হাসল। এখন হাসিটা আশা করেনি বাবর। জাহেদ আরো বলল, দেখার মধ্যে ঢাকা আর চাটগাঁ।

তোমার জন্ম কোথায়?

ঢাকায়। আপনার?

বর্ধমানে। আর সেখানে যাওয়া হবে না। এখন আর আপন-পর বুঝি না। যেখানেই যাই সেই আমার দেশ।

সাইকেলের দোকান, কবিরাজি ওষুধের দোকান, বই, মনোহারি জিনিস, কাপড়-চোপড়, ছোট ছোট চায়ের আড্ডা, হা করা অন্ধকার সব গলির মুখ। কোথায় যেন কাঁসর বাজছে। সুম সুম করছে। হ্যাজাকের আলো। হা হা হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। পুরনো পুরনো সব দালানের পলেস্তারা ওঠা থাম চারদিকে। একটা বাদুড় উড়ে গেল। আকাশে অনেকগুলো তারা ঝিকিমিক করছে।

বাবর বলল, এখানে একটা জিনিস লক্ষ করছ। প্রত্যেক দোকানে, রাস্তার মোড়ে আড্ডা হচ্ছে। এখানকার মানুষগুলো বোধ হয় খুব আড্ডাবাজ। মনে হচ্ছে, সারা শহরে আড্ডা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো বিষয় নেই।

জাহেদার গা থেকে মাঝে মাঝে একটা মিষ্টি গাঢ় ঘ্রাণ দিচ্ছে।

অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল ওরা। তারপর সিগারেট কিনে শোনা সেই রেস্তোরাঁ খুঁজে বের করল। বড় রাস্তার ওপর একটা সরু প্যাসেজের মুখ। সেটা দিয়ে ঢুকলে ডান দিকে একটা বড় ঘর। জানোলা দিয়ে চোখে পড়ল নীল চুনকাম করা দেওয়াল। রেডিও বাজছে রংপুর ষ্টেশনে। এককোণে চারজন তরুণ চায়ের কাপ নিয়ে জটলা করছে। তাদের ঢুকতে দেখে হঠাৎ সব চুপ হয়ে গেল। মাথা নামিয়ে নিল সব এক সঙ্গে। তারপর একে একে মাথা তুলে একেবারে সরাসরি তাকিয়ে তাদের দেখতে লাগল।

মজা লাগল বাবরের। বলল, ভাগ্যিস এরা টিভি দেখতে পায় না এখানে। এর জন্যে ঢাকায় কোথাও বসতে পারি না।

আসবার সময় আরিচা ফেরিতে কয়েকজন আপনাকে চিনেছিল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, আপনার নাম বলছিল।

খেয়াল করিনি। কী খাবে? কিছুই নেই। মফঃস্বল তো কিছু পাবে না। বিরিয়ানি খাও। এ ছাড়া–

যা আপনার খুশি বলুন। আমার একেবারে ক্ষিদে নেই।

আসলে এখন দরকার ছিল গরম সুপ। তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

হ্যাঁ। ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ।

চল, খেয়েই বাংলোয় যাব।

খেতে খেতে হঠাৎ জাহেদা একবার বলল, শারমিন আর পাপ্পু খুব আরাম করে বিছানায় শুয়ে আছে।

তোমার রুমমেট?

হ্যাঁ, ওরা কি স্বপ্নেও জানে আমি এখন এখানে?

কোনোদিন জানবেও না। বাবর প্রশস্ত হেসে বলল।

তখন কী যেন কথাটা বলছিলেন? অতীত আর ভবিষ্যতের মাঝখানে, কী যেন?

অতীত আর ভবিষ্যতে মাঝখানে তুমি আছ, যেখানে আগেও ছিলে, পরেও থাকবে। অর্থাৎ সব সময়ই বর্তমান, জাহেদা। বর্তমানটাই আমরা একমাত্র চাক্ষুস করি। অসংখ্য বর্তমানের একটি মালা এই জীবন।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাটতে ওরা সেই মন্দিরের কাছে এলো যেখানে কাঁসর বাজছিল। এখন সেখানে গান হচ্ছে। একটা তালপাতার মত লোক, মাথায় একরাশ কোঁকড়ান বাবরি, পরনে হলুদ ধুতি, গায়ে লাল ছোপান গেঞ্জি, কপালে চন্দনের ফোঁটা দুহাত তুলে গান করছে। চারদিকে মেয়ে পুরুষে গোল হয়ে ভক্তিমন্ত্র মনে বসে আছে। জাহেদা অবাক হয়ে শুনতে লাগল। তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল সে। লোকটা বলছে। —

তোমার স্বর্ণসীতা কি কথা বলতে পারে? না। সে কি চোখে দেখতে পারে? না, তাও পারে না। সে কি কানে শুনতে পায়? না, সে কানেও শুনতে পায় না। সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গে একটা রোল পড়ল। লোকটা দুহাত তুলে ঘুরতে ঘুরতে এবার সুরে গেয়ে উঠল, তবে চাই না, চাই না।

আমি স্বর্ণসীতা চাই না। স্বর্ণসীতা কী, জিগ্যেস করবার জন্যে জাহেদা ফিরে তাকাতেই টের পেল বাবর তার একেবারে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণে শরীরের পেছনে যে উষ্ণতা তাকে জড়িয়েছিল তা বাবরের। জিগ্যেস করা আর হলো না। কেবল বলল, চলুন।

চল।

নিঃশব্দে পায়ে হেঁটে বন্ধ হয়ে যাওয়া দোকানপাটের, থমথমে দরোজাগুলোর সমুখ দিয়ে তারা বাংলোয় এসে পৌঁছুল। আবার সেই মাঠের মধ্য নালাটার কাছে এসে বাবর তার হাত ধরল। হাত ধরে পার করে দিল তাকে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

জাহেদা বলল, একটা বাতি নেই।

বাবর কিছু বলল না। শুধু হাসল। ঠিক হাসিও নয়, হাসির একটা তরঙ্গ মাত্র। কেমন একটা উদ্বেগ তার ভেতরে এখন হঠাৎ বড় হচ্ছে, কেন হচ্ছে তা বুঝতে পারছে না।

জাহেদাই বলে চলল, আমাদের হোস্টেলেও এ রকম হয়। হঠাৎ হঠাৎ চুরি হয়ে যায়। কে চুরি করে কে জানে?

নিঃশব্দে ঘরের দরোজা খুলল বাবর। জাহেদা কথা বলেই চলেছে।

একদিন অন্ধকারে প্রায় গড়িয়ে পড়েছিলাম সিঁড়িতে। বাঁ পায়ের গোঁড়ালিটা মচকে গিয়েছিল। সারারাত কী ব্যথা! পাপ্পু তেল মালিশ করে দিয়েছিল। ও জানেন, খুব সেবার হাত ওর। কার কোথায় মাথা ধরেছে, কার গা গরম, কে তরকারি পছন্দ নয় বলে খায়নি, কার বাড়ির চিঠি পেয়ে মন খারাপ-সব পাপ্পু সামলাচ্ছে।

জাহেদা কথা বলছে আর বাবর ওদিকে কখনো একটু হাসছে, কখনো তাই নাকি বলছে আর বিছানা ঠিকঠাক করছে চটপটে দুহাতে। একবার শুধু ছোট্ট করে বলল, পুলওভারটা খুলে বস। কম্বলের নিচে চাদর দিয়ে দিয়েছি।

জাহেদা পুলওভার খুলতে খুলতে বাধ্য বিনীত ভঙ্গিতে কম্বলের তলায় পা চালান করে চুলে একটা ঝাড়া দিয়ে ঠেস দিয়ে বসল। আর এই সর্বক্ষণ বলে চলল কথা।

পাপ্পুকে তো দেখেননি? একদিন আলাপ করিয়ে দেব। রাঙ্গামাটির মেয়ে। তেমনি চ্যাপ্টা নাক, চওড়া মুখ, হলুদ রং; কিন্তু ভারি মিষ্টি। জানেন ওরা বৌদ্ধ। আমাদের সবাইকে বলেছে ওদের ওয়াটার ফেষ্টিভ্যাল হয়, এবার নিয়ে যাবে দেখাতে। খুব নাকি মজা হয়। ভরা পূর্ণিমা রাতে নাচ হয়, গান হয় পুজো হয়। আচ্ছা, বৌদ্ধারা কি হিন্দু?

না।

তাহলে ওরা পুজো করে যে। একটু অন্যমনস্ক দেখাল জাহেদাকে। তারপর হেসে আবার তুবড়ি ফোঁটাতে লাগল, আমার কিন্তু ভালই লাগে। আমি অবশ্য কোনোদিন পুজো দেখিনি। আমার বাবা জানেন, আমাকে ইংরেজি পড়িয়েছে বটে বিস্তু ভারি গোঁড়া। আমাদের কোথাও নিয়ে যায়নি। কোনো একটা কিছু করতে গেলেই হা হাঁ করে ওঠেন। তুলার মুখে সর্বক্ষণ গোল গেল লেগে আছে। পারেন তো ছেলেমেয়েকে একেবারে ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখেন। একবার জানেন কী হলো–আজকাল তো ওড়না পরে না, শুধু কামিজ পাজামা। তাই পরে বাড়ি গেছি, বাবার তো চক্ষুস্থির। রাগে হার্টফেল করেন আর

কী? মাকে বললেন, মেয়ের জন্ম দিয়েছ, আদব কায়দা নামাজ রোজা শেখাতে পারনি? জান, ছেলেমেয়ের দোষে বাপ-মাকেও দোজখে যেতে হয়? আচ্ছা বলুন তো, যেতে হয় নাকি? বাবর সেই কখন, আরাম চেয়ারটা টেনে, তার ওপর গা এলিয়ে বসেছে। একদৃষ্টি তাকিয়ে জাহেদার দিকে। জাহেদার একটা কথাও কানে যাচ্ছে না তার; কেবল জাহেদার জীবন্ত, বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার দূরান্ত মুখখানা সমস্ত অস্তিত্ব, বস্তু এবং বিশ্ব জুড়ে আছে। জাহেদা এবার থামতেই কুয়াশার মত হাসল বাবর। জাহেদাও হঠাৎ চুপ হয়ে গিয়ে নিস্পলক তাকিয়ে রইল তার দিকে। একটি যুগ যেন অতিবাহিত হয়ে গেল। সে নিজেই মনে করতে পারল না। এতক্ষণ একতাড়া কী বলছিল সে। ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে হঠাৎ সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করল। বলল, কম্বল একটা যে! কিম্বল? বাবর হাসিতে মধুর হয়ে উঠল। উত্তর দিল, মফঃস্বলের ডাকবাংলো কম্বল এদের একটাই আছে। ঢাকা থেকে আনা উচিত ছিল। কে জানে। এখানে এত শীত।

এত শীত কেন এখানে?

হিমালয়ের কাছে যে। এইতো, চোখ তুলে তাকালেই হিমালয়।

আপনার শীত করবে না? জাহেদা উদ্বিগ্ন চোখে প্রশ্ন করল।

নাহ। চলে যাবে। রাত অনেক হয়েছে তুমি ঘুমোও। সারাদিন পথ চলে ক্লান্ত তুমি।

বলে সে জাহেদার কাছে এসে তার বুক পর্যন্ত কম্বল টেনে দিল গুঁজে দিল, চারপাশে। যখন ওপাশে গুঁজে দিচ্ছিল তখন তোরণের মত বাঁকা তার দেহের নিচে ঢাকা পড়ে গেল জাহেদা। সোজা হতেই দেখল জাহেদা বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েছে ততক্ষণে। কিন্তু চোখ খোলা। কাজল একজোড়া চোখ টলমল করছে। চোখের শাদায় শিরাগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার। আর খাড়া নাকের নিচে সোনালি রোম, যেন কিছু ফুলের রেণু লেগে আছে ওখানে। শিরশির করে উঠল বাবরের শরীর। সে আবার আরাম চেয়ারে এসে বসল। বলল, ঘুমোও।

আপনি?

আমি কিছুক্ষণ বসে থাকব।

বলে বাবর আরো একটা সিগারেট ধরাল। জাহেদা কী ভেবে একটু পর চোখ বুজল। তখন একেবারে অন্য একটা মেয়ে বলে মনে হলো। সে একটু সোজা হয়ে বসতেই চেয়ারে ক্যাচ করে একটা শব্দ উঠল। চোখ খুলল জাহেদা। তাড়াক করে উঠে বসে কম্বলটা পা পর্যন্ত ঠেলে দিয়ে বলল, এ হতে পারে না। আপনি কী গায়ে দেবেন? তাকে উঠতে দেখে বাবরও নিজের অজান্তেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। এখন সে হেসে ফেলে বলল, আমার জন্যে ভাবতে হবে না। তুমি ঘুমাও তো।

না।

দ্যাখ, দুষ্টুমি করলে কিন্তু আমি বকব।

আমার ঘুম আসবে না।

আসবে, চেষ্টা করলেই আসবে। শুয়ে পড়।

জাহেদা কম্বলের দিকে চোখ ফেলে চুপ করে রইল।

কথা শুনতে হয় জাহেদা। তুমি ঘুমোও। আমার তেমন কিছু ঠাণ্ডা লাগছে না। সোয়েটার আছে। একটা চাদর এই যে। এতেই চলে যাবে।

জাহেদা একবার তার দিকে তাকিয়ে আবার তেমনি গোয়ারের মত বসে রইল। বাবর দাঁড়িয়ে আছে বলে জাহেদাকে ওপর থেকে দেখছে। চিবুকটা সরু লাগছে। কোমল একটা ত্রিভুজের মত মনে হচ্ছে। ত্রিভুজটার খাড়া নিচে তার দুই ঊরুর সংযোগ বিন্দু। সেটা চোখে পড়তেই বাবরের আরেকবার মনে হলো, কী দীর্ঘ, কী ক্লান্তিকর এইসব প্রস্তুতি। মুখে কিন্তু অন্য রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল সে। এক টুকরো বাঁকা হাসি। ধাক্কা দিয়ে হাসল সে একটু। হাসতে হাসতে বলল, বোকা মেয়ে, এক কম্বলে দুজনের হয়? নাও, শুয়ে পড় দেখি।

হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল জাহেদা। সুবোধ মেয়ের মত নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল পাশ ফিরে; পা থেকে মাথা পর্যন্ত কম্বল টেনে দিল নিজেই। নীল জামা পাজামা, ফোলান লালচে চুল,

পরিচ্ছন্ন ঘাড়, সব ঢাকা পড়ে তাকে দেখাল একটা বৃহৎ জান্তব্য পোস্টাল পার্সেলের মত।

বাবর ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ। হঠাৎ করে মাথার ভেতরে সব শূন্য হয়ে গেছে যেন। অনিশ্চিতভাবে এদিক ওদিক সে তাকাল। তারপর আস্তে আস্তে শরীরের মধ্যে টের পেতে শুরু করল একটা অস্থির স্রোত সরু হতে হতে নিচের দিকে নেমে আসছে। যতই নামছে জ্বালা বাড়ছে তত। সেতারে ঝালার মত তীব্র সেই অনুভূতি। বাবর নাভির নিচে হাত রাখল, চেপে ধরল এবং তখন তার মনে পড়ল। অনেকক্ষণ বাথরুমে যাওয়া হয়নি। এখন সেটা ফেটে বেরুতে চাইছে।

সন্তর্পণে বাথরুমের দরোজা খুলে ঢুকল সে। ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল সন্তর্পণে। স্যাঁতস্যাঁতে হলুদ দেওয়াল যেন চেপে এগিয়ে এলো চারদিকে। শীত করতে লাগল হঠাৎ।

নিঃশেষে ভারমুক্ত হলো বাবর। টোকা দিয়ে শেষ বিন্দুটা পর্যন্ত ঝরিয়ে দিল। পানি দিতেই ছ্যাত করে উঠল ঠাণ্ডাটা। প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল বাবর। নিজেকে সামলে নিল। দেখল কেমন দ্রুত গুটিয়ে আসছে ওটা; রং শ্যামল থেকে কালো, কালো থেকে ঘন কালো হয়ে গেল, এখন তাকে দেখাল কোনো পুরনো বাড়ির সদর দরোজায় বেরিয়ে পড়া মড়চে ধরা বড় একটা ইস্কুরুপের মত। জাহেদার আকাশ-নীল তোয়ালে দিয়ে আবৃত করে মুছল সে। তোয়ালের নরম সুতোয় শুষে নিল সমস্ত সিক্ততা। এখন সেটাকে দেখে বাবরের মনে হলো মিটিমিটি হাসছে।

তারপর আয়নায় আবার ভাল করে মুখ দেখে, মাথার চুল টেনে টাক ভাল করে একপ্রস্থ ঢেকে বেরিয়ে এল আগের মতই সন্তর্পণে। দরোজা লাগিয়ে ঘুরে দেখে জাহেদা এখন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, তেমনি কম্বলে ঢাকা, নিতম্বের নিচে দুপায়ের ফাঁকে সৃষ্টি হয়েছে একটা দীর্ঘ উপত্যকা, একগুচ্ছ চুল বেরিয়ে আছে বালিশে।

বাবর টের পেল, জাহেদা এখনো ঘুমোয়নি।

সে এবারে তার নিজের বিছানায় বসল, সাবধানে ধীরে, ধীরে। মাত্র একাগজ দূরে জাহেদার বিছানা। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। কী অসীম দূরত্ব। কিম্বা কাছেই, মাঝে একটি স্তব্ধতার পাহাড়। বাবর কান খাড়া করে বাইরের শব্দ শোনার চেষ্টা করল। তখন কানে এলো দূরে কোথাও কারা কথা বলছে, একটা রিকশা টুনটুন করে চলে গেল, কুকুর ডাকছে দীর্ঘস্বরে। জাহেদা পড়ে আছে, যেন একটা মৃতদেহ। যেন এতটুকু প্রাণের লক্ষণ নেই তার আচ্ছাদিত দেহে। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে রইল বাবর। দ্রুত নিঃশ্বাস পড়তে লাগল তার। এত শব্দ হতে লাগল যেন জাহেদা শুনতে পাবে। প্রাণ পণে সে নিঃশ্বাস শাসন করতে লাগল। ফলে দেহের আধোভাগে উত্তাপ আরো দ্বিগুণ দ্রুততায় বৃদ্ধি পেতে লাগল তার। পায়ের উপর পা দিয়ে বসল সে।

হাঃ ফিরোজ মাজমাদার বলে কিনা, ভালবাসা না হলে তার জমে না। আজ বিকেলে রংপুরের পথে জাহেদাকে সে যা বলেছে তা শোনা উচিত ছিল তার। নিজেই চমৎকৃত

হলো ভেবে-ভালবাসাকে কাঁঠাল বলেছে। কথাটা তখনি মাথায় এসেছিল। এর চেয়ে চমৎকার করে আর দেখান যেন না ভালবাসার আকাশ-প্রমাণ মিথ্যেটাকে। হাঃ।

তবে হ্যাঁ, আমি বাছাই করি, আমার পছন্দ-অপছন্দ আছে। সবার সঙ্গেই শুতে হবে নাকি? বাজারের সব জামা কি পছন্দ হয় আমার? দশটার মধ্যে একটা কিনি। তার কাপড় পছন্দ হতে হবে, বুনোন ভাল হওয়া চাই, রং পছন্দ হওয়া চাই, ছাঁট ভাল লাগা চাই। তবে তো? এমন রংয়েরও জামা আছে বিনি পয়সায় দিলেও আমি ছুঁয়ে দেখব না। মাজমাদারকে এক সময় বলবে সে। দেখি সিঙ্গি মাছটা জবাব কী দেয়?

আরো একটু এগিয়ে বসল বাবর। কোনোমতে কেবল পেছনটা তার ছয়ে রইল খাটোয় প্রান্ত। সে জানে, একটু পর ওখানে একটা গভীর সরল রেখা পড়ে যাবে। অবশ হয়ে আসবে। শেষে ঝিনঝিন করে উঠবে। তবু ঐ কষ্টকর ভঙ্গিতে বসে রইল সে, বসে রইল জাহেদার উপুড় হয়ে থাকা অস্তিত্বের দিকে অপলক তাকিয়ে।

হঠাৎ আরো একটা তুলনা মাথায় এলো তার। আদিম কালে মানুষ যখন অরণ্যচারী ছিল, পাথরের বল্লম নিয়ে শিকার করত, তখন কী তার একপাল শ্বাপদের মধ্যে এটিকে পছন্দ হয়ে যেত না?–যাকে নিজ হাতে হত্যা করতে ইচ্ছে হয়?

সে যদি গল্প লিখতে জানত, তাহলে চমৎকার একটি গল্প লিখিত সে। আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে। হিমালয়ের পাদদেশে অরণ্যের এক প্রান্তে বাস করত এক গোষ্ঠী। তার তরুণ এক সদস্য একদিন পিপাসার্ত হয়ে ঝিলে গিয়েছিল। উপুড় হয়ে

জন্তুর মত জলপান করছিল সে। তৃপ্ত হয়ে মুখ তুলতেই দেখে ওপারে দপদপে একটা আগুন স্থির হয়ে আছে।

বাঘ! তরুণ একটি বিদ্যুতের তরঙ্গ।

মুহূর্তে সে নলখাগড়ার ভেতরে অন্তর্হিত হলো। কিন্তু তাকে আর ভুলতে পারল না সে। তার দিনের আলো আর রাতের অন্ধকার জুড়ে রইল সেই বাঘের দুঃসহ বুকভাঙ্গা সৌন্দর্য। গোষ্ঠীর মধ্যে নিঃসঙ্গ ঘুরে বেড়ায়। উৎসবের রাতে সে দূরে নির্জনে পাথরের চাকতির ওপর বসে থাকে। সূর্য ওঠার আগে চুপিচুপি বল্লম হাতে অধীর হৃদয়ে বেরিয়ে পড়ে। প্রতি বনে, প্রতি ঝিলের কিনারে, রৌদ্র ছায়ায়, শরবনে সে সন্ধান করে বাঘটাকে। গোষ্ঠী প্রধান তার সুদূরে নিবদ্ধ চোখ দেখে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন, কিন্তু কোনো উত্তর পান না। সবার সঙ্গে থেকেও সে আলাদা। যেন সে একটা ভিন্ন সময়ের ভিন্ন জগতের মানুষ।

কিন্তু পরিহাস এই মানুষটা জানে না প্রথম যেদিন বাঘটা তাকে দেখেছে সেও তার তাকে ভুলতে পারেনি। ভুলতে পারেনি ঝিলের ওপর উপুড় হয়ে পড়া পেশির স্থির তরঙ্গে গরীয়ান তার প্রশস্ত কাল কাঁধ। যখন চোখাচোখি হয়েছিল তখন যে তত্ত্বরিত প্রবাহিত হয়েছিল তার অভিভাব যেন মাতৃযোনী থেকে নির্গমনের মত। জন্তুটাও সেই তরুণের সন্ধানে বারবার এসেছে ঝিলের কিনারে, রাতের অন্ধকারে সাহস করে গোষ্ঠীর আগুন জ্বালা বাসস্থান পর্যন্ত গিয়েছে। আকাশে মুখ তুলে ঘ্রাণ নিয়েছে। বুনো হলুদ

ফুলের মত কান দুটো খাড়া করে সেই তরুণের মুখনিঃসৃত কোনো শব্দ শুনতে চেষ্টা করেছে সে।

তারপর একদিন পূর্ণিমা রাতে যখন সুন্দরী রমণীর গাত্রবর্ণের মত জোছনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে চারদিক, উত্তরে হিমালয় যখন গভীর তন্ময় একটি মৃদুহাস্য হয়ে আছে, ঝিলের জল যখন তীব্র আবেগে কুঞ্চিত হয়ে গিয়েছে, তখন তাদের সাক্ষাৎ হলো। এবড়ো থেবেড়ো জমির ওপর, চন্দ্রতারকাখচিত রঙ্গমঞ্চে, দুধারে সুউচ্চ বৃক্ষের উইংস দিয়ে দুজনে বেরিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল। নদীর উৎস মুখে। যেমন অবিরাম একটা তান শোনা যায় তেমনি একটা ধ্বনি সমাবেশ শুনতে পেল তারা উভয়ে। তাদের চোখগুলো এককেটি ক্ষুদ্র তীব্র চাদ হয়ে গেল। বল্লম তুলল তরুণ। জন্তুটা একবার মুখব্যাদান করল— হিংসায়, ক্রোধে সে এ রকম করে থাকে। কিন্তু আজ সে আবেগ নয়, সম্পূর্ণ অন্য কিছু যা তার পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। সে দৃপ্ত পিঠটাকে বাঁকিয়ে মাটি স্পর্শ করল প্রায়, যেমন সকল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মাটি স্পর্শ করে মানুষকে সে নিতে দেখেছে। তারপর একটি মাত্র মুহূর্ত। গোষ্ঠীর অনির্বাণ আগুন হঠাৎ একেক সময় যেমন লাফিয়ে ওঠে, তেমনি।

উষ্ণ প্রস্রবণের মত উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল রক্ত।

দক্ষিণ অভিমুখে বহমান একটি নদীর মত নির্গত হতে লাগল তরুণের অশ্রু।

প্রভাতে গোষ্ঠীর সবাই আবিষ্কার করল উভয়ের পায়ের ছাপ। আর কোনো চিহ্ন নেই, অবশিষ্ট নেই, এমনকি কোনো সংকেতও নেই। দলের মধ্যে শুভ্রকেশ যে বৃদ্ধ ছন্দাবেদ্ধ ভাব প্রকাশে সক্ষম, তিনি আকাশবিদ্ধ করা একটি গাছের দুধশাদা কাণ্ডে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে, মুদিত চোখে, হাত নিবদ্ধ করে একটি গাথা রচনা করলেন। তিনি আমাদের থেকে উন্নীত হলেন। তাঁর দেহ দেবতার মত জ্যোতির্ময়। কুঙ্কুমের টিপ শোভিত চির তরুণ। ব্যাঘ তার বর্তমান রূপ। এসো প্রণিপাত করি।

ঢাকায় ফিরে আজহারকে সে গল্পটা বলবে। অনেকদিন আজহার কিছু লেখে না। তার শেষ বইটা খুব খারাপ হয়েছিল। সেদিন টেলিভিশনে একটা নাটক হলো তার, এমন তৃতীয় শ্রেণীর নাটক আর হয়েছে বলে মনে পড়ে না। তবু লোকটা ভাল। লেখার জন্য সর্বক্ষণ আকুলি-বিকুলি করে। লেগে আছে, এইটাই বড় কথা। তাকে গল্পটা বলবে বাবর।

নিজের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল সে। কখন যে পোশাক পালটে পাজামা পরে নিয়েছে মনেও পড়ল না তার। গল্পটা তাকে একবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এখন ঘোরটা কেটে যেতেই আবার তার সমস্ত ভাবনা, উদ্যম, দৃষ্টি জাহেদার দিকে ধাবিত হলো। এক পা এগিয়ে বালিশের ওপর লুটিয়ে থাকা তার চুলের গুচ্ছ স্পর্শ করল সে। কান পেতে চেষ্টা করল জাহেদার নিঃশ্বাস শুনতে। কিন্তু ভারি কম্বলের ভেতর থেকে কিছুই শোনা গেল না। তখন সে ডান হাত রাখল। জাহেদার নিতম্বের উপর। প্রথমে আলতো করে তারপর ধীরে ধীরে চাপ বাড়াল। কোমল মাংসের মধ্যে বসে গেল তার করতল। কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল না জাহেদার। সে তখন ফিসফিস করে

নাম ধরে ডাকল। একবার দুবার। কোনো সাড়া এল না। আবার সে বলল বাতি নেভানোর কথা। শব্দগুলো গুঞ্জন করে উঠে থেমে গেল। তেমনি লম্বমান নিষ্পন্দ হয়ে পড়ে রইল ব্রাউন কম্বলের অতলে জাহেদার দেহ। ঘড়ি দেখল বাবর। রাত এখন বারোটা উনিশ। বাইরে থেকে আবে কোনো শব্দ আসছে না। বাতাসের একটানা চুলঝারার মত একটা ক্ষীণ ধ্বনিমাত্র, আর কিছু নয়।

১৪. বাতি নিভিয়ে

হাত ফিরিয়ে আনল বাবর। সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠল সে। বাতি নিভিয়ে হাতরে হাতরে জাহেদার খাটের কাছে এসে দাঁড়াল। বসল। বসে রইল। কিছুক্ষণ। তারপর সন্তর্পণে লম্বা হয়ে শুল তার পাশে। বাবরের বাবা মারা গেলেন তার তিনদিন আগে এক রাতে ঘুমিয়েছিল সে। হঠাৎ স্বপ্ন কী স্বপ্নের মত বাস্তবে সে দেখতে পেয়েছিল ঘন কালো কাপড়ে টানটান আবৃত এক পুরুষকে। লোকটা তার পাশে এসে বসল। অপেক্ষা করল। তারপর কাৎ হলো। ধীরে ধীরে পা ছড়িয়ে একটা লাশের মত নিজেকে বিস্তৃত করল। অনেকক্ষণ পর একটা পা তুলে দিল বাবরের গায়ে। বাবর তখন কিছু বলছে না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছে। লোকটা এবার তার দিকে পাশ ফিরল। আরো এক যুগ পরে জড়িয়ে ধরল। তাকে একটা কালো আলিঙ্গনে, তখন চিৎকার করে উঠল বাবর। তার অসুস্থ বাবা স্বপ্নটা শুনে পরদিন সকালেই মৌলবী ডেকে তওবা করলেন। মারা গেলেন তিন দিনের দিন।

কিন্তু আমি এখন জ্যোতির্ময়। জীবনের আলোয় উদ্ভাসিত। আমার স্বচ্ছ শরীরে দৃষ্টি কর।

বাবর পাশ ফিরল জাহেদার দিকে। কম্বলের একটা প্রান্ত তুলে প্রথমে বাঁ পায়ের আঙুল ঢোকাল, তারপর গোঁড়ালি পর্যন্ত, অবশেষে সম্পূর্ণ উরুটা। উষ্ণতায় শরীরের ঐ অংশটা যেন অন্য কারো হয়ে গেল। বাবর এবার একবারে ডান পা ঢুকিয়ে দিয়ে নাভি পর্যন্ত টেনে দিল কম্বলটা।

সে একটা সিগারেটের তৃষ্ণা অনুভব করতে লাগল। কিন্তু না, থাক।

একেবারে প্রথম বারের মত লাগছে। এ-রকম খুব কম মনে হয় তার। বোধহয় আজ সারাদিন ধরে ভেবেছে, তাই এমন মনে হচ্ছে।

সমস্ত শরীর তার সাহসে, বাসনায় এখন উষ্ণ স্ফীত হয়ে উঠেছে। সম্পূর্ণ দেহটা সে কম্বলের তলায় নিয়ে গেল। তারপর সামান্য একটু সঞ্চালনে সংলগ্ন হলো জাহেদার। সঙ্গে সঙ্গে সুবাসিত নিঃশ্বাসে তৈরি, মধুর গ্রীষ্ম যেখানে বারো মাস, এমন একটা পৃথিবীতে পৌঁছে গেল সে। জাহেদার পিঠে হাত রাখল। জায়গাটা পছন্দ হল না। হাতটাকে আস্তে আস্তে নাবিয়ে আনল আরো নিচে, দুই পাহাড়ে বেষ্টন করা ব্রীজের মত স্থাপিত হল জাহেদার নিতম্বের ওপর।

মুখটাকে আরো কাছে নিয়ে গেল সে। প্রায় সেঁদিয়ে গেল চুলের অজস্র টিকার-টেপের প্রপাতে। সেই প্রপাত পার হয়ে জাহেদার তন্দুর থেকে সদ্য টানা রুটির মত উষ্ণ গালে গাল রাখল এবং সেখানেও স্থির হলো না। মাথা তুলে জাহেদার মুখের ওপর ঝুঁকে রইল সে একটা কনুইয়ে ভর করে, যেন রবি বর্মার ছবিতে বালকৃষ্ণেরা ঘুমন্ত মুখের ওপর নাগরূপী ঈশ্বর। জাহেদার নিঃশ্বাস তার সমস্ত মুখ পুড়িয়ে দিতে লাগল সকাল বেলার প্রথম সূর্যের মত। সে আলতো করে একটা চুমু দিল তার কপালে, অবিকল বলির আগে ছাগলের কপালে যেমন করে পরানো হয় রক্ত সিঁদুরের ফোঁটা।

আস্তে আস্তে উপুড় থেকে চিৎ করে দিল জাহেদাকে। জাহেদা দুদিকে দুহাত বিছিয়ে শিথিল দেহে পড়ে রইল। একতালে বইতে লাগল তার নিঃশ্বাস। এখনো সে ঘুমিয়ে আছে। এখনো সে জানে না। সে আর একা নয়। এখন সে হয়ত একটা স্বপ্ন দেখছে। বাবর তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখল। শিউরে উঠল জাহেদা। সে ঠোঁট চুষে ঢোক গিলে আবার প্রশান্ত হল। তখন আরেকটা চুমু দিল তাকে বাবর। স্বলিত কণ্ঠে বলল, তুমি ঘুমোও।

নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল তার। হাঁপানি রোগীর মত মনে হতে লাগল। বারবার মুখ হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে হচ্ছে। এটা খুব খারাপ লক্ষণ। ঢাকায় ফিরেই ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। রক্তচাপের যে উপসর্গগুলো প্রায় দেখা দিচ্ছে বলে ডাক্তার বলছিলেন তার জন্যে ওষুধ-বিষুধ বাছবিচার তো নিয়ত করছে। তবু এ রকম হচ্ছে কেন? লতিফার সঙ্গে সে রাতেও ঠিক এই রকম বোধ হচ্ছিল। না, এত দ্রুত জরার শিকার হতে চায় না। ওষুধে কিছু না হোক, ইচ্ছে দিয়ে সে ঠেকিয়ে রাখবে। সে এখন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে নিঃশ্বাস স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করল।

আশ্চর্য, ফল হলো। স্বচ্ছন্দ হয়ে এলো নিঃশ্বাস।

বোবর জাহেদাকে আলতো করে পাশ ফিরিয়ে পিঠে বোতাম সন্ধান করল। হাতে ঠেকল জিপের ছোট লকলকে জিভেটা। আস্তে আস্তে নিচের দিকে টান দিল সে। কোমর পর্যন্ত খুলে গেল। তখন আবার তাকে চিৎ করে প্রথমে জামাটা নিচ দিয়ে খোলার চেষ্টা করল, পরে ওপর দিয়ে দেখল হলো না। কোমল অথচ গুরুভার মনে হলো জাহেদার হাত

দুটো। তখন জামাটা ঠেলে গলা পর্যন্ত তুলে দিয়ে একটা হাতে বুকের ছোট জামাটা ঠেলে দিল। ঢ়িলে করে পরেছে জাহেদা।

এতটুকু কষ্ট হলো না। কাপড়ের পেয়ালা দুটোর ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরুল স্তন। বাবর প্রথমে ঠোঁট দিয়ে একটিতে স্পর্শ করল আলতোভাবে। তারপর আরেকটার কথা মনে পড়ল। তখন সেটাও স্পর্শ করল সে। তারপর আবার প্রথমটা। যেন দুটি ছোট্ট মেয়েকে সে পছন্দ করে একই রকম। কখনো একে কখনো ওকে আদর করছে সে। প্রথমে একেকজনকে অনেকক্ষণ করে। তারপর কমে আসতে লাগল সময়। কমতে কমতে চলচ্চিত্রের মত দ্রুতগতিতে এটা ওটা এটা ওটা করতে লাগল। এবং পরিণামে হঠাৎ দুই ঠোঁটে দৃঢ় নিবদ্ধ করে মুখ গুঁজে দিল। যেন এক শিশু মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে খেই হারিয়ে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হঠাৎ। এবং সেই শিশুর মত অবিকল একটা ক্রন্দনধ্বনি, কিন্তু ক্রন্দন নয়, তার কণ্ঠ দিয়ে বেরুতে লাগল। বুজে থাকা চোখের ভেতরে উজ্জ্বল কতগুলো বর্ণের প্রলেপ ঘনঘন বদলাতে লাগল অবিরাম। কালো, লাল, নীল, বেগুনি আবার লাল। কখনো লালের মধ্যে ছিটে পড়তে লাগল। গাঢ় নীল বিন্দুর। ঘুরতে লাগল। পরীক্ষণে নীল বিন্দুগুলো মুহূর্তে লাল হয়ে গেল এবং লাল পটভূমি কালো। অভিভূতের মত মুখ তুলে ঠোঁট দিয়ে সন্ধান করতে লাগল জাহেদার চোখ, ক্যানের লতি, চিবুকের কর্নিশ, গ্রীবার পেছনে ছোট ছোট সোনালি রোমের সীমানা, যেন একটা বুলডোজারের প্রশস্ত লেভেলার-ফলার মত সচল মাতাল তার মুখ এবড়ো থেবেড়ো মাঠে, যেখানে শহরের পত্তন হবে। সে তার এবং আবহমান কাল মানুষের রক্তের স্বভাব্যবশত অতি সুন্দর ব্যক্তিগত কণ্ঠে রাসের মেলায় কেনা পুতুলের মত— যার

ভেতর ফাঁপা এবং পেছনটা রং করা হয়নি– শব্দগুলো উচ্চারণ করতে লাগল। সে জানে এ সত্য নয়। তবু নাটকের সংলাপ। এইই, তাই বলে বলল, তন্ময় অভিনেতার মত।

সে জাহেদার কানের লতিতে ঠোঁট রেখে বলতে লাগল, আমি তোমাকে ভালবাসি জাহেদা। জাহেদা। জাহেদা। জাহেদা। তোমাকে ভালবাসি। তোমার জন্যে আমি মরতে পারি। আমি জীবন জানি না, মৃত্যু দেখিনি। আমি তোমাকে জানি তোমাকে দেখেছি জাহেদা। আমি তোমাকে ভালবাসি। ও জাহেদা, ভালবাসি। জাহেদা হেডা, হেডা, আমার হেডা।

বলতে বলতে এমন একটা গুঞ্জনের সৃষ্টি হলো যে তার অভিভাব তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলল। সে কিছুক্ষণ নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল জাহেদার গালে মুখ রেখে। তারপর হঠাৎ সচল হয়ে দুই ঠোঁটে ব্যগ্রতার সঙ্গে সবুজ একটা অশ্বথ পাতার মত স্তনমুখ তুলে নিল। এবং ক্রমশ টের পেতে লাগল কোমলতার ভেতর থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা এক অপরূপ কাঠিন্য। আবেগের একটি ক্ষুদ্র মিনার তার মুখের মধ্যে এখন, ঋজু, অনমনীয়, উদ্ধত, তার তালুর আকাশের নিচে। বৃষ্টির মত স্নেহে সে সিক্ত করে দিতে লাগল তা। আর করতল বিস্তৃত করে, পাঁচ আঙুল প্রসারিত করে দুহাতে জাহেদার কাঁধ থেকে পাঁজরের পাশ দিয়ে নিতম্ব দিয়ে নেমে হাঁটু পর্যন্ত বারবার সে ভ্রমণ করতে লাগল, যেন কুমারী কোনো দ্বীপে সে একজন আবিষ্কারকের মত প্রতিটি বাঁক, চড়াই, উৎরাই হেঁটে হেঁটে স্মৃতির অন্তর্গত করছে।

আহ।

চমকে উঠল বাবার। জাহেদার কণ্ঠ থেকে নির্গত ঐ ধ্বনি কত পরিচিত, কতবার সে শুনেছে অন্য কণ্ঠে, অন্য আধারে, তবু তাকে বিস্মিত করল, অভিভূত করল এবং আরো ব্যাকুল করে তুলল। সে টের পেল জাহেদা একটা হাত নাভির নিচে এনে রাখল। বাবর আর তার সংলগ্ন শরীরের ভেতরে একরোখার মত প্রবেশ করে হাতটা মুঠিবদ্ধ হয়ে উঠল। আঙুলের কঠিন পিরামিড বসে গেল বাবরের পেটে। মৃদু যন্ত্রণা এবং অস্বস্তি করে উঠল ওখানে। বাবর পিরামিডাটা ভাঙ্গতে চেষ্টা করল। পারল না। সরিয়ে দিতে চাইল, অনড় হয়ে রইল। তখন শক্তি প্রয়োগ করল। তাতেও কাজ হলো না। বরং আরো উঁচু হয়ে উঠল পিরামিডটা, আরো কঠিন হয়ে গেল। বাবর তখন দুহাতে জাহেদার মুখ ঘোমটার মত ঘিরে তার শরীরের ওপর নিজের শরীর টেনে কাছে এলো। এক আঁজলা নাকের ডগা, ঠোঁট, চিবুক পান করে কানের কাছে মুখ রেখে বলল, ও জাহেদা, হেডা, হেডা, হেডা আমাকে ধরে রাখ।

এবং সঙ্গে সঙ্গে কানের লতি দংশন করল সে তার, স্বর্ণকার যেমন অলংকার তৈরির আগে সোনার পাতে আলতো একটা কামড় দিয়ে দেখে। একই মুহূর্তে নিজে হাত দিয়ে জাহেদার প্রহরী হাতে চাপ দিল। পুরনো একটা হাতলের মত সরে গেল তা। বাবর তার করতল দিয়ে চেপে ধরল। শূন্যস্থান এবং ধীরে ধীরে মুঠিবদ্ধ করতে লাগল; আধখানা মুঠো করে সে ধরে দুই ঊরুর মাঝখানে, আর জাহেদার চিবুকের তলায় মুখ গুঁজে চিবুকটা ধীরে ধীরে ঠেলে নিতে লাগল ওপরে যেন একটা লাল ইটে তৈরি বাংলোবাড়ির শাদা জানালার শার্সী সে খুলেছে।

আহ।

আবার অদ্ভুত আর্তনাদ করে উঠল জাহেদা।

কী সোনা?

আহ

হেডা সোনা।

না।

জাহেদার দুটো হাত হঠাৎ জড়িয়ে ধরল বাবরের গলা। প্রচণ্ড চাপে যেন শ্বাসরুদ্ধ করে তাকে মারবে। উপরের দিকে টেনে তুলতে চাইল সে বাবরের মুখ। এবং নিজেও নামিয়ে আনল। বাবরের চোখের নিচে জাহেদার ঠোঁট এসে যুক্ত হতেই মেঘ ফেটে রৌদ্র বেরুল যেন। জাহেদা তাকে কম্পিত ঠোঁটে চেপে ধরল। সারা জীবনের মত। তারপর একটা জীবন অতিবাহিত হয়ে গেল। বাবর উঠে এলো আরো কাছে। উপহার করে ধরল তার ঠোঁট। জাহেদা একটু ইস্ততত করল। একবার স্পষ্ট হলো। আবার বিযুক্ত হল। তারপর গলা টান করে রেসের ঘোড়া শেষ মুহূর্তে যেমন প্রথম হয়ে যায় তেমনি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাবরকে সে স্পর্শ করল। দূর থেকে, কিন্তু কাছে। যেমন দুটো দালানের ছায়া পথের কংক্রীটে একে অপরকে ছুঁয়ে থাকে। কিন্তু তারা ছুঁয়ে নেই, তেমনি।

অনেকক্ষণ পর বাবর মুখ সরিয়ে জাহেদার কানের কাছে অস্পষ্ট একটু হাসল। বোধহয় কুঞ্চিত হলো জাহেদার কপাল। বাবর তখন মুখ তুলে অন্ধকারে জাহেদার মুখ দেখতে লাগল যেন আগে কখনো দেখেনি, যেন এইমাত্র কিছু সৃষ্টি করছিল সে, কী করছিল জানে না, এখন দেখছে এবং অবাক হয়ে যাচ্ছে। ফ্রানজ ক্লাইনের মত। মেঝেতে ক্যানভাস বিছিয়ে উন্মাদের মত বালতি বালতি রং ঢেলে, পা দিয়ে মথিত করে, তার ওপরে মডেলের নগ্ন নিতম্ব স্থাপন করে দুহাতে তাকে এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো টেনে নিয়ে দৌড়ে একটা মই বেয়ে উঠে। ফ্রানজ ক্লাইন দেখছে এইমাত্র আঁকা তার ছবিটা।

বাবর হাসল। হাসিটা স্থির হয়ে রইল। তার মুখে।

অন্ধকারে জাহেদার চোখ শুধু দেখা যাচ্ছে। কোথা থেকে এক বিন্দু আলো এসে বন্দি হয়ে আছে মাঝখানে। আলোটা ধীরে ধীরে ডান থেকে বাম দিকে নড়ছে, আবার ফিরে আসছে। বাবর বুঝতে পারল জাহেদাও তাকে এই প্রথম দেখার মত দেখছে। বাবর জানে, সে এখন ক্রমশ জাহেদার স্মৃতির অন্তর্গত হয়ে যাচ্ছে।

বাবর মুখ নামিয়ে তার গালে গাল ঘষতে ঘষতে বলল, তুমি ভাল তুমি আমার ভাল। হেডা? হেডা নামটা পছন্দ হয়? বল, সোনা, বল। হেডা সোনা। ও হেডা সোনা, তুমি ভাল।

বলতে বলতে সে জাহেদার পাজামার ইলাস্টিক প্রসারিত করে ধরল। একটু কেঁপে উঠল জাহেদা, জানালার পর্দায় হঠাৎ বাতাস লেগে যেমন। বাবরের হাত মুঠো করে ধরল সে। হাসতে হাসতে বলতে বলতে বাবর সে হাত সরিয়ে দিয়ে পাজামা নামিয়ে দিল হাঁটুর কাছে। হাঁটুর ডিম দুটো গোটান করতলে মাজতে লাগল ক্রিকেট খেলোয়াড় যেমন বল নিয়ে করে।

হেডা, ও হেডা, দ্যাখ না। তোমার ঠাণ্ডা করছে না তো?

বাবর একটু অবাকই হয়েছে, তার হাতের নিচে জাহেদা আর কেঁপে উঠছে না দেখে। এমনকি কি লোমকুপের অসংখ্য চুমকিও ঠেকছে না তার হাতে। মসৃণ, প্রশান্ত, অন্তহীন তার দেহ। বাবর তার রংটা পর্যন্ত আঙুলের ডগা দিয়ে দেখতে পাচ্ছে।

মনে মনে হাসল সে। হোস্টেলে শরমিন, পাপ্পু আর জাহেদা নিশ্চয়ই কখনো কখনো একজন আরেকজনকে আবিষ্কার করে। নইলে সে চমক নেই কেন জাহেদার? সেই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলীনের মরা ব্যাংয়ের মত নড়ে ওঠা? হঠাৎ থমকে গেল বাবর। দ্রুত আঙুল বুলিয়ে দেখল। অ্যাকসিডেন্ট হলে শাদা ট্রাফিক পুলিশ যেমন ছুটে যায় তেমনি হাতটা পাঠিয়ে দিল সে। অবাক হয়ে টের পেল একটা শক্ত মোটা খসখসে কাপড়ের ফালি দিয়ে দৃঢ় আবৃত জাহেদার অঙ্গ। ফালিটা অনুসরণ করে কোমরে পৌঁছে অনুভব করল চওড়া একটা ফিতের ঘের, চেপে বসে আছে কোমল মাংসে। সন্ধান করল গ্রন্থি। কিন্তু পেল না। উন্মোচনের অধীরতায় বারবার পিছলে যেতে লাগল তার আঙুল। আবার

ফিরিয়ে আনতে লাগল। জাহেদা মাথা এপোশ ওপাশ করতে করতে অনুচ্চ কিন্তু তীব্র স্বরে উচ্চারণ করল, না, না।

শান্ত হলো বাবরের হাত। সে হাসল। জিগ্যেস করল, তোমার শরীর খারাপ?

জাহেদা কিছু না বলে মাথা নাড়তে লাগল শুধু।

কবে থেকে?

তবু কিছু বলল না জাহেদা। বাবর মনে মনে ভাবল, কপাল একেই মন্দ বলে। কিন্তু তাতে নিবৃত্ত হলো না সে। আবার সচল হয়ে উঠল।

না।

হেডা সোনা।

না।

কবে থেকে খারাপ।

না।

খারাপ নয়?

না।

না?

যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেল বাবর। শরীর খারাপ নয়? তাহলে। তাহলে এই দেয়াল কেন তুলেছে জাহেদা? কখন সে নিজেকে এভাবে বেঁধেছে? তার মনে পড়ল, ঢাকায় তার বাড়িতে বাথরুমে গিয়েছিল জাহেদা, তারপর বাঘাবাড়িতে, আরেকবার এখানে এই ডাকবাংলোয়। হঠাৎ একটা কথার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেতনা। জাহেদা যখন আসতে রাজি হয়েছে তখন থেকেই জানত পরিণামে এই-ই হবে। হয়ত তাই আজ হোস্টেল থেকে বেরুবার আগেই নিজেকে সুরক্ষিত করে নিয়ে বেরিয়েছে। বাবরের মনে পড়ল প্রতিবার বাথরুমে অনেকক্ষণ সময় নিচ্ছিল সে। বান্ধন খোলা এবং লাগানোয় তো সময় লাগবেই। সারাদিনে সেই জন্যেই তো তিনবার।

জাহেদা জেনে শুনেই এসেছে। কী বোকা আমি। আমার সঙ্গে এতদূর ওভাবে হোস্টেল পালিয়ে কোনো মেয়ে কেন রাজি হয়েছে দেখেই বোঝা উচিত ছিল। বোধহয় ভালবাসে। ভালবেসে ফেলেছে আমাকে। কিন্তু কবে থেকে? কই, আমি তো কিছুই লক্ষ করিনি। সে জন্যেই কী ভালবাসার অর্থ জিজ্ঞেস করেছিল মেয়েটা?

ঈশ্বর, এদের দয়া কর। এবং আমাকেও। আমি এত মোটা মাথা বলে।

তাই জাহেদা আসবার পথে প্রথমে আমন চুপ করেছিল। আবার এ ঘরে শুতে আসার সময় কথা বলে চলেছিল অনর্গল যেন ভাবনাটা মাথায় না বাসা বেঁধে থাকে। আর এই সারাক্ষণ তার পাজামার ভেতরে শক্ত কাপড়ের কামড় ধরে রেখেছে সে। আশ্চর্য! আমি তাহলে এখনো বুড়ো হয়ে যাইনি।

ভেতরটা খুব উদার হয়ে এলো বাবরের। কিন্তু সেই সঙ্গে বাসনাও গাঢ় হলো আরো। সে আবার খুঁজতে লাগল উন্মোচনের গ্রন্থি। দুহাতে তাকে চেপে ধরল জাহেদা। না, না। মা, মা, আম্মি।

কণ্ঠে কান্নার ধ্বনি। বাবর তার মাথায় সস্নেহে হাত রাখল।

মাকে কেন ডাকছ সোনা?

আম্মি, আম্মি।

আমি তোমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাব সোনা। যাবে তুমি?

জাহেদা শুধু মাথা এপাশ ও পাশ করতে লাগল।

বাবর তখন কপালে একটা চুমু দিয়ে বলল, ও-রকম করে না।

জাহেদা বাবরকে জড়িয়ে ধরল।

আবার তার গ্রীবায় একটা দীর্ঘ চুমু দিয়ে বলল, আমাকে ধরে শুয়ে থাক। তোমার কোনো ভয় নেই।

চুলে হাত বুলিয়ে দিল তার। তারপর তাকে বুকে করে পিঠের পরে একটা হাত রেখে আরেকটা হাতে জাহেদার মাথা তুলে নিয়ে সে বলল, হেডা তুমি ভাল মেয়ে। তুমি ঘুমোও। আমি আর কিছু করব না। হেডা, ও হেডা, তুমি মাকে কেন ডাকলে? তুমি কার মত দেখতে হয়েছ? মা-র মত? ও সোনা, তুমি ঘুমাও। আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

জাহেদার পিঠে। মৃদু চাপড় দিতে দিতে বাবর গুনগুন করে উঠল, অনেক আগে শোনা জোন বাজের একটা গান। ঘুমপাড়ানির মত সুর! কোথায় যেন কান্না। ছেলেবেলা থেকে কনভেন্টে ইংরেজি পড়া মেয়ের জন্যে আর কোনো এই মুহূর্তের গান তার জানা নেই। সে গাইতে লাগল–

সেই গ্রীষ্মের কথা স্মরণ কর
এবং ক্রন্দন কর মাথা নিচু করে,
প্রাণনাথ তুমি ক্রন্দন কর।

লোকে বলে বিচ্ছেদ আসে
প্রতিটি ভাল বন্ধুর জীবনে;
তাহলে তুমি আর আমিই বাঁ ব্যতিক্রম কীসে?
প্রাণনাথ তুমি ক্রন্দন কর।
সেই গ্রীষ্মের কথা স্মরণ কর
এবং ক্রন্দন কর মাথা নিচু করে।

১৫. হেডা, ও হেডা

খুর ভোরে ঘুম থেকে উঠল বাবর। জেগে দেখল জাহেদ আর সে পিঠ ফিরিয়ে শুয়েছিল। জাহেদাকে এখন জাগাল না। দ্রুতপায়ে নেমে বাথরুমে গেল, পরিষ্কার করে গাল কামাল, গরম পানি আনিয়ে গোসল করল অনেকক্ষণ ধরে। পরল তার শাদা ফ্ল্যানেলের সুট। সবুজ ফোঁটা দেয়া টাই বাধল গলায়। মন খুব ভাল থাকলে এই পোশাকটা সে পরে। টাইটা আলজিরিয়া থেকে আনিস তাকে পাঠিয়েছিল।

তারপর জাহেদার জন্যে গরম পানি আনিয়ে তার কানের কাছে মুখ রেখে ডাকল, হেডা, ও হেডা।

চোখ মেলে অচেনা চোখে এক পলক তাকিয়ে রইল জাহেদা। হঠাৎ একটা সলজ্জ স্নিগ্ধতায় ভরে গেল। সদ্য ঘুম ভাঙ্গা মুখ।

শিগগির তৈরি হয়ে নাও। আমি নাশতা নিয়ে আসছি। কেমন।

বলে সে হাত ধরে জাহেদাকে তুলে দিয়ে বেরুল। বেরিয়ে দেখল। সারারাত শিশিরে গাড়িটা ভিজে আছে। কাচ অস্বচ্ছ হয়ে গেছে। কাচের ওপর আঙুল বুলাতেই সুন্দর পরিষ্কার দাগ ফুটে উঠল। তখন বড় বড় করে সে লিখল H-E-D-A. কৌতুকভরা চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল, আবার মুছে দিল। রুমালটা ভিজে গেল সারা রাতের শিশিরে।

চৌকিদার এসে বলল, নাশতা দেবে কি? হ্যাঁ, একটু পর। চৌকিদার তখন বলল, ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিই, গাড়ি মুছে দেবে? হ্যাঁ, তাই দাও। বাবর গাড়িতে বসে এঞ্জিন স্টার্ট করে গরম করল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে ফটকের দিকে গেল। জাহেদার তৈরি হতে অন্তত আধা ঘণ্টা সময় লাগবে। এই সময়টুকু হেঁটে বেড়ান যাক।

ঘুম থেকে আস্তে আস্তে জেগে উঠছে রংপুর। দালানের খরখাড়িতে, থামে, বারান্দায়, পথের ওপর রোদ পড়ছে। ঠিক যেন ঘুম ভাঙ্গা জাহেদার মত হাসছে। শহরটা। মিষ্টির দোকানে কয়লার উনুন থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, সিঙ্গারা সাতার কাটছে গরম তেলে। একপাল কাক মোড়ে জনসভা করছে যেন, কলরবে নাচানাচিতে জমজমাট। চাদরে কান মাথা ঢেকে লাঠি হাতে বুড়োরা বেড়িয়ে ফিরেছে। মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি থেমে থেমে পরিচ্ছন্ন করছে পথ। ফুটপাতের পাশে দেয়ালে শূন্য সব রশি টানান, গত রাতে যেখানে ঝোলান ছিল রং-বেরং-এর শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা। পানের দোকান থেকে ধোয়ামোছার পানি গড়িয়ে ছোট ছোট হ্রদ সৃষ্টি করেছে। চারদিক থেকে কুয়াশার পর্দা, হিমের পর্দা, ঘুমের পর্দা ক্রমশ নিঃশব্দে নাতিদ্রুত উঠে যাচ্ছে। খুব ভাল লাগল বাবরের। বিশেষ কোনো বিষয়, ব্যক্তি বা সমস্যা তাকে এখন অন্যমনস্ক করে রইল না। মনে হতে লাগল সব কিছুই ভাল, সবকিছুর সমাধান আছে এবং বেঁচে থাকার একটা বিস্ময় আছে যার সঙ্গে কোনো বিস্ময়ের তুলনা নেই।

হাঁটতে হাঁটতে ধাপ পর্যন্ত গেল বাবর। এখানে আরো শান্ত পরিবেশ। গাছপালার মধ্যে বেড়া দেয়া বাড়িগুলো উঁকি দিচ্ছে। লম্বা লম্বা গাছের ছায়া পড়ে নিবিড় দেখাচ্ছে পথটাকে। মাটির একটা তাজা গন্ধ সর্বক্ষণ নাকে এসে নেশা সৃষ্টি করছে।

বাবর এবার ফিরল। খবর কাগজের জন্যে এদিক ওদিক তাকাল। তারপর মনে পড়ল এটা ঢাকা নয়। এখানে কাগজ আসে একদিন পরে। আশ্চর্য, সকালটা এরা খবরের কাগজ ছাড়া কাটায় কী করে? অথচ সে নিজেও যে একটা পড়ে তা নয়। কিন্তু সকালে টুথব্রাশের মতই ওটা একটা জরুরি বস্তু, নইলে সকালটাকে সম্পূর্ণ মনে হয় না। যেদিন কাগজের ছুটি থাকে, মনে হয়। সারাদিন ভারি মনমরা যাচ্ছে।

আসসালামো আলাইকুম।

অতি বিশদভাবে উচ্চারিত এই সম্ভাষণে ঘুরে তাকাল বাবর। লোকটাকে পাশ কাটিয়েই চলে এসেছিল সে। ফিরে তাকিয়ে দেখল রেডিও পাকিস্তানের আসগরউল্লাহ। এই যে বাবর সাহেব। এখানে?

আরে আপনি? আপনি এখানে কী করছেন?

আমি তো এখন রংপুর রেডিও স্টেশনের চার্জে আছি। মাস তিনেক হয়ে গেল।

তাই নাকি। আমি তো কিছু জানি না।

আর জানবেন কী করে? টেলিভিশন আসার পর তো রেডিওর পথ আপনারা ভুলেই গেছেন।

তা সত্যি। বাবর অপরাধী হাসি একটা ফুটিয়ে তুলল। বলল, তারপর বলুন চলছে কেমন?

এই এক রকম। আপনাদের খেদমত করে যাচ্ছি। রংপুর কবে এসেছেন? কাল সন্ধ্যায়।

কী ব্যাপার?

এই বেড়াতে টেড়াতে।

উঠেছেন কোথায়?

ডাকবাংলোয়। অফিসে যাচ্ছেন বুঝি?

জি, আর কোন চুলোয় যাব বলুন। চলুন না। আমাদের স্টেশনটা দেখে আসবেন।

আচ্ছা, আচ্ছা।

না, না, আপনাকে আসতেই হবে। এই সোজা গিয়ে ডান দিকে মোড় নেবেন, যেতে যেতে জেলখানা পড়বে, সোজা চলে যাবেন, হাতের ডানে রেডিও অফিস। ও দেখলেই চিনতে পারবেন। কখন আসছেন বলুন?

দেখি।

দেখি টেখি না। আসতেই হবে। আপনাকে যখন পেয়েই গোলাম, একটা কিছু করিয়েও নেব। রংপুর স্টেশন থেকে ব্রডকাস্ট হবে।

শুধু শুধু কষ্ট করবেন কেন।

সে-কী কথা বাবর সাহেব। এতো আমাদের সৌভাগ্য। ছোট্ট একটা বক্তৃতা মাত্র। আপনি এখনই চলুন না? কতক্ষণ লাগবে?

আসগরউল্লাহ হাত ধরে ফেলল।

বাবর তখন বলল, আচ্ছা আসব। এখনো নাস্তা হয়নি।

আপনার অপেক্ষা করে থাকব কিন্তু।

অবশ্যই। তবে বক্তৃতা টক্তৃতা হবে কিনা বলতে পারছি না।

সে আপনাকে দিয়ে করিয়ে নেব। চলি।

আসগরউল্লাহ চলে গেল। বাবর একটু খুশিই হয়েছিল তাকে বক্তৃতা দেবার জন্যে অনুরোধ করাতে। সেই খুশিটা তাকে নাচিয়ে নিয়ে এলো ডাকবাংলোর দোতলা পর্যন্ত। তার দরোজায় টোকা দিল। মধুর গুঞ্জন করে উঠল, আসতে পারি।

দরোজা ঠেলে দেখল জাহেদা আরাম চেয়ারে বসে আছে পিঠ সোজা করে। একদিকে একটু পাশ ফিরে। গোলাপি আর গাঢ় সবুজে আঁকা মনোরম একটা ছবির মত। গোলাপি পাজামা পরেছে। পায়ে সবুজ ফিতের চটি। হাতকাটা গাঢ় সবুজ কামিজ, পিঠে গোলাপি বোতাম বসান। ঠোঁটে গোলাপি বংয়ের আবাস বার্নিশের মত উজ্জ্বল। কপালের মাঝখানে গোলাপি টিপ। ভ্রু টেনেছে সরু করে, চোখে কাজলের ফ্রেম। মাথার পেছনে টানটান করে চুল বাধা। অত্যন্ত প্রশান্ত আত্মস্থ স্নিগ্ধস্নাত মনে হচ্ছে তাকে। মুখটাকে দেখাচ্ছে কোমল ব্রাউন। এত কোমল যেন স্পর্শ করলেই ভেঙ্গে যাবে। গভীর চোখ তুলে তাকাল জাহেদা। বসে বসে নোখে রং পরছিল সে। সমুখে নাশতা সাজান। বাবর মিষ্টি করে হাসল। বলল, তুমি বসে আছ?

কতক্ষণ নাশতা দিয়ে গেছে। এই আপনার আসা? খান।

তুমি?

আপনি শুরু করুন।

গতরাতে যেন কিছুই হয়নি, গতরাত যেন অন্য কারো নাটকের রাত ছিল, জাহেদাকে দেখে এখন তাই মনে হলো বাবরের। তার মনে একটুখানি আশঙ্কা ছিল এই সকালের জন্য, এখন তা একেবারে নির্মল হয়ে গেল। সে একবার তার প্রশংসা করবে ভাবল, কিন্তু করল না। দুচোখ ভরে দেখল জাহেদাকে তার বদলে। আজ সকালে যেন আরও সুন্দর লাগছে তাকে। উঃ, আপনার এই হাসিটা।

রং রেখে নোখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে জাহেদা বলল।

কেন কী হয়েছে? গম্ভীর থাকা বুঝি ভাল?

নিন খান।

চৌকিদার চা দিয়ে গেল। নাশতা শেষে বাবর বলল, ভেবেছিলাম আজ রংপুর ছাড়ব। তা বোধহয় হলো না।

আশংকায় করুণ দেখাল জাহেদাকে। বলল, কেন?

এই মাত্র নিচে রেডিওর একজনের সঙ্গে দেখা। বলল, একটা বক্তৃতা দিতে হবে। এখানে আমার এক বন্ধু থাকে, প্রণব বাবু, ভাবছি। তার সঙ্গেও দেখা করব, মানে এলাম যখন। চল, আগে রেডিও সেরে আসি।

আমি যাব?

কী হয়েছে তাতে? চল, চল। তারপর শহর দেখাব তোমাকে। রেডিও থেকে ফেরার পথে।

জাহেদা হেসে ফেলল।

হাসছ, যে?

আবার ফেরার পথে বলেছেন।

কালকের কথা মনে পড়ল বাবরের। কাল সবকিছুই সে ফেরার পথে জাহেদাকে দেখাবে বলছিল ক্রমাগত। তার জন্যে শাসনও শুনছিল। আজকে আবার। বাবর বিস্তৃত হাসিতে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। বলল, আজ থেকে আর ফেরার পথে নয়।

কথাটা একটু ওজন দিয়ে উচ্চারণ করল বাবর। জাহেদা উঠে দাঁড়াল। তখন বেরুতে বেরুতে বাবর বলল, তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। খুব মানিয়েছে তোমাকে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে বলল, জান জাহেদা, আমার মনে হয়, একেক সময় আমি ভাবি, ঈশ্বর যদি থাকেন, আমি তার খুব আদরের তৈরি। তিনি নিজ হাতে আমাকে বানিয়েছেন।

কেন?

কেন আবার? আমার মত ভাগ্যবান আর কে বল?

বাবর মুখ ফিরিয়ে জাহেদার দিকে অর্থভরা চোখে দেখল। জাহেদা সমুখে চোখ রেখেই বুঝতে পারল সেটা। অনাবশ্যকভাবে বলল, গাড়িটা সারারাত বাইরেই ছিল নাকি?

হাসতে হাসতে গাড়ির দরোজা খুলে দিল বাবর। একটু রসিকতা করার লোভে সামলাতে পারল না সে। গাড়ির গায়ে চাপড় দিয়ে বলল, এ বেচারার জন্যে কাল কোনো ব্যবস্থা করা গেল না।

শীতের উজ্জ্বল রোদে গাড়িটা বেরিয়ে গেল ওদের নিয়ে। জাহেদার গাঢ় সবুজ ফোঁটা চমৎকার ম্যাচ করেছে। এইসব ছোট্ট কিন্তু সুন্দর যোগাযোগগুলো ভারি প্রীত করে বাবরকে।

বাঁ দিকে জেলখানা পড়ল। আসগরউল্লাহ বলেছিল; সোজা আরো কিছুদূর যেতে হবে। বাবর বায়ে দেখিয়ে বলল, এই হচ্ছে রংপুর জেলখানা।

আমাকে দেখাচ্ছেন কেন?

তবে?

ওটা তো আপনার জায়গা।

তা বটে। যদি তুমি জেলার হও।

আমার বয়ে গেছে।

ঐ বোধহয় সামনে রেডিও স্টেশন।

নাম পাঠাতেই আসগরউল্লাহ নিজে সদর দরোজাবী কাছে এসে ত্যভ্যর্থনা জানাল। আসুন, আসুন।

কিন্তু চোখ তার জাহেদার দিকে। বাবর হেসে বলল, জাহেদা আমার বোন। সবচেয়ে ছোট।

ও, উনিও এসেছেন।

হ্যাঁ, চিরকাল রাজধানীতে মানুষ। বেড়াতে নিয়ে বেরিয়েছি।

খুব ভাল করেছেন।

জাহেদা বাবরের দিকে চোখ কালো করে একবার অনেকক্ষণ তাকাল। বাবর তা না দেখার ভাণ করে আসগরউল্লাহকে বলল, আপনার স্টুডিও দেখান।

সমস্ত স্টেশনটা ঘুরিয়ে দেখান হলো ওদের। সবার সঙ্গে আসগরউল্লাহ আলাপ করিয়ে দিতে লাগল।

এই যে ইনি বাবর আলী খান। আর তার ছোট বোন।

বাবর যে রংপুরে সেটা যেন আসগরউল্লারই অনেক কীর্তির মধ্যে একটি, এই রকম একটা যাদুকর-শোভন গর্ব তার চোখেমুখে। ভারি মজা লাগল বাবরের। আপিসে বসতে বসতে বলল, কীসের বক্তৃতা দিতে হবে বলুন।

জি, বিষয় আমি ঠিক করে রেখেছি। রংপুরের ভাওয়াইয়া গানে বিরহ।

গান? গানের আমি কী বুঝি?

তবু।

আর বিরহ? হাঃ হাঃ। আসগরউলাহ সাহেব, এই শীতের চনমনে সকালে আর কোনো বিষয় পেলেন না? বিরহ!

মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল বাবর। জাহেদা বিরহ শব্দটা বোঝে না। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তারপর বাবরকে হাসতে দেখে তার ভেতরেও সংক্রমণ হলো যেন। সে ঠোঁট টিপে মুখ নামিয়ে রইল। আসগরউল্লাহ বুঝতে পারল না বাবর কী ঠাট্টা করছে না। সত্যি সত্যি বলছে। খুব সপ্রতিভ হয়ে বলল, বিরহ তো শীতের সকালেরই ব্যাপার সাহেব।

তাই নাকি? আরো মজা পেল বাবর। হা হা করে হেসে উঠল সে। তার চেয়ে বাংলাদেশের জাহাজ শিল্পের ভবিষ্যৎ বাঁ গবাদি পশুর যক্ষ্মা গোছের কোনো বিষয় দিন, মিনিট দশেক বক্তৃতা করে দিচ্ছি।

এবারে হা হা করে হেসে উঠল আসগরউল্লা। বলল, ঠাট্টা করছেন? স্বীকার করি, আমাদের অধিকাংশ বক্তৃতার বিষয়ই ঐ রকম। তাই বলে তা আপনাকে দেব কেন।

আচ্ছা তাহলে ঐ ভাওয়াই গানে বিরহই?

জি, আপাতত এটাই আছে। দশ মিনিটের বক্তৃতা। মিনিট আটেক বললেই হবে।

কিন্তু কী বলি বলুন তো! ভাবতে হবে, লিখতে হবে, কখন লিখব, কখন পড়ব?

আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। আপনার বক্তৃতায় উদাহরণ হিসাবে কিছু গানের অংশ তো থাকবেই। আমি রেকর্ড বাছাই করেও রেখেছি। গানেই যদি বলেন মিনিট পাঁচেক সবশুদ্ধ চালিয়ে দেয়া যাবে। মাত্র তিন মিনিট কথা বলবেন। ব্যাস।

জাহেদার পাশে নিজেকে খুব চটপটে লাগছিল বাবরের। মনের কোণে তাকে একটু তাক লাগিয়ে দেয়ার ইচ্ছেটাও হচ্ছিল থেকে থেকে। সে বলল, বেশ, সোজা স্টুডিওতে চলুন। মুখেই বলছি। ফাইলের জন্যে টেপ থেকে কাউকে দিয়ে টুকে নেবেন।

বেশ তো তাই হবে। স্টুডিওতে চলুন! গানগুলো শুনে নেবেন।

চল জাহেদা।

জাহেদার কাঁধে হাত রেখে বাবর বলল। জাহেদা আবার চোখ কালো করে দেখল তাকে। কয়েক পালকের জন্যে। তখন আরো সুন্দর লাগল তাকে।

বক্তৃতা রেকর্ড করে বেরুতে বেরুতে সাড়ে এগারটা বেজে গেল। যাবার সময় বাবর বলল, চেকটা ঢাকার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন।

খুব খুশি হলাম। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আবার আসবেন। ঢাকায় গেলে দেখা করব।

করবেন।

বাগান থেকে একটা বড় সূর্যমুখী তুলে বাবর জাহেদাকে দিল। জাহেদা আবার চোখ কালো করে তাকাল।

আরে, কী হয়েছে?

আপনার এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হওয়া উচিত।

অবশ্যই।

বলে সাঁ করে গাড়ি পথের ওপর তুলে আনল বাবর। রওয়ানা হলো শহরের দিকে। হাসতে হাসতে বলল, জানি না। কীভাবে কথাটা ইংরেজিতে অনুবাদ করব, বাংলায় একটা কথা আছে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। আমার হয়েছে সেই অবস্থা।

আমি বেশ বাংলা বুঝি সাহেব। আপনি খামোক সর্বক্ষণ ইংরেজি বলেন।

কী জানি। বাংলায় বললে মনে হয় তুমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি কী বলতে চাইছি। ইংরেজিটা অনেক নির্ভরযোগ্য মনে হয় তাই।

জাহেদা সীটো গা এলিয়ে বসল।

নিপুণ হাতে গাড়ি চালাতে চালাতে বাবর বলল, তখন ঐ বিরহ শব্দটা বুঝেছ?

না।

কী করে বোঝাই তোমাকে ইংরেজি কী হবে বুঝতে পারছি না। এটা একটা বিচ্ছেদের অবস্থা। সঙ্গে অনন্ত বেদনা আছে, প্রতীক্ষা আছে।

লঙ্গিং?

না, না, লঙ্গিং নয়। তার চেয়েও বেশি। বিরহ বুঝতে হলে তোমাকে রাধার কথা জানতে হবে। রাধা।

আমি রাধাকে চিনি। রাধা হচ্ছে হিন্দুদের একজন সুন্দরী দেবী। ইন্ডিয়ান লাভ মেলোডিজ বলে একটা লং প্লেয়িং রেকর্ড, তার কভারে আছে রাধার ছবি।

বাবর হাসল।

কি, ভুল বলেছি।

না, নাতো। বোধহয় জান না, রাধা শুধু দেবী নয়, কল্পনা নয়, রাধা যে-কোনো মেয়ের নাম কোনো বিশেষ মুহূর্তে।

অর্থাৎ?

কিছু না, ও কিছু না। তুমি আমার রাধা। সবুজ আর গোলাপি দিয়ে আঁকা, চোখে বর্ষার মেঘ টানা, কাচুলিতে নীল পয়োধর বাঁধা, তুমি আমার রাধা।

বাংলা ভাল বুঝি না বলে যা খুশি তাই বলছেন, বুঝি না বুঝি। আপনি এখন থেকে ইংরেজি বলবেন। শুধু ইংরেজি।

তাইতো বলছিলাম কাল থেকে।

তাই বলবেন সাহেব এরপর থেকে।

ইয়েস, ইয়োর ম্যাজেস্টি।

বাবর পথের দুদিকে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে তাকাতে লাগল। কী দেখছেন?

এইখানে কোথায় মিলন স্টোর বলে একটা দোকান আছে।

কী কিনবেন?

কিছু না। আমার এক বন্ধু আডা মারতে আসেন শুনেছি। ঢাকায় বহুবার বলেছেন রংপুরে এলেই যেন খোঁজ করি। চমৎকার মানুষ। এই যে!

পেট্রল পাম্প পেরিয়েই দোকানটা। বাবর সেখানে প্রণব বাবুর খোঁজ করল। না, তিনি তো নেই। হ্যাঁ, তিনি এখানে সকাল বিকেল আসেন। আজো আসবেন। বাবর একটা টোকা লিখে দোকানির হাতে দিল। হ্যাঁ, এলেই প্রণব বাবুকে দেবে। লোকটা সারিসের মত গলা বাড়িয়ে যদ্দুর দেখা যায় বাবরকে দেখল। পাম্প থেকে পেট্রল ভরে নিল বাবর। বলল, চল তাহ হাটের মহারাজার প্রসাদটা দেখিয়ে আনি।

মহারাজা?

ছিলেন, এখন নেই। শুনেছি শেষ যিনি মহারাজা ছিলেন। কলকাতা যাবার পথে গাড়িতে হার্টফেল করে মারা গেছেন।

বেচারা। জাহেদা দুঃখিত মুখ করল।

মানুষ তো মরেই। মরবে না?

তবু কী আশ্চর্য, এইটুকু জীবনের জন্য কত না হৈচৈ।

সেটা দোষের নয়। মানুষ এত হৈচৈ করে কেন জান? করে সে যে বেঁচে আছে সেইটে অনুভব করার জন্যে।

এবং করাবার জন্যে। জাহেদা যোগ করল।

হয়ত। তবে আমার মনে হয়, না। আমার মত তোমারও যখন বয়স হবে তখন তুমিও বুঝতে পারবে, মানুষের নিজের কাছে নিজেই প্রমাণ দেয়া যে সে বেঁচে আছে এইটে বড়। কটা লোক বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে সে বেঁচে আছে?

জাহেদা সে চ্যালেঞ্জের ধারে কাছে দিয়েও গেল না। মুখ গোল করে বলল, আপনি সব সময় নিজেকে খুব বুড়ো ভাবতে ভালবাসেন, না?

হেসে ফেলল বাবর।

আবার হাসছেন?

হাসছি? না, হাসছি না। কী জানি, হয়ত নিজেকে বুড়েই মনে করি। বয়স তো হচ্ছেই। কী জানি তোমাদের দেখে এককে সময় ঐ রকম হয়। দুদিন পরে এই তুমি গম্ভীর হয়ে যাবে, চঞ্চলতা কমে যাবে, শাড়ি পরবে, সংসার করবে, মা হবে।

কখনো না।

আইবুড়ো থাকবে?

হ্যাঁ, থাকব।

কেন?

কেন আবার? বিয়ে টিয়ে আমি পছন্দ করি না। হাসছেন যে?

কই?

আপনার হাসি দেখলে আমার গা জ্বালা করে। কেন, আপনিও তো বিয়ে করেননি। আমি যদি হাসি?

আমি ধন্য হব।

আমার কী দায় পড়েছে। আপনাকে ধন্য করব?

রাগ করেছ।

জাহেদা চুপ করে থাকে। বাবরের সত্যি সত্যি একবার মনে হয় তার হয়ত বয়সই হয়ে যাচ্ছে এবং তাই সে বুঝতে পারছে না। এই সদা কৈশোর পেরুনো তরুণীকে। সে বলল, একটা লিমেরিক শুনবে? বলে সে আর জাহেদার মতামতের অপেক্ষা করে না। বলে চলে–

আল্লাতালা বানিয়েছিলেন আদম এবং হাওয়া।
হাওয়া বলেন, দুর্ভাবনা বেবাক হলো হাওয়া।
ব্যাটাছেলে বলতে এক,
আমারই সে তাকিয়ে দ্যাখ!
কারো সাথে করতে তো নেই চুলোচুলি বাওয়া।

হেসে ফেলল জাহেদা। তারপর লজ্জায় একটু মাথা দুলিয়ে চিবুক নামাল। বলল, আপনার মাথায় কী কী যে সব খেলে। এটা বললেন কেন?

বললাম এই জন্যে যে, আমাদের অবস্থাটা খুব ভিন্ন নয়। তোমার এখন রাগ করতে আমি, ঝগড়া করতে আমি, আবার আদর করতেও–

জি না।

জাহেদা পা গুটিয়ে বসল। চুপচাপ গাড়ি চালাল কিছুক্ষণ বাবর। ভেতরটা আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে তার। আজ সকালে এই প্রথম। যেন ভোরের মিঠে সূর্যটা এখন মাথায় চড়ে গনগন করছে।

বাবর তার নাম ধরে ডাকল। জাহেদা তাকাল তার দিকে। হাসল বাবর। আস্তে আস্তে জাহেদাও হেসে ফেলল। বাবর তখন একটি হাত ষ্টিয়ারিং থেকে তুলে চিকিত ছুঁয়ে দিল জাহেদার কাঁধ। বলল, এই মেয়ে, কথা বলছ না? আচ্ছা, আরেকটা লিমেরিক বলি।

না, না, বাবা আর না।

শুধু এইটে। বলেই ব্যাস।

খারাপ কিছু বললে আমি কিন্তু কাঁদব।

কেঁদ। তোমাকে কখনো কাঁদতে দেখিনি।

কাঁদলে খুব বিচ্ছিরি দেখায় আমাকে। আমি যদি কোনোদিন কাঁদি, আমার মুখের দিকে কিন্তু আপনি তাকাতে পারবেন না।

আচ্ছা, কথা দিলাম।

বলুন লিমেরিকটা।

এক রূপসী বাড়ি তেনার সুদূর টিটিকাকা—
উড়ে এলেন এয়ার মেলে মস্ত খামে ঢাকা।
পিয়ন দিল বসিয়ে ছাপ।
বলল মেয়ে, বাপরে বাপ,
তলিয়ে গেল প্যারিস রোম, করল ফতে ঢাকা।

জাহেদা চোখ কালো করে বলল, এর মধ্যে খারাপ কিছু নেই তো?

বাবাব হাসল রহস্যময় ভাবে।

তার মানে, আছে?

থাকলেই বা। যখন কেউ কারো এই রকম কাছে হয় তখন খারাপ বলে কিছু থাকে না, থাকতে পারে না। সব ভালো, সব সুন্দর। সব কিছুর ভেতর দিয়ে তারা একটা কথাকেই ফুটিয়ে তোলে। সেটা হচ্ছে, আমরা আমাদের।

জাহেদা কয়েক মুহূর্ত পর বলল সত্যি, আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারি না। ঠাট্টার মধ্যে হঠাৎ গুরুগম্ভীর কথা বলেন, বলেন সেই ঠাট্টার সুরেই। আবার পাদ্রীদের মত গলায় এমন কথা বলেন যা আসলে রসিকতা।

আসলে কী জান, জীবনে সিরিয়াস হয়ে দেখেছি, কিছু পাইনি। আবার যখন সেই খোলসটা ছেড়ে ফেললাম, দেখি সব আমার হাতে।

তার মানে আপনি এখন সিরিয়াস নন?

একপলক জাহেদাকে দেখল বাবর। কথাটার মর্মার্থ বুঝতে চেষ্টা করল। বুঝে দেখল, একটু আটকে ফেলেছে তাকে মেয়েটা। বাবর তখন তার বহু ব্যবহৃত অস্ত্রটা আবার প্রয়োগ করল–হাসল। বলল, তোমার কী মনে হয়?

জাহেদা চুপ করে রইল।

বাবর জানে কী এখন বলতে হবে তাকে। কুটনৈতিক মিশনের নিপুণ কোনো সদস্যের মত উচ্চারণ করল, সত্যি বলতে কী আগে ছিলাম না, কিন্তু কাল সন্ধে থেকে হয়েছি। কখন জান? যখন তুমি গায়ে পুলওভার চাপিয়ে পা ক্রস করে বসলে সেই তখন কোথা থেকে কী হয়ে গেল, তোমাকে নতুন করে দেখলাম। সে দেখার বিস্ময় আর কাটল না। ওভাবে কেন বসলে তুমি? তা হলে তো কিছু হতো না।

আমি কিছু ভেবে তো বসিনি। পা ক্রস করে ছিলাম। তাই জানতাম না। আপনি বলছেন তবু মনে করতে পারছি না।

আকাশ কি জানে সে রঙ্গিন হয়ে আমাদের রঙ্গিন করে। না মনে রাখে।

জাহেদার মুখটা চিকচিক করে উঠল।

বাবর গাড়ি থামিয়ে নামল। বলল, এটা মহীগঞ্জ। এক সময়ে, সে অনেক আগে রংপুরের প্রধান এলাকা ছিল এইটে। দাঁড়াও তাজহাটের রাস্তাটা কাউকে জিগ্যেস করি।

দুদিকে সারি সারি গুদাম ঘর, বাসা ভাঙ্গা দালান। মনে হয় মানুষ ছিল কিন্তু কোনো মহামারীর ভয়ে পালিয়ে গেছে। যাদের দেখা যাচ্ছে তারাও যেন নিঃশব্দে চলাফেরা করছে, এপার থেকে ওপারে মিলিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। ঘুঘু ডাকছে দূরে ঘন ঝোঁপের ভেতর থেকে। পরাজয়ের একটা বিষণ্ণ বর্ণের প্রলেপ চারদিকে। জাহেদার মনে হলো, অবিকল একটা গোলডরাশ শহরের মত, আমেরিকায়, ছবিতে দেয়া, সোনার লোভে মানুষ গড়েছে এবং ফেলে চলে গেছে যেখানে সোনা আছে। মনটা খুব খারাপ করে উঠল তার। বাবর ফিরে এলো। খুলে রাখল জ্যাকেট।

যা গরম লাগছে। আরো খানিকটা যেতে হবে, বলেই অবাক হয়ে গেল বাবর। শুনল জাহেদ আপন মনে বিড়বিড় করে কী যেন বলে চলেছে।

কী বলছি জাহেদা?

ম্লান হাসল মেয়েটা। তাকে সুদূরের মনে হলো।

বলবে না আমাকে?

কী শুনবেন সব ছেলেমানুষী।

তবু।

টেবল পড়ছিলাম। ফোর থ্রিজা টুয়েলভ; ফোর ফোরজা সিক্সটিন; ফোর ফাইভজা টুয়েন্টি।

হঠাৎ নামতা কেন?

এমনি। এমনি মাঝে মাঝে বলি। ভাল লাগে। ফোর সিক্সজা টুয়েন্টি ফোর, ফোর সেভেনজা টুয়েন্টি এইট। কই চলুন।

যাচ্ছি।

বাবর থমকে গিয়েছিল। একটা নতুন খবর শুনেছে যেন। নামতা পড়তে ভাল লাগে। আশ্চর্য! সংখ্যার কী সম্মোহনী শক্তি! ঘুম না এলে একশ থেকে উল্টো দিকে গুণতে হয়। জাহেদার মন কি খুব বিক্ষিপ্ত এখন?

গাড়ি সচল হয়ে উঠল। বলল, হোস্টেলের জন্যে ভয় করছে?

নাহ। যা হবার হবে। ওসব ভেনে; আর মন খাবাপ করতে চাই না।

বাবর হাসল। বলল, জানি, এই একদিনে অনেক বয়স বেড়ে গেছে তোমার। তুমি বড় হয়ে গেছ।

হঠাৎ ব্রেক করল বাবর। জাহেদা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, কী হলো?

ঐ দ্যাখ।

সমুখে একটা কালো অতিদীর্ঘ সাপ মন্থর গতিতে এপার থেকে ওপারে যাচ্ছে। আতঙ্কে পাথর হয়ে রইল জাহেদা। বাবর সেই সাপটার দিকে তাকিয়ে রইল সম্মোহিত স্মিতহাস্যে। ধূলায় তার দেহের দাগ পড়ে যাচ্ছে। এই যে বাঁ দিকের শটি বনে ঢুকাল। ধীরে ধীরে ঢুকে গেল তার রাজকীয় দেহটা। লেজের তাড়নায় ফট ফট করে শব্দ হতে লাগল শটি বনে। তারপর শব্দটাও মিলিয়ে গেল। তখন শুধু শূন্য সংবলিত এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল।

জাহেদা জিগ্যেস করল, কী সাপ?

গোখরা। পৃথিবীর ভীষণতম গোখরা এই অঞ্চলে দেখা যায়। এদের যে বিষ তার এত তীব্র ক্রিয়া হয় যে–

দোহাই। দুহাতে মুখ ঢাকল জাহেদা। চুপ করুন।

একটা নিয়ম আছে জাহেদা। সাপ দেখলে আশেপাশের গেরস্তকে খবর দিয়ে যেতে হয়। আমি গায়ের ছেলে তো। ওটা মানি। বলে সে গাড়ির দরোজা খুলতে গেলে জাহেদা খাপ করে হাত টেনে ধরল তার। না, আপনি যেতে পারবেন না।

থরথর করে কাঁপছে জাহেদার হাত নোখগুলো বসে গেছে। বাবরের হাতে। কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত তারা তাকিয়ে থাকল একে আরেকজনের চোখে। তারপর হঠাৎ বাবর তাকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট রাখল অত্যন্ত কোমল করে। পরে মুখটা সরিয়ে কানের লতির উপর ছুঁইয়ে বলল, না, যাব না। তুমি যদি বল যাব না।

গাড়ি ফিরিয়ে নিল বাবর। বাঁ হাতে জাহেদার ডান হাতটা ধরে গাড়ি চালাতে লাগল সে। জাহেদা নীরবে নিজেকে সমর্পণ করে বসে রইল শূন্য চোখে দুপুরের রোদজ্বলা শালবনের রাস্তার দিকে।

সারা রাস্তায় আর একটা কথাও হলো না। সারা রাস্তা সেই রাজকীয় সাপটা এপার ওপার করতে লাগল। অলস মন্থর গতিতে সারাক্ষণ। জাহেদা খোদিত একটা মূর্তির মত একভাবে বসে রইল। তারপর ক্রমশ যখন শহরে ঢুকল তারা, তখন জীবনের লক্ষণ

দেখা গেল তার ভেতরে। একটা নিঃশ্বাস পড়ল। একটা হাত স্থান বদল করল। একটা পা স্যান্ডেল সন্ধান করল।

বাবর বলল, মৃত্যুকে তুমি ভয় পাও?

আমি মরতে চাই না।

কেউ চায় না–পাগল, প্রেমিক, কবি ছাড়া।

তা জানি না। আমি বেঁচে থাকতে চাই।

কিন্তু মৃত্যুই তো নিয়ম।

বুঝি না।

মৃত্যুকে যেভাবেই দ্যাখ জাহেদা, পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক এই মৃত্যু। যদি একটা কোনো অনড় অবিচল সত্য থেকে থাকে তো তা মৃত্যু।

দোহাই আপনার, চুপ করন।

সত্য আর স্বাভাবিক থেকে তুমি কেন পালাবে জাহেদা?

আহ আমি শুনতে চাই না।

অব্যক্ত যন্ত্রণায় জাহেদা মাথা এপোশ ওপাশ করতে লাগল। সুদক্ষ গলফ খেলোয়াড় যেমন সন্তর্পণে টি-তে বল ঢোকায়, তেমনি যত্ন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বাবর গাড়িটা ডাকবাংলোর ভেতর আনল। পরমশীলতার সঙ্গে দরোজা খুলে দিল জাহেদার। এবং নিঃশব্দে অনুসরণ করতে লাগল দোতলার দিকে। জাহেদা একটু দ্রুত হাঁটছে। একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে দুজনের ভেতরে দূরত্ব আরো বেড়ে গেল। কিন্তু সিঁড়ির কাছে গিয়ে অপেক্ষা করল জাহেদা। তখন আবার পাশাপাশি হলো তারা। এক সাথে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

দোতলায় উঠেই দেখে প্রণব বাবু দ্রুতগতিতে বারান্দায় পায়চারি করছেন। পরনে শাদা খদ্দরের মোটা পাঞ্জাবি, সাদা জহর কোট, পাট ভাঙ্গা ধুতি, পায়ে লাল চটি। মাথায় রূপালি একরাশ তরঙ্গায়িত চুল ঝিকঝিক করছে। পাতলা ঠোঁটে সহাস্য পানের ছোপ।

বাবর ফিসফিস করে জাহেদাকে বলল, তুমি ঘরে যাও। প্রণব বাবু ততক্ষণে পায়চারি করে উল্টোদিকে ফিরতেই বাবরের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। শরৎ কালের মেঘের মত হাসতে হাসতে কাছে এসে প্রণব বাবু হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, কী সৌভাগ্য! মশাই দোকানে আপনার চিঠি পেয়েই সেই থেকে পায়চারি করছি।

তাই নাকি?

আরে হ্যাঁ। একবার ভাবি চলে যাই, পরে আসব। আবার ভাবি দেখিই না একটু। সেই যে অভিজ্ঞান শকুন্তলম-এ আছে— গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদ সংস্থিতং চিতঃ। চীনাংশুকামিব কেতোঃ প্রতিবাতংনীরমানস্য। অর্থাৎ কিনা যাচ্ছি বটে, মন পেছনে পড়ে রইছে, যেন নিশান যাচ্ছে সমুখে, পতপত করছে পেছনে। হাঃ হাঃ। আছেন কেমন?

ভাল। এলাম। আপনাদের দেশ দেখতে।

খুব ভাল করেছেন, খুব ভাল করেছেন। আমি মশাই সর্বক্ষণ আপনার কথা চিন্তা করি। এই কালও কাকে যেন বলেছিলাম। চলুন, কোথায় কোথায় বেড়াতে যাবেন, নিয়ে যাই আপনাকে। সঙ্গে মহিলা দেখলাম।

আমার বোন।

বা বা বা। প্রীত হলাম। তাহলে দয়া করে একবার গরিবের বাড়িতে পদধূলি দিতে হয়। চাট্টি খাবেন।

নিশ্চয়ই। আপনার নিরামিষ খাবার গল্প কত শুনেছি।

মশাই, সাত পুরুষের অভ্যোস। সাত পুরুষ থেকে নিরামিষাশী। আপনাদের কেমন লাগবে জানি না, তবে যত্নের কোনো ত্রুটি রাখব না। হাঃ হাঃ। আজ রাতে?

হ্যাঁ, আজ রাতটা আছি। আজ রাতে মন্দ কী।

সেই ভাল। বসে বেশ গল্প গুজব কিবা যাবে। অনেক দিন থেকে মশাই আড্ডার জন্যে প্রাণটা আইটাই করছে। এখন কী করছেন?

এই বাইরে থেকে বেড়িয়ে এলাম। তাহলে যান মশাই, স্নানাহার করে নিন, একটু বিশ্রামও হোক। আমি ও-বেলা আসব। এই চারটের সময়?

সে-কী! একটু বসবেন না? একটু বসুন। কদিন পর দেখা।

তাতো বটেই। তবে কিনা দ্বিপ্রাহরিক আহামের সময়। চোখের দেখা হয়ে গেল, মনটাতে আর আক্ষেপ নেই। আপনি আরাম করুনগে। ঐ কথাই রইল। রাতে গরিবালয়ে চাট্টি খাবেন। ন চেন্দন্যকার্য্যাতিপাতঃ প্রবিশ্য প্রতিগুহ্যতামাতিথেয়ঃ সৎকারঃ। আর বিকেলে আমি আসছি।

পিঠ চাপড়ে দিয়ে চটি ফটফট করতে করতে প্রণব বাবু চলে গেলেন। যেন একটা নির্মল আনন্দ কোথা থেকে হঠাৎ মনটাকে আলোকিত করে চলে গেল। তিন পুরুষ আগে এখানে জমিদারি কিনেছিলেন ওরা। এখন শুধু শীলতাটুকু আছে। মাঝে মাঝে জন্মভূমি বারানসিতে যান, ছেলেমেয়েরা সব সেখানেই, কিন্তু নিজে থাকতে পারেন না। রংপুরে পড়ে থাকে মনটা। জমিজমার কাজে হাইকোর্ট সেক্রেটারিয়েট আছে, সেই সূত্রে ঢাকা

যেতে হয়। একবার এক ভাওয়াইয়া গায়কের সঙ্গে টেলিভিশনে বেড়াতে এসেছিলেন প্রণব বাবু। সেই তখন আলাপ। প্রথম আলাপেই ভারি ভাল লেগেছিল তাঁকে, বিশেষ করে ঐ সংস্কৃত উচ্চারণগুলো ভারি চমৎকার শোনায়। কতবার বলেছেন, রংপুরে এলেই মশাই আমাকে স্মরণ করবেন।

চৌকিদারকে খাবার আনতে পাঠিয়ে ঘরে ঢুকল বাবর। দেখল জাহেদা ছোট্ট আয়না তুলে মুখ দেখছে। জিগ্যেস করল, চলে গেলেন?

হ্যাঁ।

এই রকম চুল শাদা বুড়ো আপনার বন্ধু?

আমিও তো বুড়ো। হাসতে হাসতে বাবর খাটের ওপর বসল। যোগ করল, বুড়ো নাই? তুমি যে তখন বলছিলে।

জাহেদা ভ্রুকুটি করে তাকাল। তারপর আয়নার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, আমার কথা জিগ্যেস করেনি?

করেছে।

পরিচয়টা কী দিলেন?

নিঃশব্দে সব কটা দাঁত বের করে হাসল বাবর। জাহেদা আবার চোখ কালো করল। নিঃশব্দে সালতামামী করতে লাগল চেহারার। বাবর একটা সিগারেট ধরাল। খাবার এলে খেল ওরা দুজন। খেতে খেতে নেমন্তনের কথা জানাল বাবর। খাওয়া শেষে জাহেদা বলল, আপনি বাইরে যান।

কেন? বাইরে কেন?

আমি একটু শোব। যান।

বাবর আবার নিঃশব্দে হাসল। তারপর বনবেড়ালের মত পায়ে আরাম চেয়ারটা বাইরে এনে বসল।

১৬. আকাশটা লাল

বাবর চোখ খুলে দেখে আকাশটা লাল হয়ে উঠছে। আরাম চেয়ারে শুয়ে ঘাড়টা ব্যথা করছে তার। পাশে তাকিয়ে দেখে, জাহেদা। তখন বুঝল জাহেদা তার ঘুম ভাঙ্গিয়েছে। দুপুরের পোশাকটা পালটে শাদা জামা পাজামা পরেছে। তাতে কালো বর্ডার দেয়া। চুল পিঠের পরে ছেড়ে দেয়া, কাঁধের নিচে ডোল হয়ে আছে।

বাবর হাসল।

যান, মুখ ধুয়ে নিন। চা আনতে বলেছি।

বাথরুমে এসে দেখল জাহেদার পাজামা ঝুলছে হুক থেকে। স্তম্ভিত নিঃশ্বাসে সে একবার তাকিয়ে দেখল, তারপর কম্পিত হাতে স্পর্শ করে রইল ঠিক যেখানে জাহেদার রাজহাঁসটা লুকিয়ে থাকে। জাহেদা যখন হেঁটে যায় তখন পেছনটা দেখায় ঐ রকম। সুতোর, মাড়ের, সাবানের, সুগন্ধের স্তব্ধ উষ্ণ একটা অনুভব। পাজামাটা আবার ঝুলিয়ে রেখে মুখ ধুল বাবর। মুখ মুছল জাহেদার তোয়ালে দিয়ে। টাক ঢেকে সিথি করে জাহেদার স্প্রে ব্যবহার করল।

বেরিয়ে দেখে চা নিয়ে বসে আছে জাহেদা।

বাবর বলল, ঘুমিয়ে একটা স্বপ্ন দেখলাম এখন।

জাহেদা হেসে বলল, আপনি জেগেও স্বপ্ন দেখেন নাকি?

হ্যাঁ দেখি। এই যে তুমি, আমি, কোথাকার কোন রংপুরের ডাকবাংলো, এই চা খাচ্ছি, এটা স্বপ্ন নয়?

আবার বক্তৃতা।

আমার অভ্যাস। বাবর হেসে ফেলল।

এটা তো টিভি নয় যে বক্তৃতা দিলে পয়সা পাবেন।

যা পাচ্ছি সেটা টাকার চেয়ে বড়।

কথা ঠিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক জায়গায় আনতে আপনার দ্বিতীয় নেই।

নিঃশব্দ হাসিতে উজ্জ্বল হলো বাবর। দরোজায় টোকা পড়লে চমকে তাকাল। দরোজা খুলে দেখল, প্রণব বাবু দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে টুক টুক করছে পান। হাতে চুন লাগান বোটা। দেখা হতেই চিবুক তুলে, যাতে রস গড়িয়ে না পড়ে, বললেন, বিশ্রাম হলো? হলো। আসুন। জাহেদা, এই প্রণব বাবু।

প্রণব বাবু নমস্কার করলেন।

চলুন তাহলে, আপনাদের জন্যে ব্যবস্থা করে এলাম।

ব্যবস্থা মানে?

এই একটু লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবেন। কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যানুরাগী সংস্কৃতিমনা ভদ্রলোককে খবর দিয়েছি। ওরা সবাই পাবলিক লাইব্রেরীতে আসবেন। পাশে বহুদিনের গৌরবময় রংপুর সাহিত্য পরিষদ আছে সেটাও এক নজর দেখে নেবেন। ব্যস।

করেছেন কী? বাবর চোরচোখে জাহেদার দিকে তাকাল।

প্রণব বাবু জাহেদার দিকে তাকিয়ে বললেন, বুঝেছেন দিদি, কোনো রকমে সংস্কৃতির সলতে টিমটিম করে জ্বালিয়ে রাখা যাচ্ছে, রংপুরেব সেদিন নেই, সেই মানুষও নেই, তবু কয়েকজন আছেন, বিশেষ উৎসাহী, একেবারে নিবেদিত প্রাণ। ঢাকা থেকে এসেছেন, তাদের সঙ্গে আলাপ করে না গেলে মনে বড় ব্যথা পাবেন তারা। ন খলু ন খলু বানঃ সন্নিপাতোহয়মস্মিন মৃদুনি মৃগ-শরীরে তুলরাশবিবাগ্নিঃ। শেষাংশে সংস্কৃতটুকু তিনি বাবরের উদ্দেশে বললেন।

একে ঐ রকম বাংলা তার ওপর সংস্কৃত, বাবর যার একবর্ণ নিজেও বোঝে না, শুনে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল জাহেদা। বাবর নিজে তার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলে। বাংলা কখনো বললে তার কঠিন শব্দটা সঙ্গে সঙ্গে তর্জমা করে দেয়। প্রণব বাবু তা দুঙ্গীনবেন কোত্থেকে? তিনি ভেবেছেন, জলের মত স্বচ্ছ তরল তার বাংলা না বোঝার কী আছে? জাহেদাকে বিব্রত হওয়ার হাত থেকে বাচাল বাবর। বলল, চলুন তবে বেরোই। চল জাহেদা।

বেরিয়ে এক ফাঁকে জাহেদার কানে কানে সে বলল, চুপচাপ থাকবে। বোঝার ভাণ করবে। আর তোমাকে আমার বোন বলেছি। ওঁর বাসায় খেতে যেতে হবে কিন্তু।

ডাকবাংলো থেকে বেরিয়ে অল্প একটু গেলেই রাস্তার ওপারে পাবলিক লাইব্রেরী। সমুখে মস্ত মাঠ। আঁধারে ঢেকে আছে এখন। ভুতের মত এক আধটা লোক চলাচল করছে। খোলা দরোজায় লালচে আলো পর্দার মত ঝুলে আছে। মাঠের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগল ওরা। মুর্খানে একূটা বাঁধান বেদির ওপরে খুঁড়ে পাওয়া প্রাচীন কোনো দেবীমূর্তি যেন সন্ধ্যা শাসন করছে। প্রণব বাবু অনর্গল বলে চলেছেন রংপুরের ইতিহাস, এই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার ইতিহাস–এখানকার প্রতিটি বস্তু এবং মানুষের ইতিহাস যেন তার নখদর্পণে।

বারান্দায় দেখা গেল। কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। প্রণব বাবু তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন বাবরের। ভেতরে সে দেখতে পেল শাদা চাদরে ঢাকা একটা টেবিল, তার মাঝখানে স্নিগ্ধ ফুলের স্তবক, সমুখে কিছু ভাঁজ খোলা চেয়ার। প্রণব বাবু আজ না

ডুবিয়ে ছাড়বেন। না। এযে একেবারে একটা সভার আয়োজন। বাবর একটু সন্ত্রস্ত একটু সংকুচিত বোধ করল। পাগলের পাল্লায় পড়া বোধহয় একেই বলে।

প্রণব বাবু বললেন, আরো কিছু সুধী আসবেন, এই এসে পড়লেন বলে, চলুন ততক্ষণে সাহিত্য পরিষদটা ঘুরে আসি। জাহেদাকে বললেন, দিদি, একটু অন্ধকার বটে সাবধানে পা ফেলবেন।

বাবর পকেট থেকে মিনিলাইটটা বের করল। সেদিন কেনার পর আজ এই প্রথম ব্যবহাব হচ্ছে। মাকড়শা জালের মত ফিনফিনে একটা আলো পড়ল ঘাসের ওপব। জাহেদার হাতে দিয়ে বলল, এটা তোমার কাছে রাখ।

ছোট্ট, ঠাণ্ডা, স্যাঁতস্যাঁতে, পরতের পর পরত ধুলো জমা, স্বল্পালোকিত একটা ঘর। মিটমিট করে বাতি জ্বলছে মাথার ওপর। এই সাহিত্য পরিষদ। দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে চারদিকে রাখা সব প্রাচীন মূর্তি মূর্তির ভগ্নাংশ। স্তুপ স্তুপ পুঁথি। একহাঁটু ধুলো তার ওপর। ন্যাকড়া দিয়ে জড়ান কোনোটা। কোনোটায় কাঠের পিড়ি দিয়ে মলাট।

এত পুঁথি এখানে? বিস্ময়ে প্রায় শিষ দিয়ে উঠল বাবর। এবং পরীক্ষণে চৈতন্য হলো তার, শিষটা স্থানোপযোগী হলো না।

কে একজন জবাব দিলেন, আরো বহু পুঁথি ছিল, কিছু নষ্ট হয়েছে, কিছু হারিয়ে গেছে। বহুদিনের বহুকালের সংগ্রহ এসব

দেখতে লাগল বাবর। হঠাৎ দেখে পাশে জাহেদা নেই। ঘরের মাঝখানে প্রশস্ত তাকের জন্য ওপাশে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কেবল ঝর্ণার মত অবিরল প্রণব বাবুর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। কান খাড়া করে বাবর টের পেল, জাহেদাকে তিনি একেকটা সংগ্রহের পরিচয়, ইতিহাস ইত্যাদি বলে চলেছেন। আস্তে আস্তে কাছে গেল বাবর। তার সঙ্গে যারা ছিল তারাও অনুসরণ করলেন। বাবর দেখল একটা ভাঙ্গা বিষ্ণু মূর্তি নত হয়ে দেখছে জাহেদা সেই মিনিলাইট জ্বালিয়ে। সমস্ত পেছনটাকে একটা বিরাট বলের মত মনে হচ্ছে। প্রায় স্পর্শ করে রয়েছে দুই হাঁটু। ফলে চমৎকার একটি জীবন্ত ত্রিভুজের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। বাবর তার সঙ্গীদের দিকে একবার দেখল। এবং তার ভেতরে একটা তীব্র ইচ্ছে লাফিয়ে উঠল এই বাঁঝাল ধুলি গন্ধ স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে জাহেদাকে পেতে, তার শাদা ঐ পোশাকটার ভেতর থেকে শরীরটাকে জন্মদিনের চিঠির মত খুলে ফেলতে। সে টোকা দিল জাহেদার পিঠে।

কী দেখছ?

প্রায় পলকে লাফিয়ে সোজা হলো জাহেদা। বলল, দেখছিলাম।

প্রণব বাবু বললেন, আরো দেখুন দিদি, এই যে পেতলের ধুপপাত্র দেখছেন এটি ডিমলার মহারাজা দান করেছিলেন। অতি প্রাচীন বস্তুটি। অনুমান করা হয় রাজা রামপালের সময়ের। সম্ভবত এই পাত্র দেবীর আরাধনাকালে ব্যবহার করা হতো। দেবদাসীরা নৃত্য করতেন এই ধুপপাত্র কোমল লীলায়িত হস্তে ধারণ করে।

জাহেদা বলল, আই সি।

বাবর তাকে সাততাড়াতাড়ি বলল, জাহেদা, তোমাকে আমি রামপালের কাটা দীঘি রামসাগর, বলেছি না?

বলতে বলতে তাকে নিয়ে বাইরে এলো সে। প্রণব বাবু বলল, চলুন লাইব্রেরিতে যাই। বোধহয় সবাই এসে গেছেন।

আরো কয়েকজন এসে পৌঁছেছেন। দলটা বেশ ভারি হয়ে উঠেছে। জনা ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবেন। প্রণব বাবু হাত ধরে বাবরকে ভাল চেয়ারটায় বসালেন। জাহেদাকে বললেন, বসতে আজ্ঞা হোক দিদি। তারপর করজোড়ে সবাইকে উদ্দেশ করে নিবেদন করলেন, আপনারা আসন গ্রহণ করুন। এটা কোনো বিধিবদ্ধ সভা নয়, সংবর্ধনা হিসেবেও এ আয়োজন অতি সামান্য, আমরা সম্মানিত অতিথির সঙ্গে আলাপ করবার মানসে মিলিত হয়েছি। তার মত মহৎ একজন সংস্কৃতিসেবীর কাছ থেকে দুচার কথা শুনে। ধন্য হব। সুধীবৃন্দ, আপনারা আসন গ্রহণ করুন।

শিশুর মত কৌতূহল নিয়ে জাহেদা তাকিয়ে রইল। বারান্দায় যারা ছিলেন তাঁরা এসে বসলেন। তরুণেরা প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধদের জন্যে সমুখের আসনগুলো ছেড়ে দিল। বাইরে পেয়ালা পিরীচের শব্দ হতে লাগল টুং টাং। বাবর বুঝল, চায়ের ব্যবস্থাও হয়েছে।

প্রণব বাবু একটু থেমে গলা পরিষ্কার করে বলে চলেছেন, অলমতিবিস্তরেণ। সুদূর রাজধানী ঢাকা থেকে আমাদের এই নগণ্য শহরে বাবর আলী সাহেব তাঁর সহোদরাকে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। আমরা তাঁর সান্নিধ্যলাভের এই সহসা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে চাইনি বলেই এই মিলন-সভার আয়োজন। সম্মানিত অতিথির পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। দেশের এই ক্রান্তিকালে নিঃশব্দ দীপাবর্তিকার মত যে কয়জন সংস্কৃতিসেবী এ দেশের অন্ধকারে আলো দিয়ে চলেছেন ইনি তাদেরই একজন।

জাহেদা প্রশ্ন-চোখে বাবরের দিকে তাকাল। একবর্ণ সে বুঝতে পারছে না। বাবর তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল এবং আবার হাতের দশ আঙুল ডগায় ডগায় ছুঁইয়ে একটা শোভন ভঙ্গি ধারণ করে অবনত মস্তকে বসে রইল।

প্রণব বাবু বলছেন, ইনি যখন যেখানে অবস্থান করেন সংস্কৃতির একটা সুবাতাস সেখানে প্রবাহিত হয়ে যায়। আমরা আজ এই মহতী সন্ধ্যায় যে যার কাজ ফেলে ক্ষণকালের জন্যে হলেও এই সুফলা শস্যশ্যামলা স্বদেশের সাহিত্য-শিল্প সংস্কৃতির দিকে যে মনঃসংযোগ করেছি তা এই বাবর আলী সাহেবের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে, সম্মোহনে। বন্ধুগণ, কিমত্র চিত্রং যদি বিশাখে শশাঙ্কলেখামনুবর্ত্ততে?–অর্থাৎ বিশাখা তারা দুটি যে সর্বদাই চন্দ্রের অনুকরণ করবে, অনুসরণ করবে, এত আশ্চর্যের কী আছে? প্রণব বাবু স্নিগ্ধ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে সস্নেহে সবার ওপর চোখ বুলিয়ে আনলেন। তারপর বললেন, ইনি একজন সুনিপুণ বক্তা। এর বক্তৃতার অনায়াস ভঙ্গি, যুক্তির অপূর্ব ঋজুতা—

জাহেদা বলল, কী বলছেন উনি?

বাবর নীরবে হাসল এবং শুনতে পেল তাকে এবার প্রবন্ধকার, সমালোচক, দার্শনিক ইত্যাদি একের পর এক বলা হচ্ছে। অভিভূতের মত তাকিয়ে আছে জাহেদা। একাগ্র হয়ে প্রণব বাবুর বক্তৃতা শুনছে উপস্থিত সকলে। মাথার ওপরে জ্বলছে কড়া শাদা আলো। চারদিকের আলমারিতে সার সার বই, নীল সবুজ হলুদ কাপড়ে বাঁধান, ক্রমিক সংখ্যার টিকিট সাটা। একটা টিকটিকি কাচের ওপর পেট চেপে স্থির হয়ে আছে।

বাবরের হঠাৎ কথাটা মনে হলো। ফিসফিস করে হেসে বলল, জাহেদা, তখন স্বপ্ন আর বাস্তবের কথা বলছিলাম।

জাহেদা মাথা ঝুঁকিয়ে নীরবে সায় দিল।

স্বপ্ন থেকে বাস্তবের কোনো তফাৎ নেই। বাবর নিচু গলায় বলে চলল, একটা বাঘ মনে কর হরিণকে দেখতে পেয়েছে। সে স্বপ্ন দেখল ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার ওপর, এবং তক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। দুয়ের মধ্যে এক পলেরও কম ব্যবধান। আসলে স্বপ্ন হচ্ছে ভবিষ্যৎ। কিন্তু ভবিষ্যৎ আসলে বর্তমানেরই সম্প্রসারণ।

বাবর থেমে থেমে বলছিল এবং ফাঁকে ফাঁকে সভার দিকেও তাকাচ্ছিল। এক সময়ে দেখল সভার ভেতর থেকে একজন উঠে স্থানীয় সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর বর্ণনা দিতে শুরু

করলেন। বক্তা অত্যন্ত আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বর্ণনা করে চলেছেন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কী কী বাঁধার সম্মুখীন তারা প্রতিনিয়তই হন। একটা টুকরো কানে এলো এখন বাবরের—

রবীন্দ্র-বিরোধী দল এখানেও বেশ ভারি। এবং তাদের অনেকেই আমাদের মুরুকিব। মফঃস্বলে অসুবিধা এই মুরুব্বিদের বিরোধিতা প্রকাশ্যে করা যায় না। এখানে সবাই আমাদের বাবা-চাচা কিংবা বাবা-চাচার মত। বাবা-চাচার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারপর ধরুন— বর্ষা। সেবার বর্ষ উপলক্ষে আমরা একটি গান ও কবিতার আসর করতে চেয়েছিলাম। সবাই হাঁ হাঁ করে উঠলেন, আমরা হিন্দু হয়ে গেছি। বর্ষার গানের আসর করলে যদি সেই হিন্দু হয়ে যায়, তাহলে ঈদের নামাজ পড়লেই মুসলমান তাকে বলতে হবে?

সহাস্য দুঃখিতভাবে মাথা নাড়লেন সবাই।

বক্তার কণ্ঠ আবেগে আরো ঘন হয়ে উঠল।

জাহেদা জিগ্যেস করল চাপা গলায়, তখন কী একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন বলছিলেন।

হ্যাঁ।

দেখেছিলাম, মিসেস নাফিস, তাকে চেনো? না, তুমি চিনবে না। তাকে দেখি ঢাকার রাস্তা দিয়ে এক ষাঁড়ের পিঠে চড়ে যাচ্ছেন। সম্পূর্ণ উলংগ। কিন্তু সেটাই যেন স্বাভাবিক। কেউ ফিরেও দেখছে না। যে যার মত চলে যাচ্ছে।

লজ্জায় মাথা নিচু করল জাহেদা।

বাবর তখন বলল, বাংলা ভাল বোঝা না বোঝা শোনার ভাণ করে যাও।

এবারে শোনা গেল, বক্তা বলছেন, এই কথাগুলো আমাদের প্রিয় বাবর সাহেবকে বললাম, তিনি যেন ঢাকায় গিয়ে সমস্ত শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীকে জানিয়ে দেন।

আমার আর কিছু বলার নাই। প্রণব বাবু বললেন, আমরা স্থানীয় তরুণ কবি, আমাদের পরম স্নেহভাজন আকসাদ মোল্লার কথা শুনলাম। এবার বাবর সাহেব আপনি কিছু বলুন।

বাবর সলজ্জ হেসে বলল, বলতেই হবে?

কিছু না বললে, এরা সবাই এসেছেন, বলুন কিছু।

বাবর উঠে দাঁড়াল। সবার দিকে দেখে মুখ নিচু করল একবার। সত্যি বলার কিছু খুঁজে পাচ্ছে না সে। এক মুহূর্ত পর তার চিরকালের যে অভ্যোস ঝুঁকির মধ্যে বাস করা, সেই অভ্যেসের বশে কিছু না ভেবেই শুরু করল এবং বলতে বলতে নিজেই আরেকবার

চমৎকৃত হলো নিজের গুণে, চমৎকৃত হলো কথার পিঠে কথা কী স্বচ্ছন্দভাবে এসে যাচ্ছে বলে।

সে বলতে লাগল, বন্ধুগণ! প্রণব বাবু আসলে একটি পরকলা। ছোট জিনিস বড় দেখায় তার কল্যাণে। নইলে আমার মত মানুষকে যে সমস্ত বিশেষণে তিনি সম্মানিত করেছেন, তার একটিও শাদা চোখে দেখা যেত না। মানুষকে, কোনো মানুষকে এই যে আপন করে নেবার অসাধারণ ক্ষমতা, তার এবং আপনাদের সবার, এর একটা বিশেষ মূল্য আছে। এটা প্রাণের পরিচয় বহন করে। নির্মল প্রাণ, স্বচ্ছন্দ প্রাণ, সংবেদী প্রাণ। আমি বলি, সবার ওপরে এই প্রাণের স্থান। এই প্রাণের অনুমতি নিয়ে, এই প্রাণের অন্তর্নিহিত শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে, এই প্রাণের প্রেরণায়, যারা যা কিছু করেন তাই সত্য, তাই সুন্দর, তাই কল্যাণ। মনের ভাষা আমরা সবাই শুনতে পারি না। আপনাবা শুনছেন। তাই আপনারা আমার চিরকালের প্রিয় হয়ে রইলেন। আজকের এই সন্ধ্যার স্মৃতি আমি আমৃত্যু বহন করব। এবং হ্যাঁ আপনাদের ক্ষোভ, আপনাদের এই প্রতিরোধের সংবাদ আমি ঢাকার শিল্পী সাহিত্যিকদের কাছে পৌঁছে দিব। আপনাদের রংপুরের ছেলে সৈয়দ শামসুল হক, টেলিভিশনে প্রায়ই আসেন, আমি তাকে বিশেষ করে বলব। ধন্যবাদ।

একজন তরুণ উঠে দাঁড়াল। বলল, তাঁকে বলবেন সিনেমার জন্যে লিখে, টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করে যেন নিজেকে নষ্ট না করেন। আমাদের দাবি আছে তাঁর ওপরে।

বাবল বলল, আমি যতদূর জানি, সেটা তার জীবিকা। তিনি তো লিখছেন। অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা এসব করেও তো লোকে লেখে।

আরেকজন উঠে দাঁড়াল। হাত নেড়ে বলল সে, হক সাহেবকে বলবেন তিনি যেন ব্যক্তির কথা না লিখে সমাজের কথা লেখেন! আমরা বেঁচে থাকতে চাই, আমরা সংগ্রাম করছি সে নিয়ে তাকে উপন্যাস লিখতে বলবেন।

আচ্ছা বলব।

আরো একজন উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, তাকে বলবেন গোর্কির মার মত উপন্যাস কেন হচ্ছে না? নাজিম হিকমতের মত কবিতা কেন বেরুচ্ছে না? আমরা জানতে চাই।

নিশ্চয় বলব। আমি জানতাম না। তিনি জীবনের কথা লেখেন না।

তাঁকে লিখতে বলবেন।

সভা শান্ত হলো। চা এলো, সন্দেশ এলো। সভা শেষে হাঁটতে হাঁটতে সবাই বাবর জাহেদার সঙ্গে ডাকবাংলো পর্যন্ত এলো। তারপর বিদায় নিল একে একে। সবাই অনুরোধ করল আরো একদিন থেকে যাবার জন্য। না, কালই বেরুবে বাবর। অনেকেই বাসায় ডাকলেন, অনুগ্রহ করে চাট্টি খাবেন। অনেক ধন্যবাদ, প্রণব বাবুর বাড়ি আপনাদের সবারই বাড়ি, সেখানে আতিথ্য স্বীকার করেছি, মনে করব আপনাদের সবার প্রতিনিধি তিনি।

প্রণব বাবু বললেন, চলুন তবে, রাত হয়ে গেল।

করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

বাবর জাহেদাকে বলল, চল, খেয়ে আসি।

গাড়ি করে বেরুল ওরা। শীতের মফঃস্বল। হিম হিম হাওয়া বইছে। ঘুমিয়ে পড়ার আয়োজন করছে। সারা শহর। এখানে ওখানে বাতি জ্বলছে, গান হচ্ছে কোথাও লাউড স্পীকারে, চাদর মুড়ি দিয়ে রিকশা চালাচ্ছে রিকশাওয়ালা। বড় রাস্তা থেকে বাঁয়ে কেটে একেবারে অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে পড়ল ওরা। পেছনে প্রণব বাবু। সামনে জাহেদা। বাবর জাহেদার আঙুল স্পর্শ করল একবার। বরফের মত ঠাণ্ডা।

এইবার ডানে, ডানে যান মশাই। এই ডাইনে।

অন্ধকার গলিটাতে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে লাগল বাবর। জাহেদা বলল, এত চুপচাপ আর অন্ধকার কেন?

পেছন থেকে হাসলেন প্রণব বাবু।

দিদি, এ যে মফঃস্বল। এই যে এলাকাটা দেখছেন পঞ্চাশ বছর আগেও এখানে বাঘ টাঘ দেখা যেত। বাবর সাহেব, যদি একটু কষ্ট করেন, এই সামনেই, দেবী সিংহের দরবার যেখানে ছিল দেখিয়ে আনি?

এই রাতে? থাক।

এখন অবশ্য নেই কিছু। শুধু ফাঁকা মাঠ। তবু দেখতেন। একবার কী হলো জানেন, কলকাতা থেকে তিন ইংরেজ কাপ্তান পাঠানো হয়েছে দেবী সিংকে গ্রেফতার করতে। দেবী সিংহ খবর পেয়ে এক হাজার সেপাই নিয়ে দরবার জাঁকিয়ে হুঁকোর নল হাতে করে গদিতে গদিয়ান হয়ে বসলেন।

দেবী সিং কে? জাহেদা জিগ্যেস করল।

প্রণব বাবু বাবর আর জাহেদার মাঝখানে মাথা এগিয়ে বললেন, দেবী সিং? সে এক নররূপী রাক্ষস। রক্ষসের তবু ক্ষুধার তৃপ্তি আছে, তার ছিল না। তার অত্যাচারে প্রজাকুল জর্জরিত হয়ে উঠেছিল। বাবর সাহেব জানেন না বোধহয়, এই রংপুরেই প্রথম কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। ব্যাস, এই আমার বাড়ি মশাই, এইখানে রাখুন।

দরোজা খুলে চটি ফটফট করে এগিয়ে গেলেন পুরনো খোয়া ওঠা বিশাল দুটো থামের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ডাকলেন, কইরে, রামটহল ব্যাটা কুম্ভকর্ণ। ওঠ, ওঠ। লণ্ঠনটা ধর। এই যে আসুন, সাবধানে, সিঁড়ির একটা দিক ভাঙ্গা আছে।

ভেতরের আঙিনায় গিয়ে পড়ল ওরা। বিশাল উঠান। চারদিকে চাকমিলানো ঘর। সব ঘরের দরোজা বন্ধ। অন্ধকার। ভূতুড়ে বাড়ির মত মনে হয়। মনে হয় যারা ছিল তাদের কথাবার্তা নিঃশ্বাস এখনো গমগম করছে।

প্রদীপ হাতে এক তরুণী কোথা থেকে বেরিয়ে এসে বলল, নমস্কার।

এটা হচ্ছে সুষমা।

চৌকো শ্যামল মুখ। চোখে ঘুম জড়ান। মিষ্টি হেসে বলল, আসুন।

সব তৈরি তো সুষি? প্রণব বাবু জিগ্যেস করলেন।

কখন সব করে রেখেছি। কাকা, তুমি ওঁদের বসতে দাও। আমি এক্ষুণি আসছি।

চলে যেতে যেতে সুষমা জাহেদার দিকে তাকিয়ে আবার হাসলেন। নির্মল কিন্তু করুণ একখণ্ড হাসি। চোখে লেগে রইল বাবরের।

প্রণব বাবু বললেন, আমার এক আশ্রিত পরিবার, তাদের মেয়ে। আমার কেউ না। আমার দেখাশোনাটা হয়ে যায়, বাড়িটাও খালি থাকে না। এই আর কী।

ভেতরে গিয়ে বসল। ওরা। একদিকে বিরাট একটা খাট–ব্যাডমিন্টন খেলার মাঠের মত। এতবড় বিছানা এর আগে কখনো বাবর দেখেনি। জাহেদা বলে উঠল, মাই গুডনেস।

আগাগোড়া নিভাঁজ চাদর। একজোড়া বালিশ। তিনটে কোলবালিশ মুখখোলা নিখুঁত একটি আয়তক্ষেত্র সৃষ্টি করে আছে মাঝখানে। বিশাল মশারির মুখটা থিয়েটারের পর্দার মত দুদিক থেকে তোলা। ঘরের আরেক দিকে প্রণব বাবু লেখাপড়া করেন। সুন্দর করে সাজান টেবিল। পুরনো কাচের আলমারি। ভারি ভারি কাসার তৈজসপত্র। দেয়ালে বাধান স্বামী বিবেকানন্দ। আরেক দিকে জিন্নাহ সাহেবের ঐঙ্গিন একটা ছবি! একটা পুরনো ঢাল ঝুলছে। খোলা জানালায় স্তিমিত হয়ে আছে অন্ধকার। দুটো গোল পাথরের টেলিল ঘরের মাঝখানে এনে খাড়া পিঠ চেয়ার টেনে প্রণব বাবু বললেন, আসন নিন।

বাবর জিগ্যেস করল, আপনার পিতৃপুরুষের কারো ছবি দেখছি না।

ছিল। সব ছেলেমেয়েরা নিয়ে গেছে। আমার হয়েছে মশাই সেই অবস্থা–কৃত্যয়োর্ভিন্ন দেশাত্বাব্দ দ্বৈধীভবাতি মসে মনঃ, পুরঃ প্রস্হিতং শৈলে স্রোতঃ শ্রোতোবাহো যথা। অর্থাৎ কিনা, পর্বতে নদী বাধা পেলে যেমন দুভাগ হয়ে যায়, আমার মনের অবস্থাও তাই। ছেলেমেয়েরা ইন্ডিয়া চলে গেল, আমি পারলাম না। বুঝে দেখুন মশাই। এটা আমার দেশ নয়? আমার মাটি নয়? এক কথায় চলে যাব? বলি, মাটি কখনো পর হয়ে যায়? শুনে দেখবেন মশাই যারা গেছে তারা ঐ রাত্তিরে দেশের দিকে মুখ করে কাঁদে।

এর মধ্যে নিঃশব্দে সুষমা খাবার সাজিয়ে দিয়েছে। এখন সেই মিষ্টি হাসিটা ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এককোণে।

গরম ধোঁয়া ওড়ানো ভাত। তার ওপর গলে পড়ছে সোনার মত ঘি। চারদিকে ছোট ছোট দশ বারোটা করে বাটি। সব নিরামিষ। কোনোটায় ঝাল, কোনোটায় ভাজা, টক, মিষ্টি তেতো, দুরকম ডাল, বেগুনি, চচ্চড়ি, মাংসের মত করে রাধা ছানার বিরফি, অম্বল, কিসমিস উঁকি দিচ্ছে কোনোটা থেকে।

সুষমা বলল, কাকাবাবু শুধু বকবক করেন। আপনারা খান তো।

একটি বাটি নিতে যাচ্ছিল, সুষমা বলল, না, ওটা নয়। এটা নিন। আগে ঐটে খেতে হয়। একের পর এক বলে যেতে থাকল সুষমা, কোন বাটিতে কী, কোনটার পর কোনটা খেতে হয়। প্রণব বাবু বললেন, নিজের বাড়ি মনে করে খাবেন দিদি। কী ছাইপোশ রেঁধেছে কে জানে? সুষি পড়াশোনায় যেমন লাড্ডু তেমনি রাঁধাবাড়ায়। বুঝলেন? দোষ নেবেন না।

না, না, চমৎকার হয়েছে। এত সুন্দর রানা বহুকাল খাইনি।

বাবারের সঙ্গে জাহেদাও যোগ করল, খুব ভাল।

কিন্তু কৌতুকের সঙ্গে বাবর লক্ষ করল, জাহেদা খাচ্ছে কত। শুধু নিরামিষ দেখে হকচকিয়ে গেছে বেচারা। প্রণব বাবুকে জিগ্যেস করল জাহেদা, মাছ মাংস ডিম কিছু খান না আপনি?

আমি তো খাইই না, আমার সাতপুরুষে কেউ কখনও খায়নি।

পারেন না খেয়ে?

হ্যাঁ, পারব না কেন? কোনো অসুবিধে হয় না তো!

মাছ মাংস যারা খায় তাদের অপছন্দ করেন?

হা হা করে হেসে উঠলেন প্রণব বাবু।

কেন, এই যে সুষি, সুষমা! ওরা মাছ মাংস হরদম খাচ্ছে।

বাবর জিগ্যেস করল, সুষমাকে এই প্রথম সে কথা বলল, তুমি পড়?

হ্যাঁ।

কী পড়?

এবার বি.এ পড়ছি। ফাস্ট ইয়ার।

বাহ, চমৎকার।

ও-কী, হয়ে পেল?

হ্যাঁ, অনেক খেয়েছি।

না, না, ঐ কটা ভাত রাখলেন যে। জাহেদাকে বলল, আপনি তো কিছুই খেলেন না।

জাহেদা হাসল।

সুষমা দুগ্লাশ গরম দুধ নিয়ে এলো। বাবর বলল, এ-কী!

কিছু না। দেখতেই তো পাচ্ছেন। খেয়ে নিন।

দুধ খাবার তো অভ্যেস নেই। বাবর বলল, জাহেদা?

জাহেদা মাথা নাড়াল।

নিঃশব্দে সুষমা একে একে সব বাটি থালার ওপর সাজিয়ে চলে গেল। ফিরে এলো রূপার তশতরিতে সুন্দর করে কাটা সুপুরি আর লং এলাচ নিয়ে। বলল, বারান্দায় হাত ধোয়ার জল আছে।

বারান্দায় এসে গায়ে কাঁপুনি তুলে জাহেদা বলল, যা অন্ধকার। নিচু গলায় বাবর জিগ্যেস করল, খেয়েছ ঠিক মত? কেমন লাগল?

এক রকম। — দেখেছেন মেয়েটা কেমন অন্ধকার দিয়ে যাচ্ছে, আসছে, একটু ভয় নেই।

কীসের ভয়?

সাপ-টাপ। বলেই শিউরে উঠল জাহেদা। কোনো রকমে হাত মুছে ঘরে ছুটে গেল।

বাবর ভেতরে এসে বলল, জানেন প্রণব বাবু, আজ সকালে মহারাজ দর্শন হয়েছে।

মহারাজ মানে?

প্রায় পাঁচ হাত লম্বা এক গোখরো।

সঙ্গে সঙ্গে কাঁন্দ কাঁদ হয়ে গেল জাহেদা। বলল, প্লীজ।

হা হা করে হেসে উঠে কোলে বালিশ টেনে প্রণব বাবু বললেন, দিদির বোধহয় খুব ভয়? তাহলে শুনুন বলি, আপনি ওকে যতটা ভয় পান, ও-ও আপনাকে ঠিক ততটাই ভয় পায়। আপনি কিছু না করলে ও আপনাকে কিছুই করবে না।

অবিশ্বাস আর ভয় ভরা চোখে তাকিয়ে রইল জাহেদা।

প্রণব বাবু বলে চললেন, জন্তু জানোয়ার এদের মধ্যে এই নিয়মটা ভাল, যার যার তার তার মত থাকে। কেউ কারো গায়ে পড়ে কিছু করতে ওরা একেবারেই নারাজ। কেবল মানুষের মধ্যেই এটি দেখবেন না। গায়ে পড়ে আপনার উপকার করবে, গায়ে পড়ে আপনার ক্ষতি করে যাবে। কোথা থেকে কে যে কোন কলটি নেড়ে দিলেন টেরটি পাবেন না মশাই। ভয় পাবেন না দিদি। সাপের দেশ রংপুর। জীবন কাটিয়ে দিলাম। কত রকম সাপ দেখলাম, এখনো তো বেঁচে আছি। শুনুন তবে।

জাকিয়ে গল্প বলতে শুরু করলেন তিনি। তাঁর তখন ছেলেবেলা, একদিন রাতে ঘুম ভেঙ্গে দেখেন বাড়িশুদ্ধ মানুষ জেগে। সবাই চুপচাপ, শ্বাস-প্রশ্বাস একেবারে বন্ধ। শুধু ওপাশের ঐ ভাড়ার, ওখান থেকে ভীষণ ফোসফোসানি আর ঠকাস ঠকাস একটা শব্দে শোনা যাচ্ছে। খুড়ো মশাইয়ের কোলে চেপে গিয়ে দেখেন, হারিকেনের আলোয় দেখা যাচ্ছে ইয়া এক কেঁদো সাপ। এই এতবড় একটা ফণা–প্রণব বাবু দুথাবা পাশাপাশি ধরে দেখালেন। দুধের মত ধবধব করছে, মাথায় সিঁদুরের ফোঁটা। কী গর্জন তার। লকলক সকসক করছে জিভ। চোখ হীরের মত জ্বলজ্বল করছে–এই এত বড় বড় দুটো চোখ। একবার করে ছোবল মারছে একটা ছোট্ট খাট ছিল বাচ্চাদেশ, ভাঙ্গা, তার পায়ার ওপর।

আবার ঘুরে যাচ্ছে। আবার গজরাচ্ছে, আবার এক ছোবল। শব্দ উঠছে ঠিকাস ঠকাস। ফোসাচ্ছে না তো যেন শালকাঠ চিরছে করাতিরা। সে-কী ভয়ানক ক্রোধ। রাজকীয় ক্রোধ মশাই! সে-কী সৌন্দর্য। সে-কী আক্রোশ। বাবা লোক পাঠালেন সামাদ নামে এক চরিত্রের কাছে। ইয়া দশাসই চেহারা, লাল ভাটার মত চোখ, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবড়ি, দেবী চৌধুরাণী দলের ডাকাত যেন মশাই। সে খবর পেয়ে তেলপাকা কুচকুচে লাঠি নিয়ে এলো। এলো বটে। কিন্তু দূর থেকে দেখেই বলল, কর্তা, বলেন তো জান দেব, কিন্তু সাহস পাই না। সালাম করে চলে গেল সে।

যতটা সঙ্কুচিত হয়ে থাকা যায় জাহেদা তাই আছে। বারবার পায়ের কাছে দেখছে। মুখ একেবারে ছাই। বাবর বলল, সাপটা অমন করছিল। কেন?

কী জানি মশাই, তা জানি না। বোধহয় কোনো ইঁদুর টিদুর ফসকে গিয়েছিল।

আর কোনোদিন দেখেছেন? সম্মোহিত গলায় জাহেদা প্রশ্ন করল। ভয়ের একটা সম্মোহন আছে যখন আর ভয় করে না।

না। আর একবার দেখেছিলাম। বাবা মারা গেলেন। শ্মশান থেকে ফিরে এসে দাওয়ায় বসে আছি দেখি সাপটা চলে যাচ্ছে।

কোথায়?

বোধহয় বাড়ি ছেড়েই যাচ্ছিল। তারপর আর দেখিনি। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন প্রণব বাবু। সাপ না স্বর্গীয় পিতা কাকে তিনি কল্পনায় প্রত্যক্ষ করছেন বোঝা গেল না। গমগম করতে লাগল সারা ঘর। বাবর তাকিয়ে দেখল সুষমা কখন দরোজার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

স্মিতহাসি ফুটে উঠল প্রণব বাবুর মুখে।

আরেক দিনের কথা। এই তো মাত্র বছর খানেক আগে। সেদিন একেবারে ফুটফুটে পূর্ণিমা। রাত অনেক হয়েছে। সুষিরা ঘুমিয়ে পড়েছে। বারান্দায় চুপচাপ একা বসে আছি। রামটহল ব্যাটা সেদিন, ইয়ে, সিদ্ধি বানিয়েছিল, একগ্লাশ পান করা হয়েছে। এই যে বারান্দা, এখন রাত বলে বুঝতে পারছেন না, এর পুব কোণ থেকে বাঁশঝোপটা দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়ে আছি। পূর্ণিমার আলোয় খাড়াখাড়া ছায়া পড়ে ভারি সুন্দর লাগছিল। বাঁশতলা। হঠাৎ দেখি জোড়ায় জোড়ায় সাপ।

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল জাহেদা। বাবর তার হাত ধরল ক্ষণেকের জন্যে।

বুঝলেন, জোড়ায় জোড়ায় সাপ। একজোড়া দুজোড়া নয়, অন্তত শখানেক হবে। একেবারে কিলবিল কিলবিল করছে। পূর্ণিমার আলোয় দেখাও যাচ্ছে স্পষ্ট। সব মাথা তুলে জড়াজড়ি করে নাচছে। নাচ করছে মশাই, নাচ। হেলে দুলে ডাইনে বাঁয়ে। এমনি এমনি করে।

প্রণব বাবু নিজের দুহাত জড়িয়ে ফণার মত তুলে নাচিয়ে নাচিয়ে দেখালেন।

জাহেদা বাবরের হাত শক্ত করে ধরল। বলল, চলুন।

হ্যাঁ, এইতো।

খপ করে হাত নামিয়ে নিলেন প্রণব বাবু।

যাবেন?

ওর শরীরটা ভাল নেই। তাছাড়া ছেলে মানুষ তো, ঘুম পাচ্ছে। রাত হলো। বড্ড হতাশ হলেন প্রণব বাবু। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও উঠে দাঁড়ালেন। হতাশ গলায় বললেন, আর একটু বসবেন না? চা খাবেন? চা? সুষি চা করে আনুক।

না, এত রাতে আর কষ্ট করবেন না। এমনিতেই সুষমাকে অনেক জ্বলিয়ে গেলাম।

সুষমা পথ ছেড়ে দিয়ে আবার সেই মিষ্টি হাসিটা তৈরি করল।

১৭. শীত করছে

গাড়িতে বসে গায়ে কাঁপন দিল জাহেদার। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। এতক্ষণ শিশিরে ভিজে ভেতরটা একেবারে হিমাগার হয়ে আছে।

শীত করছে?

হুঁ।

বাবর তার জ্যাকেট খুলে দিল।

এটা জড়িয়ে নাও।

না।

দাঁতে দাঁত বেজে উঠল জাহেদার। বাবর শাসন করে উঠল, শীতে মরবে তবু কথা শুনবে না মেয়ে।

জোর করে জ্যাকেটটা চাপিয়ে দিল জাহেদার গায়ে। বলল, গাড়ি চললে ভেতরটা গরম হয়ে উঠবে।

আপনার শীত করবে না?

করবে তো! তা কী করা যাবে? ঠাট্টা করে বাবর বলল। বড় রাস্তায় এসে জিগ্যেস করল। ঘরে যাবে, না একটু ঘুরে আসবে?

জাহেদা কোনো কথা বলল না।

চল, ঘুরেই আসি। কারমাইকেল কলেজের দিকে গাড়ি ছোটাল বাবর। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর বলল, থমথমে এই রকম রাতে তোমাকে আর কবে নিয়ে বেরুব, কে জানে?

কেন বলছেন?

এমনি। আমার খুব ভাল লাগছে। যা ভাল লাগে তা ধরে রাখা বোকামি। মানুষ ধরে রাখতে চায় বলেই দুঃখ পায়। আসলে সব কিছুই একটা স্রোতের মত। সুখ, ঐশ্বর্য, জীবন, আকাশ, বিশ্ব, মহাবিশ্ব, ছায়াপথ, তারকাপুঞ্জ, সব কিছু। সমস্ত কিছু মিলে প্রবল শুভ্র জ্বলন্ত একটা মহাস্রোত মনে হয়। দুঃসহ কষ্ট হয় তখন। আমার জীবনে যদি একটা কোনো কষ্ট থাকে তাহলে তা এই! এই মহাস্রোতের সম্মুখে আমি অসহায় তুচ্ছ। তুমি আমি এই শহর, মহানগর, সভ্যতা সব অর্থহীন বলে মনে হয়। আমি কী করলাম, তুমি কী করলে, ন্যায়অন্যায় পাপ-পুণ্য, মনে হয় সবই এক, সব ঠিক আছে–কারণ সবই কত ক্ষুদ্র।

বাবর হাসল। অনুভব করল জাহেদা তার দিকে তাকিয়ে আছে।

কিছু বলছ না?

উঁ।

শুনছ?

হ্যাঁ শুনছি।

এই মহাস্রোতে কোথাকার কে বাবর আলী খান। বাবর হাসল। কে তুমি কোন সাত্তার চৌধুরীর মেয়ে জাহেদা। বাবর আবার হাসল। কিছু এসে যায় না। কে একজন তার নাম সেক্সপীয়ার, সে হ্যামলেট লিখল কি না লিখল, তাও কিছু নয়। এই পৃথিবীর মত কত কোটি পৃথিবী আছে, কত কোটি হ্যামলেট লেখা হয়েছে, কত বিতোভেন সোনাটা লিখছে, কত বাস্তিলের পতন হয়েছে–কতটুকু জানি! এই পৃথিবী আদিতে ছিল উত্তপ্ত একটা পিণ্ড, কোটি কোটি বছর পর একটা শীতল প্রাণহীন বস্তুপিণ্ড হয়ে তা মহাশূন্যে ঘুরতে থাকবে। তখন কোথায় তোমার বাবার আলী কোথায় জাহেদা, কোথায় সেক্সপীয়ারের হ্যামলেট আর জাপানের সামুরাই আকাশ ছোঁয়া দালান আর সমুদ্রে ভাসমান কুইন এলিজাবেথ। হাঃ। বাবর হাসল। সাঁ করে গাড়ি ঘুরিয়ে বলল, চল ফিরে যাই।

ফিরতে ফিরতে বাবর আবার হাসল।

হাঃ। জান জাহেদা, মানুষ সেই জন্যেই বোধহয় ঈশ্বরের কল্পনা করে। ঈশ্বরের ধারণা একটা সীমার আরোপ, একটা আকার প্রদানের প্রচেষ্টা মাত্র। এই অনন্তকে ধারণ করতে পারি না বলেই নামে একটা ফ্রেম দিয়ে নিয়েছি। কিন্তু যাক। আমার কষ্ট হচ্ছে।

জাহেদা আবার বাবরকে দেখল। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যে। আবার সে দ্রুত অপসৃয়মাণ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। ডাকবাংলোয় এসে জ্যাকেট ফিরিয়ে দিল জাহেদা। সেটা ডান হাতে ঝুলিয়ে বাঁ হাতে জাহেদাকে বেষ্টন করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল বাবর। বলল, হেডা, আমরা যেখানে, সেখানে আগেও ছিলাম, এখনও আছি, পরেও থাকব।

পরিচিত কথাটা শোনে জাহেদার মুখে হাসি ফুটে উঠল। অর্থহীন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মাথার চুল ঝাড়লো সে। তখন অতি সুন্দর দেখাল। আকাজক্ষা ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবরের সারা দেহে! ভেতরে একটা ক্ষুদ্র সূর্য উদিত হয়ে তাপ বিকিরণ করতে লাগল। অকস্মাৎ। চকিতে চোখে ভেসে উঠল।। বিষ্ণু মূর্তির ওপর ঝুঁকে পড়া জাহেদার ছবিটা। আঙুলগুলি উদগ্রীব হয়ে উঠল। স্পর্শ করতে। দরোজা খুলতে কেঁপে উঠল তার হাত। দুতিনবার চেষ্টা করে তালায় চাবি পরানো গেল।

দরোজা খুলে দেখে দুদিকে বিছানা সুন্দর করে পাতা। মাঝখানে চেয়ার, তার ওপর পানির জগ, গ্লাশ। দুবিছানায় দুটো কম্বল দেখে অবাক হলো বাবর। আর একটা কখন

দিয়ে গেছে চৌকিদার? তাকে তো সে দিতে বলেনি? নাকি, বিকেলে যখন সে ঘুমিয়েছিল তখন জাহেদা বলেছে! সহাস্য ঠোঁট কামড়ে ধরে একটু দাঁড়িয়ে রইল বাবর। জাহেদা বাথরুমে গেল।

তখন পাজামা পরে নিল বাবর তাড়াতাড়ি। জাহেদা ফিরে এলো পোশাক পাল্টে। নীল শাদা ডোরা কাটা চিলে পাজামা। এসে সোজা কম্বলের তলায় ঢুকে মুখ পর্যন্ত টেনে দিয়ে মরার মত পড়ে রইল। কেবল পেটের কাছটা ওঠা নামা করতে লাগল তালে তালে। বাবর তখন টিপে টিপে আয়নার সামনে ফুলদানি থেকে ফুল নিয়ে কটা পাপড়ি ছিড়ল, পাপড়িগুলো ঝুরঝুর করে ফেলে দিল জাহেদার পেটের ওপর। তালে তালে পাপড়িগুলো উঠতে লাগল, পড়তে লাগল আবার উঠল, অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখল বাবর। জাহেদা এতটুকু নড়ল না। এতটুকু কৌতূহল হলো না জানতে নিঃশব্দে বাবর কী করেছে। টুক করে বাতিটা নিভিয়ে দিল বাবর। গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল সমস্ত অস্তিত্ব। বাবর নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল কম্বল টেনে। বলল, শুভরাত্রি।

কোনো জবাব দিল না জাহেদা।

বাবর একটা সিগারেট ধরাল। বাথরুম থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ার শব্দ আসছে। সিক্ত অবিরাম একটা শব্দের স্রোত। অনেকক্ষণ পর চৈতন্য হলো সিগারেটটা পুরে ছাই হয়ে গেছে, আঁচ লাগছে আঙুলে। সেটা নিভিয়ে আরেকটা ধরাতেই কাঠির আলোয় দেখল জাহেদার মুখ খোলা, বুকের ওপর হাত বিছিয়ে ছাদের দিকে অপলক চোখে

তাকিয়ে আছে সে। আস্তে আস্তে আলো কমে এলো, অন্ধকার বাড়তে লাগল। কাঠিটা লাল ছাই হয়ে গেল। জাহেদা তেমনি তাকিয়ে রইল শূন্যের দিকে।

জাহেদা।

উঁ।

ঘুম আসছে না?

জাহেদা কোনো জবাব দিল না। বাবর সিগারেট খেতে লাগল। নিঃশব্দে। আবার সে জিগ্যেস করল, নিজের সমুখের দিকে চোখ রেখেই, কী ভাবছ? আমাকে বলবে না?

তখন প্রায় ফিসফিস করে জাহেদা উত্তর করল, আমি এখন আমার মা-র কথা ভাবছি। বাবর শুধু বলল, হ্যাঁ।

নিস্তব্ধ কয়েকটি মুহূর্ত পার হয়ে গেল। জাহেদা আবার বলল, শূন্যের দিকে তেমনি তাকিয়ে থেকে, আমি এখন আমার বাবার কথা ভাবছি।

হ্যাঁ।

আরো কয়েকটি মুহূর্ত গেল। আরো কয়েকটি দীর্ঘ মুহূর্ত।

আমি এখন পাপ্পুর কথা ভাবছি।

হ্যাঁ।

একটি যুগ অতিবাহিত হয়ে গেল। জাহেদা তখন বলল, আমি এখন হোস্টেলের সবুজ মাঠটা দেখতে পাচ্ছি।

হ্যাঁ।

আমি এখন আরিচার ফেরিবোটে।

হ্যাঁ, জাহেদা, হ্যাঁ।

আমি এখন সেই ছেলেটার কথা ভাবছি।

চুপ করে রইল জাহেদা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল বাবর জাহেদার কণ্ঠস্বরের জন্যে। কিন্তু নীরবতা শাসন করতে লাগল। এই ঘর এবং ঘরের বাইরে সম্পূর্ণ বিশ্বটাকে। তখন বাবর তাকিয়ে দেখল জাহেদা কখনো তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে। তার নাক, চিবুক, গ্রীবার উপত্যকা অন্ধকারের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার হয়ে ফুটে আছে।

চোখ ফিরিয়ে নিল বাবর। সেও তাকিয়ে রইল। তার সমুখে। ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়তে লাগল বাথরুমে। বালিশের নিচে হঠাৎ প্রবল হয়ে উঠল। হাত ঘড়ির টিকটিক। তার সমস্ত অস্তিত্বকে ঠুকে ঠুকে বাজিয়ে যেতে লাগল ওটা।

জাহেদা তখন ভীরু কণ্ঠে জিগ্যেস করল, জেগে আছেন?

বাবর তখন শুনল কিন্তু উত্তর দেয়া হলো না। অনেক সময় নীরব থেকেই মনে হয় বলা হয়ে গেছে।

কই, আপনি জেগে?

হ্যাঁ।

আপনার কথা শুনছি না?

কথা শুনতে চাও?

হ্যাঁ।

যা খুশি।

বাবর সমুখে তাকিয়ে অন্ধকারে মৃদু হেসে বলল, এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইস ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার প্রাস বি স্কোয়ার প্লাস টু এ বি। এ মাইনাস বি—

ও-কী? জাহেদা এই প্রথম মুখ ফিরিয়ে বাবরকে দেখল। বলল, ও-কী বলছেন?

অ্যালজেব্রার একটা ফর্মুলা।

এই বুঝি কথা?

তাহলে কী বলব?

জানি না। জাহেদা মুখ ফিরিয়ে নিল, তাকাল আবার সেই শূন্যের দিকে।

বলি? হেডা, ও হেডা, তোমাকে ভালবাসি।

না, আমি শুনতে চাই না।

আসলে তুমি আমার কথা শুনতে চাও না জাহেদা। বলতে বলতে বাবর উঠে দাঁড়াল। আসলে আমি এখন কথা বলতে চাই না। বাবর এসে জাহেদার পাশে শুলো। আসলে তুমি এখন আমাকে চাও। বাবার কম্বলের ভেতর ঢুকে জাহেদাকে কাছে টানল। আসলে তোমার এক লাগছে। আমারও হেডা, আমারও লাগছে। বলে সে প্রথমে তার কপালে

একটা চুমু দিল, তারপর ঠোঁটে। বিশুষ্ক থেকে ধীরে ধীরে সিক্ত হয়ে এলো ঠোঁট। নিষ্প্রাণ যেন সপ্রাণ হয়ে উঠল। জাহেদাকে একেবারে বুকের মধ্যে নিয়ে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে আলিঙ্গন করল বাবর।

তখন একবার কেঁপে উঠল মেয়েটা। তারপর হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলে তার বাহুমূলে মুখ গুঁজে চুপ করে পড়ে রইল।

এই সময় বাবর মুঠো করে ধরল জাহেদার হাত। তারপর সেটা এনে রাখল। তার উত্তপ্ত অঙ্গের ওপর। প্রথমে বিদ্যুতে হাত পড়ার মত হাতটা টেনে নিল জাহেদা। কিন্তু আলাদা হতে পারল না। আস্তে আস্তে কম্পিত করতল সে এবার রাখল। ওখানে। তার আঙুলের ডগায় কেন্দ্রীভূত হলো সমস্ত জীবন। জন্মের বেদনা। ভয়, বিস্ময় একত্রিত মিশ্রিত হয়ে একটি উত্তাপের আকার ধারণ করল। সে ধীরে ধীরে মুঠো করে ধরল। তারপর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে ছেড়ে দিয়ে আবার আঁকড়ে ধরল সে। এবার আর ছাড়ল না। জ্বলন্ত ফুলকি ছড়ান একটা তারাবাতি শিশুর মত মুঠোয় ধরে রইল জাহেদা। সে একই সঙ্গে এক এবং দুই হয়ে গেল। নির্ভয়ে কৌতূহলে আক্রান্ত সে অনুভব করতে লাগল বাবর যেন অন্য কারো দেহ উন্মোচন করছে অতি সন্তর্পণে; যেন অন্য কারো পায়ের তলায় পড়ে থাকল পাজামা, অন্য কারো বুকে বিচ্যুৎ হলো বোতাম। প্রথমে একটু ঠাণ্ড করে উঠল। তারপর কোথা থেকে একখণ্ড তাপ এসে তার পাশে স্থির হলো।

সেইভাবে স্থির থেকে কণ্ঠ থেকে নিসৃত কিছু ধ্বনি শুনল জাহেদা। সে নিজেই বলছে, কিন্তু কেন বলছে, বুঝতে পারল না, এতটুকু অপ্রাসঙ্গিক মনে হলো না, তবু আর একটা

সত্তা কৌতুক অনুভব করতে লাগল। সে বলছে, আচ্ছা মানুষ শুধু নিরামিষ খেয়ে বাঁচতে পারে?

যেন টেবিলে মুখোমুখি বসে চায়ের পেয়ালা নিয়ে গল্প করছে এমনি গলায় বাবর উত্তর করল, কেন পারে না? প্রণব বাবুকে তো দেখলে।

তাই ভাবছি। আশ্চর্য!

এতটুকু আশ্চর্য নেই। এতে। তুমি জান না জাহেদা, মানুষ নিজেকে কতটা মানিয়ে নিতে পারে। তোমার কাছে যেটা অস্বাভাবিক, আরেক জনের কাছে সেটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক। তুমি যা বিশ্বাস কর, আরেকজন তা করে না। তুমি যাতে বীচ, আরেকজনের কাছে সেটাই মৃত্যু। আমি যেভাবে বাঁচতে চাই, আরেকজন সেভাবে চায় না। তুমি যা নাও, আরেকজন তা ফেলে দেয়। সবই সত্য। কারণ সত্য মাত্রেই আপেক্ষিক, এই মৃত্যু ছাড়া। হেডা, তুমি শুনছ? তুমি ভাল, তুমি সোনা, হেডা, হেডা ও। বলতে বলতে আপন দেহে সে ঢেকে দিল জাহেদাকে।

জাহেদা অস্পষ্ট স্বরে বলল, না।

হ্যাঁ, বল হ্যাঁ। না বলে কিছু নেই পৃথিবীতে ও হেডা।

না।

তখন বাবর বলল, ফোর থ্রিজা টুয়েলভ, ফোর ফোরজা সিক্সটিন, ফোর ফাইভজা টুয়েন্টি।

হঠাৎ হেসে ফেলে জাহেদা।

আর সেই মুহূর্তে বাবর তার দেহ এবং অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হয়ে গেল। জাহেদা টের পেল তার ভেতরে একটা ক্রন্দন থমকে আছে যেন। সেটা নড়ছে না, বড় হচ্ছে না, ফেটে বেরুচ্ছে না, স্তব্ধ হয়ে আছে। তারপর মুহূর্তে তার দেহ একটা তীরবেগে উর্ধ্বগামী পাখি হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ফিরে জাহেদা বালিশে মুখ গুঁজে দিল। ভেতরে সচল হয়ে উঠল তখন কান্নাটা। চাপ দিতে লাগল। ফেটে বেরুতে লাগল। ফুলে ফুলে উঠল তার শরীর।

বাবর তখন আবার তাকে কাছে টেনে চুমো দিয়ে বলল, কাঁদছ? ও সোনা তুমি কাঁদছ? কেন কাঁদছ?

জাহেদা বলল, আমার সব কিছু পর হয়ে যাচ্ছে। দূরে সরে যাচ্ছে। সব কিছু ফেলে দিয়ে আমি কোথায় যেন যাচ্ছি। কেবলি যাচ্ছি। চলে যাচ্ছি।

তখন বাবর তাকে বুকে তুলে নিল। আবার তার হাতে দিল তারাবাতিটা। বলল, এটা নাও। নাও।

যেন শিশুর হাতে একটা খেলনা তুলে দিল বাবর।

জাহেদা ধরে রইল। ক্রমশ দৃঢ় হয়ে এলো তার পাঁচটা আঙুল। যেন ছেড়ে দিলেই অথৈই পানিতে পড়ে যাবে সে।

তারপর হঠাৎ টের পেল তার ভেতর থেকে কান্নার বিদায়। সে তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাবরের কানের কাছে মুখ রেখে শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে একবার মাত্র বলতে পারল, আমাকে ফেলে যে ও না।

বাবর তাকে সারা শরীর দিয়ে আবার ঢেকে দিল।

১৮. খেলারাম, খেলে যা

হাঃ। খেলারাম, খেলে যা।

পাশে শুয়ে আছে জাহেদা। ঘুমন্ত, পরিশ্রান্ত, অধিকৃত, শিথিল। দীর্ঘলয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তার নিঃশ্বাস। সমস্ত দেহ এখন মসৃণ, কেবল কীসের স্মৃতিতে স্তনমুখে কিছু পদ্মকাঁটা ধরে আছে। ঋজু বাঁ পায়ের ওপর ডান পা-টা ভাজ হয়ে চেপে আছে দেখাচ্ছে হেনটি মাতিসের বার্নস মিউরাল ডান্স ওয়ানের মধ্য-ফিগারের মত। চুলে ঢাকা গাল চিবুক গলার কোল। চোখের কাজল দুষ্টুমিতে কপালের পাশ কালি করে আছে। সন্তর্পণে দেশলাই ধরিয়ে ছবিটা দেখল বাবর। তারপর দ্বিতীয় কাঠিতে জ্বালাল সিগারেট। কম্বল দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিল জাহেদাকে। আর সে নিজে তার নগ্ন দেহটাকে হিমেল হাওয়ার হাতে ছেড়ে দিল। এখন এই শীত বড় উপভোগ্য মনে হচ্ছে। থেকে থেকে কাপন লাগছে। কাটা দিয়ে উঠছে। সারা গা। আবার সদ্যস্মৃতিটা ফিরিয়ে আনছে উত্তাপ। সিগারেটের আলোয় থেকে থেকে একটা লাল বেলুন ফুলে উঠছে, হারিয়ে যাচ্ছে, আবার দেখা যাচ্ছে।

সে যেন এইমাত্র প্রচুর হুইস্কি খেয়ে উঠেছে।

জাহেদা পাশে আছে কি নেই সেটা বড় কথা নয়; থাকলে সে আছে, না থাকলে সে নেই। কোনোদিন যেন তাকে দেখেনি, চিরদিন যেন তাকে দেখেছে। জাহেদা মৃত, জাহেদা জীবন্ত। পাশে তাকাল বাবর। জাহেদাকে মনে হলো বিন্দুসমান, অনেক ওপরে

প্লেন থেকে দেখলে পদ্মায় নৌকো যেমন দেখায়। জাহেদার পাশ ফেরা ডান ঊরুটাকে মনে হলো তার শরীরের চেয়ে বৃহৎ, হাঁটুর কাছে ক্যামেরা রেখে দেহের ছবি তুললে যেমন হয়।

সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র নিজেকে জীবিত বলে মনে হলো তার। মনে হলো সে একটা প্রাচীন গাছ, মাটিতে সমান্তরাল পড়েছিল কতকাল; সেখানে নতুন ডাল বেরুচ্ছে আবার, সমস্ত কাণ্ড জুড়ে, একে একে, অসংখ্য উজ্জ্বল, জলজ সবুজ, ঋজু, ক্ষীণদেহ। ক্রমশ বড় হতে দেখল। সে ডালগুলো। ক্রমে একটি অরণ্য হয়ে গেল তার সমস্ত দেহ জুড়ে। একটা প্রদীপ্ত সূর্য নির্মল কিরণে ভাসিয়ে দিয়েছে সবকিছু। সবকিছু স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, প্রখর দেখাচ্ছে।

সেই অনন্তগামী মহাস্রোতে অসহায় ভাসমান একটি অণু আর সে নয়, সে সেই স্রোতের একটি সচল সক্রিয় উল্লসিত অংশ।

সচ্ছল প্রপাতের মত হাসতে ইচ্ছে করল তাল। সে মনে মনে নির্মল অবিরাম হাসি হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়াল। এবং খাটের কার্নিশ দুহাতে শক্ত করে ধরে নগ্নদেহে বসে রইল অনেকক্ষণ।

কিন্তু মনে মনে নয়, সরবে। হেসে উঠতে ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল বাবরের। সে খালি পায়ে দাঁড়াল দুই খাটের মাঝখানে। তারপর ছাদের দিকে মুখ তুলে গ্রীবায় দুহাত চেপে

সে হাসতে লাগল, করতলের চাপে প্রায় বোবা কিছু ঘরঘর শব্দ নির্গত হলো শুধু। এই সাবধানতা শুধু জাহেদার ঘুম যেন না ভাঙ্গে।

সমস্ত শরীর একটা তরঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। কল্লোলিত, হিল্লোলিত একটা দুর্বার তরঙ্গ। ধরে রাখা যাচ্ছে না নিজেকে। অস্থির হয়ে উঠেছে পায়ের আঙুল; নিতম্বের মাংশপেশিতে দ্রুত সঞ্চরণ অনুভব করা যাচ্ছে। মণিবন্ধে এপোশ ওপোশ একটা মোড়চ বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। তার নাচ করতে ইচ্ছে করছে। এই শীতরাত্রে সম্পূর্ণ নগ্ন সংগমতৃপ্ত বাবর অন্ধকারে একটি গাঢ় রক্তবর্ণ বৃহৎ আদি পুষ্পের মত দুলতে লাগল। ডান থেকে বামে, বাম থেকে ডানে, একতালে।

তারপর হাতড়ে হাতড়ে বাবর ছোট্ট টেপরেকর্ডারটা বের করল। যে ক্যাসেট হাতে ঠেকল সেটাই পরিয়ে চালিয়ে দিল যন্ত্রটা। ছড়িয়ে পড়ল সুরের মূর্ছিনা। কমিয়ে দিল ধ্বনি, এত কমিয়ে দিল যে আর শোনা গেল না, কিন্তু সে তার এখনকার প্রখর। শ্রবণ দিয়ে স্পষ্ট শুনে চলল। জিজি জাঁ মেয়ার গাইছে। ফরাসি জানে না। কিন্তু অর্থগুলো শুনেছিল সে। নিশ্চল দাঁড়িয়ে প্রথম গানটা শুনল বাবর। এসো, নাচবে এসো। নাচঘরে দেখবে কত রূপসী তরুণী। এসো। শোন তাদের উল্লাস্যধ্বনি যা আমার পছন্দ। বড্ড ঠাসাঠাসি হবে। বড্ড ভিড়। তোমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরতে হবে। ধরব চুমো দেব আর ঘুরব, সঙ্গীতের ঘূর্ণিতে আমরা ঘুরব। খুলে যাবে তোমার জামা। হারাবে তোমার চেতনা। খুলে যাবে মোজা। খুলে পড়েব সব। আমরা শুধু ঘুরছি, আর ঘুরছি, আর ঘুরছি।

ঘুরতে লাগল বাবর। তালে তালে ঘুরতে লাগল। ডান হাত তুলে, বাঁ হাত নাভির অদূরে ত্রিভুজ করে রেখে, মাথা ঝাঁকিয়ে, তার বহির্চেতনা হারিয়ে— যেমন মাজারে জেকের করতে হয়, মণ্ডপে কীর্তন করতে করতে দশা লাগে, তেমনি।

শেষ হলো গানটা। অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে পড়ল বাবর, দাঁড়িয়ে রইল। পরের গান যতক্ষণ না শুরু হয়। শুরু হতেই আবার সে তালে তালে ঘুরে চলল। এবার দুদিকে উত্তোলিত প্রসারিত তার হাত। প্রতি দোলায় তার শিশ্ন এ ঊরু, ছুঁয়ে যেতে লাগল অবিরাম। মেট্রোনমের মত ঐ গানের সাথে তার দেহের সাথে তাল রেখে চলছে যেন।

জিজি জাঁ মেয়ার সুরের নদীতে ছিপছিপে নৌকার মত কথা ভাসিয়ে বলে চলেছে–এটা কোনো ওষুধ, কোনো প্রসাধনী, কোনো কারখানায় তৈরি কিছু না, সান্টা ক্লজের দোকানে একটা খেলনা? আমি কত অভিধান দেখলাম, কত নিষিদ্ধ পঞ্জিকা খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না। শুধু তাতে লেখা, বলা হয়ে থাকে জিনিসটা...। একটু চেয়ে দেখলাম, পুরোটা খেতে ইচ্ছে করল। আমি এক তরুণী থেকে রূপান্তরিত হলাম আক্রমণ উদ্যত ট্যাঙ্কে। আমি ওটা নিজের করে চেয়েছি। কিন্তু বাইসাইকেল তো আর ওটা নয়, ওর জন্যে দাম দিতে হয় জীবন। তখন এক টুকরো। হাসি দিয়ে ওটা পেলাম। ভাবলম, হয়ে গেল। জয়। আমার জয়। কিন্তু পরিণামে আমিই তার ক্রীতদাসী হয়ে গেলাম। আমার দেহ শেকলে বাধা। আমি সাহায্য চাই। কিন্তু চিৎকার করব না, কারণ প্রথমে তো আমি নিজেই চেয়েছিলাম। আমার জিনিস। আমার আনন্দ। আমার মৃত্যু। গলার মৃত্যুফাঁস।

অন্ধকার নগ্নদেহে ভূতের মত নাচ করতে করতে সে তার নিজেরই কণ্ঠ থেকে নিসৃত কিছু অব্যয় ধ্বনি শুনতে পেল।

বিছানায় সটান শুয়ে বাবর। অবলুপ্ত হয়ে গেল সঙ্গীত, শান্ত হলো শরীরের মাংসপেশিগুলো। বাবার স্বপ্ন দেখল, তার বাবা কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলছেন, লেখ বাবারা লেখ, হাতের লেখা লেখ, উর্ধ্বমুখে পথ চলিও না, ইক্ষু রস অতি মিষ্ট।

একপাল ছেলে উবু হয়ে থুথু নিয়ে শেলেট মুছছে আর লিখছে। কেবল বাবরই যেন কোন অপরাধে একেবারে বস্ত্রহীন নিলডাউন হয়ে আছে করোগেটের টিন কাটা জানালার কাছে। বাইরে পাকা সোনার মত ধান খেতের ওপর দিয়ে স্রোত হয়ে চোখ ঝলসানো রোদ আসছে। সারাদিন। মন খারাপ করা একটা ঘুঘু ডাকছে ইস্কুল ঘরের কাছেই। দূরে শোনা যাচ্ছে ঢাকের সতেজ একটানা বৃষ্টিমুখর শব্দ। সামনে মহরম। আহা কানা ফকিরের সেই গানটা গো। কাঠের টুকরো কিট কিট করে বাজায় আর বাড়ি বাড়ি গায় ও কাশেম, তুমার সখিনা ছেড়ে কুথাকে যাও নাথ! ঘোমটা টানা বৌদের চোখ ছলছলিয়ে ওঠে, পয়সা দেয়, চাল দেয়। তারা। কান্নার জন্যে দাম দেয়। তখনি খুব অবাক লাগত। বাবরের। কোথায় যেন কী একটা গোপন অর্থ আছে যা ধরা যেত না। স্বপ্নের মধ্যে বাবর দেখল বেড়ার ফাঁকে কানা ফকিরের গান শুনছে জাহেদা।

১৯. দুপাশে আখের খেত

দুপাশে আখের খেত। সোনার মত রং। সবুজ ফেটি বাঁধা লাঠিয়ালদের মত ভিড় করে আছে, এই হাসছে, এই কানাকানি করছে। দ্রুত সরে যাচ্ছে, পিছিয়ে যাচ্ছে পথের দুপাশে। জাহেদা আর বাবরের চোখে মুখে এসে লাগছে ভোর সকালের নির্মল হিম হিম হাওয়া। রংপুর থেকে দিনাজপুরের দিকে চলেছে ওরা।

জাহেদা তখন থেকে কী একটা সুর গুন গুন করছিল।

কী গাইছ? মিষ্টি করে হাসল জাহেদা। অনেকটা কাল রাতে দেখা সুষমার মত।

বাবর বলল, গাইতে পার জানতাম না তো।

কতটুকুই বা জানেন?

মানে?

আমার কতটুকই বা আপনি জানেন!

তা সত্যি। বাবার হাসল। পরে যোগ করল, আমার সব জান?

হুঁ, জানি।

কী জান?

বলব না। বলে জাহেদা হঠাৎ বাবরের হাত চকিতে ছুঁয়ে দিল। আপনাকে জানি না? আপনাকে চিনতে বাকি নেই আমার। বুঝছেন?

বাবর বাঁ হাত জাহেদার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। সে আলতো করে সরিয়ে দিয়ে বলল, গাড়ি চালান।

বলে আবার সে গুন গুন করতে লাগল। তখন বাবরও গুন গুন করে উঠল। ইচ্ছে করে নয়, জাহেদার সঙ্গে পাল্লা দিতে নয়, একেবারে ভেতর থেকে।

জাহেদা হেসে বলল, কী গাইছেন?

একটা গান।

সে তো বুঝতেই পারছি। জোরে গাইলে শুনতে পেতাম।

বাবর গান থামিয়ে বলল, এই গানটা মাঝে মাঝে আমার মনে পড়ে। গানটা কিছু নয়, ছেলেদের একটা কবিতা। বাংলা পড়লে ছেলেবেলার বইতে পেতে। বাংলাদেশের এমন কোনো ছেলেমেয়ে নেই জানে না।

শুনিই না।

আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি। এইভাবে শুরু–মেঘের কোলে রোদ হোসেছে বাদল গেছে টুটি, আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি। ছেলেবেলায় খুব ভাল বুঝতে পারতাম এটা। সারাদিন সারারাত সারাদিন অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে, তারপর হঠাৎ করে মেঘ দরোজা খুলে দিল, রোদ পা বাড়াােল পৃথিবীর মস্ত আঙিনায়। তখন কী যে খুশি হতো। কে যেন ডাক দিত কোথা থেকে। মাতামাতি করে বেরুতাম ঘর ছেড়ে, একেবারে পাখির মত মনে হতো। এখনো যখন কিছু হয়ে যায়, কিছু পেয়ে যাই যার জন্যে গুমোট অপেক্ষা করেছিলাম, তখন ঐ পাখির মত লাগে। গানটা মনে পড়ে। রবি ঠাকুরের লেখা।

টেগোর?

বাবর হেসে সস্নেহে বলার, হ্যাঁ, টেগোর।

শুনুন। জাহেদা পাশ ফিরল, আদুরে গলায় বলল, ভাল কথা মনে পড়েছে। টেগোরের শ্যামা বলে একটা লং প্লেয়িং রেকর্ড আছে না?–আমাকে যোগাড় করে দিতে পারেন?

কেন? কী হবে?

বারে, বাজাব, শুনব। কত নাম শুনেছি রেকর্ডটার। দেবেন?

আচ্ছা। নিশ্চয়ই দেব। তোমার প্লেয়ার নেই?

শরমিনের একটা ছোট্ট আছে।

তোমাকে একটা প্লেয়ারও কিনে দেব।

না বাবা না।

কেন? বাড়িতে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না? তখন কী বলব?

বলবে, মাসে মাসে টাকা জমিয়ে কিনেছ। সারপ্রাইজ দেবার জন্য এতদিন বলনি।

জাহেদা চোখ পাকিয়ে বলল, আপনার মাথায় যত নষ্ট বুদ্ধি জোটে। বলেই হেসে ফেলল।

বাবর বলল, হ্যাঁ স্বীকার করি, এবার করলাম তুমি আমাকে জান।

জানিই তো। কী ভেবেছেন সাহেব?

বলে সীটে গা এলিয়ে জাহেদা আবার গুন গুন করতে লাগল।

সৈয়দপুর পার হয়ে গেল ওরা।

জাহেদা নীরবে চোখ মেলে তাকিয়েছিল সমুখে। তার শরীরের চমৎকার একটা সুবাস থেকে থেকে নাকে এসে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল; জাহেদাকে আরো কাম্য বলে মনে হচ্ছিল তখন। স্মিত মুখে বাবর বাসনার সেই আসা-যাওয়া উপভোগ করছিল তার সারা শরীর দিয়ে।

হঠাৎ জাহেদা প্রায় আচমকা একটা প্রশ্ন করল।

যদি কিছু হয়?

বাবর চমকে উঠল যেন।

কী কিছু হয়?

যদি কিছু হয়?

সাবধানে সামান্য একটু হাসল বাবর প্রথমে। তারপর বাঁ হাতে জহেদার কাঁধ জড়িয়ে নিল। দুষ্টুমি গলায় বলল, কিছু হয়ত হবে।

জাহেদা বোবা চোখে বড় করে তাকাল বাবরের দিকে।

হ্যাঁ, কিছু হয়ত হবে। তার জন্যে এত ভাবনা কীসের? আমার ছোট বোন থাকে আজাদ কাশ্মীরে। ওর স্বামী আর্মির ডাক্তার বলেছি তোমাকে?

জাহেদা মাথা নাড়ল।

বলিনি? তার ওখানে তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব। তোমার বাবা জানবে কোনো ছাত্রীদলের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানে বেড়াতে গেছ। সেখানে আমার বোনের কাছে বাচ্চা হবে। তুমি চলে আসবে। বাচ্চা থাকবে ওর কাছে। একটু বড় হলে নিয়ে আসব। আমার মেয়ে পছন্দ। তোমার?

জাহেদা শুনছিল আর ক্রমশ মাথা নিচু করছিল। এবার চোখ তুলে বলল, না, না, সত্যি কিছু হয়ে গেলে?

আদর করে হঠাৎ জাহেদাকে একটু কাছে টেনে নিল বাবর, তারপর ছেড়ে দিয়ে বলল, ঠাট্টা করছিলাম। কিছু হবে কেন? আমি জানি কী করে কী করতে হয়।

জাহেদা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দরোজার সাথে ঠেস দিয়ে বসল।

কাল তুমি কাদছিলে কেন?

অনেকক্ষণ পর জাহেদা বলল, আচ্ছা, এইসব ছাড়া আমরা ভালবাসতে পারি না? বলেই সে হাসিতে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করল। খুব ছেলেমানুষ দেখাল তাকে এখন।

বাবর এক মুহূর্ত ভা েবল। ভালবাসা সম্পর্কে তার ধারণা পরশু রংপুরে আসতে আসতে জাহেদাকে সে বলেছিল। ভুলে গেল কী করে এরই মধ্যে মেয়েটা? এখন আবার বলবে? না, থাক। কাল আর পরশু রাতের পর এখন ওভাবে বললে অন্যরকম মনে করবে জাহেদা।

কথা আজ পর্যন্ত তাকে প্রতারণা করেনি। এখনো করল না। বাবর বলল, সেদিন রাতে মন্দিরে গান শুনেছিলে মনে আছে?

এটা কী উত্তর হলো বুঝতে না পেরে হকচকয়ে জাহেদা বলল, হ্যাঁ।

গানে বলছিল না?–চাই না। স্বর্ণসীতা চাই না?

হ্যাঁ।

স্বর্ণসীতা বুঝেছ?

জাহেদা মাথা নাড়ল।

না বোঝবারই কথা। আমরা যে কালে বড় হয়েছি রামায়ণ মহাভারত তখন এমনিতেই জানা হয়ে যেত। রামায়ণে আছে, সীতাকে রাবণ চুরি করে নিয়ে গেল। যুদ্ধ করে তাকে উদ্ধার করে আনল রাম। অযোধ্যায় রাজা হলো রাম আর সীতা তার রাণী। প্রজারা বলাবলি করতে লাগল, সীতা এতদিন বাবণের কাছে বন্দি ছিল, সীতা কি সতী আছে? প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য রাম তখন সীতাকে নির্বাসন দিলেন।

কী নিষ্ঠুরতা! জাহেদা চোখ গোল করে মন্তব্য করল।

তারপর শোন। সীতাকে নির্বাসন দিয়ে রামের অন্তরে সুখ নেই। বিমর্ষ দিন কাটতে লাগল তার। শরীর কৃশ থেকে অতিকৃশ হয়ে গেল। মলিন হলো উজ্জ্বল ক্লান্তি। তখন অনুতপ্ত প্রজারা রামের তুষ্টির জন্যে রাজ্যের সেরা কারিগর দিয়ে সীতার একটা স্বর্ণমূর্তি বানিয়ে রামের সামনে আনল। বলল, এই নিন। আপনার সীতা। রাম তখন প্রশ্ন করল, তোমার এই সোনার সীতা কি কথা বলতে পারে? উত্তর এলো, না। কানে শুনতে পায়?–না। —সে কি চোখে দেখতে পায়।–না, তাও পারে না। তখন রাম বলল, হোক না সোনার তৈরি, হোক না সেরা কারিগরের সৃষ্টি, চাই না। আমি এই সোনার সীতা, চাই না।

সুন্দর। জাহেদার গাঢ়স্বরে ঐ একটি মাত্র শব্দ শোনা গেল।

হ্যাঁ সুন্দর। এবং সত্যি। আমার মনের কথাই রামের মুখে শোনা গেছে। আমি যাকে চাই রক্তমাংসে চাই তাকে। সপ্রাণ তাকে চাই। জীবন্ত তাকে চাই। এই তুমি যেমন তেমনি করে চাই।

জাহেদা সমুখে তাকিয়ে রইল অঙ্কিত একটা চিত্রের মত।

কী ভাবছ?

না, কিছু না।

নিশ্চয়ই কিছু ভাবছ। বাবর প্রীত মুখে উচ্চারণ করল জোর দিয়ে।

জাহেদা তখন নিঃশব্দে এক টুকরো হাসল।

বাবর বলল, তুমি ভাবছ, এ কেমন কথা বলছি আমি। নয়? ভাবছ, তাহলে মানুষের মন কিছু না? শরীরটাই সব? এতকাল যা জেনে এসেছ তা ভুল? এই ভাবছ তো?

আপনার কী দোষ জানেন?

কী?

আপনার দোষ, নিজেই বলে চলেন, অন্যে যে অন্য কিছু ভাবতে পারে, অন্য কিছু বলার থাকতে পারে তার, তা আপনার মনেই হয় না।

অপরাধীর মত হাসল বাবর। বলল, তোমার কথা তাহলে বল।

চুপ করে রইল জাহেদা। নিঃশব্দে গাড়ি চালাতে লাগল বাবর। কিন্তু এটাও খুব শান্তিকর বলে মনে হলো না। কথা বলার জন্যে ভারি তৃষ্ণার্ত হয়ে রইল সে। বারবার তাকাতে লাগল জাহেদার দিকে।

জাহেদা বলল, বকা খেয়ে চুপ করেছেন তো!

হুঁ। বোধহয়।

আচ্ছা বলুন, আপনার যা মনে আসে বলুন।

এভাবে কথা বলা যায় না।

কেন?

এক তরফা কথা হয় না। আমি তো শুনছি। তারপর কী হলো? রামের কী হলো?

রাম?

হ্যাঁ, এই যে বলছিলেন।

বাবর হেসে ফেলল। বলল, ঐ তো, বললামই তো। সীতাকে যে চায়, রক্ত মাংসের সীতা। সীতার স্মৃতি নয়, প্রতিকৃতি নয়; যে সীতা জীবন্ত, যে সীতা বর্তমান। আমাদের একটা দোষ কি জান? আমরা স্বাভাবিকতাকে ভয় পাই। শরীরকে ভয় পাই। ইচ্ছাকে ভয় পাই। আমরা আমাদের কামনাকে নিয়ে বিব্রত। বুকে হাত দিয়ে কটা লোক বলতে পারবে কোনো সুন্দরী মেয়ে দেখে তার ইচ্ছে হয়নি? যদি কেউ বলে যে তার হয়নি, আমি বলব, হয় সে অসুস্থ নয়তো মিথ্যুক।

ব্যতিক্রম তো আছে।

আছে। কিন্তু ব্যতিক্রম নিয়মের অস্তিত্বই প্রমাণ করে জাহেদা। বিশ্বাস কর, কাউকে দেখে আমার তাকে পেতে ইচ্ছে করবে, তার অন্তর্গত হতে ইচ্ছে করবে–এর চেয়ে স্বাভাবিক এবং সাধারণ আর কোনো ইচ্ছে আমি জানি না।

জাহেদা নির্বিকার মুখে চোখ দ্রুত ধাবমান দৃশ্যের দিকে রেখে শুনে যেতে লাগল, যেন ক্লাশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণসমূহ সে অধ্যাপকের কাছ থেকে শুনছে।

বাবর বলে চলল, কিন্তু ঐ যে বললাম, আমরা আমাদের দেহকে ভয় পাই, যেমন সাপকে, তুমি তো সাপের উল্লেখে শিউরে ওঠ, যেমন ভয় পাই অ্যাটম বোমাকে। কিন্তু ভয় পেলেই তো কিছু মিথ্যে হয়ে যায় না। কী বল?

বোধহয়।

বাবর সুদূরের দিকে তাকিয়ে হাসল।

হাসছেন যে?

একটা কথা মনে পড়ে গেল। আমার বড় চাচা। ইয়া ছফুট দুইঞ্চি লম্বা, টকটকে গায়ের রং, গালে সুন্নতি দাড়ি, সর্বক্ষণ মাথায় টুপি, কী প্রশান্ত পবিত্র দর্শন তাঁর। দেখলে ভক্তিতে মাথা নুয়ে আসত। এখনো ছবিগুলো স্পষ্ট চোখের ওপর ভাসে। এই তো সেদিনের কথা। কত দিন হবে? মাত্র তিরিশ বছর আগে। তুমি তখন কোথায়?

জাহেদা হাসল নিঃশব্দে।

তুমি তখন হওনি। আমার সেই চাচার কথা মনে পড়ল হঠাৎ।

কেন?

না, থাক। বলব না। বললে মন খারাপ হয়ে যাবে।

আপনাকে বোধহয় খুব ভালবাসতেন?

হ্যাঁ, খুব। বলতে গেলে আমি তার কাছেই মানুষ।

মারা গেছেন?

হ্যাঁ। আমি তখন ঢাকায় এসেছি। চিঠিতে জানলাম।

জাহেদা বলল, আপনিই তো বলেন মৃত্যু সবচেয়ে স্বাভাবিক, তাহলে মন খারাপ করছেন কেন?

না, সেজন্যে নয়।

বাবর চকিতে উপলব্ধি করল জাহেদা ভুল ধারণা করেছে।

তাহলে?

তুমি ভেবেছ, আমার মন খারাপ হবে? না, আমি তোমার কথা বলছিলাম। শুনলে তোমার খারাপ লাগবে। কারণ, সংস্কার তোমার রক্তের মধ্যে আছে। ভাল মন্দের চলিত ধারণায় তুমি মানুষ হয়েছ।

জাহেদা তার গায়ে টোকা দিয়ে বলল, বাহাদুরি না করে বলুন। আমি শুনব। আমার মন খারাপ হবে না।

শুনবে? শোন তাহলে। আমি তখন চাচার বাড়িতেই থাকি। পাশাপাশি বাড়ি আমাদের। চাচি তার ছেলেমেয়ে নিয়ে গেছেন বাপের বাড়িতে। তখন নামাজ পড়তাম। চাচার সঙ্গে। একদিন আছরের সময় ওজু করে চাচার কাছে গেলাম, চাচা বললেন, তিনি নামাজ পড়ে নিয়েছেন। একটু অবাক লাগল। কোনোদিন তো চাচা আমাকে ফেলে নামাজ পড়েন না।? ভাবলাম, কী জানি, হয়ত আমারই দেরি হয়ে গেছে। নামাজে দাঁড়িয়েছি, ঠিক তখন, মনে হলো উঠানে নিচু গলায় চাচা কী যেন কাকে বলছেন। এ রকম কণ্ঠ চাচার কখনো শুনিনি। আমার সেই বয়সেই বুদ্ধি হয়েছিল খুব, আমি বুঝতে পেরেছিলাম। গলা শুনেই যে গোপন কিছু একটা চলছে যা আমার শোনা উচিত নয়।

থামালেন কেন? তারপর?

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, উঠানে চাচা আব্বাসের মাকে কী যেন বলছেন। আব্বাসের মা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সারা গা যেন থর থর করে কাঁপছে তার।

আব্বাসের মা কে?

চাচার বাড়িতে কাজ করত। মাঝ বয়সী। বিধবা। আব্বাসকেও আমরা কোনোদিন দেখিনি, তিনি মাঝ বয়সেই নাকি মারা গিয়েছিল। গোলমত মুখ, শ্যামল, ঘন ভ্রু ছিল মনে আছে আব্বাসের মা-র। আর মনে আছে পায়ের তোলো ঘেয়ো শাদা ছিল তার। সারাদিন মাঢ় দিয়ে কাপড় কাচতে হতো, তাই। সন্ধ্যের সময় দেখতাম কাঠ পুড়িয়ে ধোঁয়া দিত পায়ে।

কেন?

ওটা ঘায়ের ওষুধ। লালচে একটা দাগ হয়ে যেত পায়ের চারদিকে অনেকটা আলতার মত।

আলতা কী?

ও চিনবে না। এককালে বাংলার মেয়েরা শখ করে পায়ে পরত। আরো আগে নাপিত বৌ চুবড়িতে করে আলতা নিয়ে আসত বাড়ি বাড়ি, বৌদের পায়ে দিত। দেখি, ঢাকায় ফিরে, খুঁজে তোমাকে এক শিশি আলাতা কিনে দেব। এখনো হয়ত পাওয়া যায়। তোমার পায়ে চমৎকার লাগবে।

বাবর পা দিয়ে জাহেদার পা ছুঁয়ে দিল। জাহেদা পা টেনে বলল, আপনার শুধু প্রমিজ আর প্রমিজ। তারপর গল্পটা কী হলো?

গল্প নয়। সত্যি। একেবারে চোখে যা দেখেছি। সেদিন সারা বিকেল সারা সন্ধে কেন যেন গা ছমছম করতে লাগল আমার। মগরেবের নামাজ পড়লাম চাচার সঙ্গে, কিন্তু ভাল করে তার মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। রাতে দেখলাম, চাচা চোখে দিচ্ছেন সুরমা। আমি তাকাতেই কেমন তড়বড়ে গলায় চাচা বলে উঠলেন, চোখ ভাল থাকে, তুই ঘুমো!

তারপর?

আহ অতি উতলা হয়ে না।

জানেন। আপনার দোষ কি?

বলতে গেলে একটা বই হয়ে যাবে। তোমার কোনটা চোখে পড়েছে তাই বল।

আপনি গল্প বলেন এত ঘুরিয়ে যে আসল কথাই হারিয়ে যায়।

আচ্ছা, আচ্ছা। তারপর পড়েছি ঘুমিয়ে। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে যেন মনে হলো, পানির শব্দ। খুব সরু করে পানি পড়ছে কোথাও। যেন রাতের অন্ধকারের মধ্যে একটা তরল শব্দ

পথ করে চলেছে। আস্তে আস্তে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন টের পেলাম, পানি গড়াচ্ছে আমাদের আঙ্গিনায় এক কোণে যে পোসলখানা, তারই পাকা ড্রেন দিয়ে, গিয়ে পড়ছে বাইরে। কেউ গোসল করছে। কান খাড়া করে রইলাম। কে? কে এত রাতে গোসল করে। অনেকক্ষণ পরে দেখি, চাচা! গোসল করে চাচা এলেন। ভারি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কেমন খাপছাড়া ঠেকেছিল সে রাতেই, সেই ছেলে বয়সেই। এত রাতে কেন চাচা গোসল করবেন? কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি–

আর আমি এখনো বুঝতে পারছি না, আপনার এতে এত চমকাবার কী ছিল।

ছিল না? শোন তাহলে। চাচা সে রাতে আব্বাসের মাকে নিয়ে ঘুমিয়েছিলেন।

জাহেদা কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কথাটা যেন পুরোপুরি, উপলব্ধি হলো তার। চট করে সামলে নিল নিজেকে। একেবারে চুপ করে গেল।

কী, কথা বলছ না?

জাহেদা তবু কিছু বলল না।

বাবর বলল, তাই বলছিলাম, চরিত্র বলে যা আমরা জাহির করি আসলে তা কতটা খাঁটি সত্য সেটা বিবেচনার বিষয়। আমার তো মনে হয়, সব মানুষেরই দুটো চেহারা। একটা তার নিজের, আরেকটা সে তোলে অপরের জন্যে।

আপনারও?

তার মানে?

আপনারও দুই চেহারা?

এবার থমকে গেল বাবর। একটু হাসল। কী বলবে গুছিয়ে নিতে চাইল মনের মধ্যে। এক লহমা পর বলল, হ্যাঁ আমারও। আমাকে তুমি যা জান, আমি তা নাই।

২০. হাসু, হাসনু, হাসুরে

হাসু, হাসনু, হাসুরে।

তীব্র আর্তনাদের মত তার নিজেরই সে ডাক যেন কানে শুনতে পায় বাবর।

হাসুরে।

মুখ খানা কেমন ছিল হাসনুর? পথের দিকে চোখ রেখেই চোখ তীক্ষ্ণ করে বাবর ভাবতে চেষ্টা করে। যেন নিজেরই সঙ্গে একটা মল্লযুদ্ধ চলতে থাকে তার। কিছুতেই সে পারছে না জয়ী হতে, কিছুতেই পারছে না। মনে করতে, কেমন ছিল দেখতে হাসু।

হাসু সন্ধেবেলায় পড়তে বসে বড় বিরক্ত করত।

পড়া বলে দেনা দাদা।

চুপ কর।

দেনা তোর পায়ে পড়ি।

যাবি তুই।

একটুখানি বলে দে।

মারব এক চাপড়।

তখন মুখ ভেংচে দৌড় দিত হাসনু।

হ্যাঁ, মনে পড়ছে। মুখ ভেংচালে ভারি মিষ্টি লাগত হাসনুকে। আদর করতে ইচ্ছে করত। কিন্তু তখন আদর করলে একটু আগে রাগ করবার মানে থাকে না নিজের। তাই সে পেছনে থেকে চেঁচিয়ে বলত, আবার আসবি তো তোর বেণি কেটে দেব; তখন মজা টের পাবি।

বাবরের চোখ যেন ভিজে আসে।

জাহেদাই এবার বলে, আপনি চুপ করে যে!

এটা বিশ্বের কি খুব অস্পষ্ট ঘটনা?

মানে?

আমার চুপ করে থাকাটা?

জাহেদা অবাক হয়। কেমন যেন টের পায় কোথায় একটা তার ছিঁড়ে গেছে।

বাবর যেন এখানে থেকেও নেই। সাহস হয় না ঘাটাতে। কাল রাতের পর এই প্রথম জাহেদা টের পায়, তার শক্তি যেন কে শুষে নিয়েছে। আগে যেমন চট করে একটা কিছু করবার কথা ভাবতে পারত, এখন যেন সেই ঝোঁকটা নেই। বরং খানিক ভেবে দেখার টিলেমি এসেছে।

জাহেদা বলল, যাচ্ছি কোথায়?

বর্ধমানে।

বলেই সামলে নিল বাবর। বলল, ঠাট্টা করছিলাম। যাচ্ছি কান্তনগরের মন্দিরে দেখতে।

তোমায় নিয়ে যাব বলছিলাম। এই তো প্রায় এসে গেছি।

খানিক পরেই হাতের বাঁয়ে লাল মাটির কাঁচা রাস্তা।

বাবর নেমে এক লোককে জিগ্যেস করল, এই পথেই তো মন্দির?

হ্যাঁ, সোজা চলে যান।

গাড়িতে এসে আবার স্টার্ট দিতে দিতে বাবর বলল, এখনো পথটা মনে আছে। ভুলিনি। চমৎকার মন্দির। পোড়া মাটির ফলকে তৈরি। এমনটি আর কোথাও নেই। অথচ জান, দেশের এত পুরনো, এত বিশিষ্ট একটা জিনিস, কারো খোঁজ নেই। খোঁজ নিতে গেলে ইনফরমেশনের লোকেরা বলবে, মুসলমান হয়ে হিন্দুর জিনিসে অতি উৎসাহ কেন? লাগাও টিকটিকি। ভারতের দালাল নয় তো!

দালাল মানে?

তাও জান না। বাংলায় জন্ম, থাক এদেশে, দালাল চেন না? ঐ ইংরেজিতে যাকে বলে এজেন্ট। ধান-চাল ওষুধ পত্তরের এজেন্ট নয়–এজেন্ট।

জিরো জিরো সেভেন? জেমস বণ্ড।

হা হা করে হেসে উঠল বাবর।

ধরেছ ঠিকই। তবে পদমর্যাদা অতটা নয়! এদেশে দালাল বড় কুৎসিত কথা; আর যে বলে, তার মনটাও কিছু কম কুৎসিত নয়। সবচেয়ে সহজ গাল, দালাল। এক সময় ছিল, বাংলা ভাষায় নেড়ে বা যবন বলাটা ছিল গালের চূড়ান্ত। এখন তার বদলে নতুন কথা এসেছে, দালাল।

আপনি আবার মাস্টারি করছেন! জাহেদা কত্রিম অনুযোগ করল।

তোমার বাংলার মাষ্টার।

বাবর তাকিয়ে দেখল সামনে খাল। সেই খালের উপর চওড়া কাঁচা সাঁকো। মানুষজন পার হচ্ছে। এর উপর দিয়ে তো গাড়ি যাবে না। অতএব গাড়ি রাখতে হলো।

নেমে এসো জাহেদা, হাঁটতে হবে।

গাড়ির চারপাশে এরি মধ্যে বেশ ভিড় জমে গেল। এক হাঁটু ধুলোপায়ে লোকেরা হাঁ করে দেখতে লাগল গাড়ি। জাহেদা বেরিয়ে আসতেই গাড়ির বদলে চোখ পড়ল তার দিকে। গাড়ি ছেড়ে তারা দেখতে লাগল জাহেদাকে।

ধুলোর গন্ধ হঠাৎ যেন নতুন মনে হলো বাবরের। অনেকদিন এমন গাঢ় গন্ধ পায়নি সে। যেন কীসের কথা মনে পড়তে চায়, স্মৃতিটা একেবারে দরোজার ওপারে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

জাহেদা বলল, এর উপর দিয়ে হাঁটতে হবে নাকি?

সাঁকোটা এতই নিচু যে পানি ছুঁয়ে আছে। সাঁকোর ওপরে খড় বিছান। পায়ের চাপে পানি ফুটে বেরুচ্ছে। পা ভিজে যাচ্ছে। বাবর বলল, স্যাণ্ডেল জোড়া হাতে করে নাও। আর নইলে চল গাড়িতে রেখে আসি।

ইতস্তত করতে লাগল জাহেদা।

থাক না, মন্দির থাক।

কী বলছ? এতদূর এসে দেখে যাবে না?

আপনি তো মন্দির দেখতে আসেননি।

নিশ্চয় এসেছি।

হাতি! কী জন্যে এসেছেন, নিজেকেই জিগ্যেস করুন।

এতক্ষণে বাবর বুঝল। মেয়েটা ভেবেছে তার এই আসা শুধু তাকে জয় করার জন্যে। আপন মনেই হাসল সে। কথাটা মিথ্যে বলেনি। যতক্ষণ জাহেদা ছিল হাতের বাইরে, তাকে পাওয়াটা ছিল মুখ্য। যেই পাওয়া হয়েছে, তখন সেটা যেন পেছনে পড়ে গেছে। নিজেই সে বুঝতে পারেনি, কখন এই বদল হয়েছে তার মনের মধ্যে। এতক্ষণ, এই

আজ সকাল থেকে, যেন তার মনে হচ্ছিল, আসবার একমাত্র উদ্দেশ্য কান্তনগরের মন্দির দেখা। আর কোনো উদ্দেশ্য নেই যেন তার। ছিলও না।

আবার হাসল বাবর। এবারে হাসিটা ফুটে উঠল। ঠোঁটের কোণায়। আর তো লক্ষ করল জাহেদা। বলল, চলুন গাড়িতেই রেখে আসি।

স্যাণ্ডেল রেখে এসে ওরা সাঁকো পেরুতে যাবে, একটা লোক হাত পেতে দাঁড়াল। কী ব্যাপার? জানেন না বুঝি? সাঁকো পেরুতে পাঁচ পয়সা করে শুনে দিতে হবে। কারণ? তাও জানেন না। কাল গেছে মেলা। মেলার লোকের সুবিধের জন্যে এরা সাঁকো করেছে। নইলে নৌকোয় করে, নয়ত কোমর পানিতে গা ডুবিয়ে পার হতে হতো। পয়সা দিল বাবর। কিন্তু ভারি দুঃখ হলো, আগে জানলে কালকেই আসা যেত। কতদিন মেলায় যায়নি সে।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। হাসনুকে নিয়ে মেলা দেখতে গিয়েছিল বাবর। মহররমের মেলা। বড় বড় তাজিয়া বানিয়েছিল। সেই তাজিয়া মিছিল করে গেছে মেলার দিকে। তারপর ভাল করে মনে নেই। মেলা পর্যন্ত পৌঁছিয়েছিল। কিনা তাও আজ মনে নেই। কেবল মনে আছে লোকজন সব লম্বা লম্বা পা ফেলে সরে পড়েছে। কেমন একটা থমথমে ভাব। বুকের কাছে অস্পষ্ট আতঙ্ক।

বাড়ি যাও খোকা, বাড়ি যাও।

কেন?

শিগগিরে বাড়ি যাও।

ভারি অবাক হয়েছিল বাবর। এ-কী কাণ্ড! সেই কবে থেকে বসে আছে সে, একটা একটা করে পয়সা জমিয়েছে, মেলায় যাবে বলে। আর এখন বলে কিনা, বাড়ি যাও।

মেলা হবে না?

মেলা? হ্যাঁ মেলাই হবে। রক্তগঙ্গার মেলা।

বুকের মধ্যে শিরশির করে উঠেছিল বাবরের।

হাসু, হাসনু, হাসুরে।

হাসু কে?

জাহেদা হঠাৎ প্রশ্ন করল। আর প্রশ্নটা যেন হতবিহ্বল করে দিল বাবরকে। এক মুহূর্তের জন্যে বুঝতে পারল না। কার কথা বলছে জাহেদা।

হাসু কে?

সামলে নিল বাবর। মাথা নাড়ল। বলল, কেউ না।

নিশ্চয়ই কেউ।

বলেছি কেউ না।

তাহলে নাম ধরে ডাকলেন যে!

কখন?

এই তো এক্ষুণি।

ভুল শুনেছ।

না বলুন, হাসু কে?

বললাম তো কেউ নয়।

নিশ্চয় কোনো মেয়ে।

হাসু ছেলের নামও হয়।

আমাকে ফাঁকি দিচ্ছেন। বলুন না কে? আমি তো জানি, আপনার একগাদা মেয়ে বন্ধু। নাম বললে তো আর খেয়ে ফেলব না!

মিছেমিছে হিংসে করছ।

বলুন আপনার একগাদা মেয়ে জানাশোনা নয়?

তুমি ঝগড়া করছি।

মোটেই না।

মাথা ঝাড়া দিয়ে জাহেদা এমন মুখভঙ্গি করল, তারপর নিশ্চল নিস্তরঙ্গ করল চেহারা, যেন পাথর দিয়ে এক্ষুণি সেটা তৈরি হলো।

বাবর হাসল।

আবার হাসছেন? লজ্জা করে না একশ মেয়ের সঙ্গে থাকতে? হাসু কে তা না বললেও জানি। সত্যি কখনো চাপা থাকে না।

না, থাকে না।

বাবরের নিজের কথাই চমকে দিল নিজেকে। কিছু না ভেবেই বলার জন্যে যেটা সে বলেছিল, বলা হবার পর সে অবাক হয়ে দেখল তার মধ্যে বিশ্বজোড়া অর্থের ভার।

বাবর বলল, চল, পা চলিয়ে চল।

২১. ভালবাসতে চাই

মাঝখানে একটা জীবন গেছে, একটা পৃথিবী বদলে গেছে, এই রকম মনে হচ্ছে বাবরের। গোলকাল আর আজ মধ্যিখানে একটা সমুদ্র নিয়ে আছে।

কতবার কতজনের সঙ্গে শুয়েছে বাবর। কিন্তু এর আগে যেন এ রকম করে অবসাদ আসেনি। বড্ড উন্মনা লাগে তার। পেছনে কী রকম একটা টান পড়ে। সর্বক্ষণ মনে হয়, পেছনে ফিরে দেখে।

নাহ, এ আমার কী হচ্ছে?

বাবর নিজেকে বলে। উৎফুল্ল হবার চেষ্টা করে। ফুরফুর গলায় ডাকে, জাহেদা, ও জাহেদা।

কী?

তোমার পায়ে ধুলো। ভারি মিষ্টি লাগছে দেখতে।

জাহেদা চলতে চলতে বলে, জিভ দিয়ে পরখ করবেন নাকি?

বলেছিল। ঠাট্টা করে। কিন্তু বলেই সে বোঝে, বলাটা ঠিক হয়নি। লজ্জা করে তার। সারা শরীর খুস খুস করে উঠে জাহেদার। নিজেকে নগ্ন মনে হয়। হঠাৎ। লুকোতে ইচ্ছে করে। চলছিল সে বাবরের আগে আগে, হঠাৎ গতি শিথিল করে ফেলে সে, কিংবা হয়ে আসে আপন থেকে।

আর বাবরের মাথায় মুহূর্তে একটা রক্তবর্ণের ফুল ফুটে। খেলে যা, খেলারাম, তুই আবার খেলে যা।

ইচ্ছে করে, সত্যি সত্যি জাহেদাকে কোলে করে তার ধুলো পায়ে মুখ দিয়ে দেখে। নাভির কাছে কোমল উষ্ণতা আবার ফিরে আসল বাবরের। এতক্ষণের সেই ভার যেন নেমে যায়। হালকা লাগে নিজেকে। নাহ, সে যে ভাবছিল, ভেতরে একটা কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তার, তা বোধহয় সত্যি নয়। সে যা ছিল তাই আছে।

খেলারাম, খেলে যা।

বাবর তার দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত কাপড় যেন খুলে নেয় জাহেদার। আবার বেরিয়ে পড়ে তার গোলাপি নরম স্পন্দিত মাংস।

দাঁড়িয়ে পড়লেন যে!

জাহেদা জিগ্যেস করে। তখন চৈতন্য হয় বাবরের।

আবার হাসছেন!

হাসিটা আরো দীর্ঘায়িত করে রাখে বাবর। তারপর বলে, সত্যি মন্দির দেখা কিছু নয়। তুমি ঠিকই বলেছ।

তার মানে?

আবার আমার ইচ্ছে করছে। এখুনি। এখানে।

জাহেদা ভ্রুকুটি করে।

সত্যি, এখানে যদি আমাদের শোবার ঘরটা কেউ মন্ত্রবলে উড়িয়ে আনতে পারত জাহেদা। যদি সেটা সত্যি হতো।

চলুন, মন্দির দেখতে যাই।

মন্দির হলো ভেতরের আঙ্গিনায়। বাইরে বিরাট মাঠ পেরিয়ে যেতে হয়। সেই মাঠে, গাছতলায় অসংখ্য মানুষের ভিড়। এরা এসেছিল মেলায়। এক জায়গায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গোল হয়ে বসেছে কলাপাতা নিয়ে। ভাত রান্না হয়েছে মাটির হাঁড়িতে। মা

সেই ভাত, গরম ধোয়া ওড়ানো লাল চালের ভাত উপুড় করে ঢেলে দিচ্ছে কলার পাতে। পাশে ওদের বাবা বসে আছে চোখ রক্তবর্ণ করে। সারারাত গাঁজা খেয়েছে নিশ্চয়।

জাহেদা অবাক হয়ে যায়। বলে, এই ধুলোর মধ্যে পাতায় করে ভাত খাবে নাকি ওরা?

হ্যাঁ খাবে।

এহ মা।

সারা শরীর ঝাঁকিয়ে ওঠে যেন জাহেদার। বাবার জিগ্যেস করে, কী হলো তোমার? কী হলো?

মনে হচ্ছে আমারই দাঁতে বালি লেগেছে।

দেশের প্রায় সব মানুষেই এইভাবে খায়।

মাটিতে?

হ্যাঁ মাটিতে। তবু তো খেতে পাচ্ছে ওরা, অনেকে তাও পায় না।

আচ্ছা ওরা সঙ্গে করে প্লেট আনতে পারে না।

হা হা করে হেসে ওঠে বাবর।

হাসির কী হলো?

তোমার কথা শুনে ফ্রান্সের সেই রাণীর কথা মনে পড়ে গেল।

ঠাট্টা করছেন?

না। সেই রাণী বলেছিল, সব ক্ষুধার্ত মানুষ দেখে, ওরা রুটি নেই তো, কেক খায় না কেন?

এ আপনার বানানো গল্প। শুধু শুধু আমাকে ঠাট্টা করবার জন্যে। বলুন, বানানো নয়?

হ্যাঁ, বানানো। বাবর মিথ্যে করে বলল। তারপর বলল, চল এগোই।

আরেকটা গাছের তলায় তখনো একজন বসে আছে রুদ্রাক্ষের তৈরি মালা নিয়ে। বিক্রি করছে।

কত করে?

আট আনা।

মাত্র আট আনা! জাহেদার চোখ হঠাৎ খুশিতে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। এত সুন্দর জিনিস। বলে, গলায় পরে বেরুলে এত মানাবে। আমি কিন্তু এক ডজন নেব।

এক ডজন?

হ্যাঁ, পাপ্পুকে দেব, শরমিনকে দেব, সবাইকে দেব।

কেনা হলো মালা। বাবর দাম দিতে যাচ্ছিল, বাধা দিল জাহেদা। বলল, না। আমি দেব। আপনার কাছে পয়সা নেব কেন?

আমার কাছে শুধু চুমো নিও তুমি!

সত্যি সত্যি রাগ করে এবার জাহেদা। বলে, আপনি শুধু ঐ এক কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ তাই। আমাকে কী মনে করেন? দেখব আপনার মন্দির।

মন্দিরটা আমার নয়।

বাবরের ঠাট্টা যেন আরো জ্বলিয়ে দেয় জাহেদাকে।

আপনার মন্দির, আপনিই দেখুন।

মুহূর্তে জাহেদা ফিরে লম্বা পা ফেলে দৌড়ুতে শুরু করল। ফিরতি পথে। হঠাৎ করে এমন রাগ করবে বুঝতে পারেনি বাবর।

আরে, কী হলো শোন।

বাবর তার পেছনে তখন দৌড়ুল তাকে ধরতে। ভাত ফেলে সেই ছেলেরা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। রুদ্রাক্ষের মালা যে বিক্রি করছিল সেও এবার উঠে পেছন থেকে দৌড়ুতে দৌড়ুতে ডাকতে লাগল।

ডাক শুনে তাকাল বাবর। আরে, ওকে দামটা দেয়া হয়নি। পকেটে হাত দিল বাবর। বিরক্ত কণ্ঠে জিগ্যেস করল, কত দাম?

ছয় টাকা।

কিন্তু সঙ্গে দশ টাকার নোট। লোকটার সাথে ভাংতি নেই। কী মুশকিল। বাবর তাকিয়ে দেখল, জাহেদাকেও এখন আর দেখা যাচ্ছে না। কী করবে। সে? দশ টাকার নোটটাই দিয়ে দেবে? না, আরো আটটা মালা নিয়ে পুরো করবে টাকাটা? জাহেদা ভীষণ রাগ করেছে নিশ্চয়। নিজেকে ভেতর থেকে খারাপ লাগছে বাবরের। ছোট্ট একটা মেয়ে হঠাৎ করে খেপে গেলে বাড়িশুদ্ধ মানুষ যেমন আদর করে থামাতে অস্থির হয়ে ওঠে, তেমনি লাগছে তার।

জাহেদার চলে যাওয়া পথের থেকে চোখ ফিরিয়ে বাবর যখন লোকটাকে দশ টাকার নোটটাই দিতে তৈরি, তখন দেখে লোকটা নেই।

আরে, এ আবার গেল কোথায়?

দু একজন মানুষ তখন দাঁড়িয়ে গেছে বাবরের পাশে। তাদের একজন বলল, ভাংতি আনতে গেছে।

নিঃশ্বাস ফেলল বাবর। বড় করে একটা নিঃশ্বাস। কিছু করবার নেই। দাঁড়াতেই যদি হয়, দাঁড়াবে সে। ভাবনা করে লাভ নেই।

জাহেদা হেঁটে ঢাকা ফিরে যাবে না, গাড়িতেই গিয়ে বসবে। এত ভেবে কী হবে? কবে কোনোদিন এত ভেবেছ বাবর?

হাসল বাবর। নিজের দিকেই তাকিয়ে সে হাসল মনে মনে। খেলারাম, খেলে যা। তোর কাজ শুধু খেলে যাওয়া হাঃ।

একটা সিগারেট ধরাল বাবর। ধুলো পায়ের পথ দেখতে লাগল। পাতা ঢাকা। ভিজে ভিজে। যেখানে ছায়া, সেখানে ভারি সুন্দর ঠাণ্ডা। যেন সারা জীবন শুয়ে কাটিয়ে দিতে লোভ হয়। কানে যেন বাঁশির সুর শুনতে পায় বাবর। সেই ছেলেটা খুব ভাল বাঁশি বাজাত।

কোন ছেলেটা?

নামটা মনে নেই। তার বয়সী ছিল। লেখাপড়া করত না। বাপ ছিল বাজারের কুলি। ছেলেটাও ছোটখাট মোট বইতে। আর ফাঁক পেলেই কোমর থেকে বাঁশি বের করে বাজাত। তুতুর-তুয়া-আ-আ–এমনি একটা সুর ছিল। সেই সুরাটাই ঘুরে ফিরে বাজাত। তারপর একদিন সাপে কাটল তাকে।

নাঃ। কবে কোনদিন ভেবেছে বাবর? ভাববে না সে। সব ভাবনার গলা টিপে মেরেছে।

সে বহুকাল আগে। ভাবনা তার শুক্র। এই তো সে বেশ আছে, ভাল আছে।

লোকটা ফিরে এলো খুচরো নিয়ে। টাকা গুনে নিয়ে এগুল বাবর। পেটের কাছে টনটন করে উঠল তার। একটা ঝোপ খুঁজে হালকা হলো। এখান থেকে মন্দিরের চূড়া খানিক

দেখা যাচ্ছে। রোদ পড়েছে সূচাল মাথায়। ময়রার দোকানে থরে থরে সাজান চৌকো সন্দেশের চুড়ার মত।

জাহেদা ঠিকই বলেছিল। মন্দির দেখা, রংপুরে আসা, একটা উপায় মাত্র। সে এসেছে অন্য কিছুর লোভে। সেটা তার পাওয়া হয়ে গেছে। আর কী দরকার? মন্দির থাক মন্দিরের ভিতে। আমি চলি।

বাবর বলল, হ্যাঁ চলি।

আবার সেই সাঁকো পেরিয়ে বাবর এলো গাড়ির কাছে। গাড়ির গায়ে মিহি ধুলোর পর্দা পড়েছে। কিন্তু জাহেদা নেই। গেল কোথায়?

চারদিকে চোখ চালিয়েও জাহেদাকে কোথাও দেখা গেল না। তখন একটু উদ্বেগ হলো। আরে, এ যে দেখছি সত্যি সত্যিই রাগ করেছে। বাবর জিগ্যেস করল, পাশেই চায়ের দোকানে। তারা বলল, পথ দিয়ে হেঁটে গেছে। কোনদিকে? পাকা সড়কের দিকে। মেয়েটা পাগল নাকি? হেঁটেই রওয়ানা দিল ঢাকায়?

বাবরের মনে হঠাৎ একরাশ স্নেহ ঝাঁপিয়ে পড়ল। না, সত্যি ছেলেমানুষ। এক মুহূর্তের জন্যে জাহেদাকে মনে হলো তারা যেন ছোট্ট একটা মেয়ে। গাড়িতে বসে মোটর স্টার্ট দিল বাবর। এখানো পাশে জাহেদার ক্ষীণ সুবাস টের পাওয়া যাচ্ছে। সুন্দর সুগন্ধ। সকালে জেগে উঠে। মনে করতে না পারা স্বপ্নের মত।

খানিক দূরে যেতেই চোখে পড়ল জাহেদাকে। একটা কালভার্টের ওপর বসে আছে উল্টো দিক মুখ করে। তার পূর্ণ টানটান পিঠ দেখা যাচ্ছে কেবল। আর মাথায় একরাশ চুল। গাড়ি থামাল তার পাশে বাবর। মেয়েটা তবু মুখ তুলে তাকাল না। বাবর হর্ণ দিল। তন্ময়তা ভাঙ্গল না। তখন নেমে এলো সে গাড়ি থেকে। সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল, জাহেদা।

উত্তর নেই।

রাগ করেছ?

উত্তর নেই।

তখন বাবর বসল। তার পাশে। আরেকটা সিগারেট ধরাল। টানতে লাগল নিঃশব্দে। না, সেও কথা বলবে না। তার কেমন যেন মজাই লাগছে। এই ছোট্ট খেলাটুকু করতে।

সিগারেট শেষ হলে বাবর খুব কায়দা করে ছুঁড়ে দিল টুকরোটা। অনেক দূরে গিয়ে পড়ল। ধোঁয়া উঠতে লাগল পাকিয়ে পাকিয়ে। অল্প বয়সী ছেলে একটা যাচ্ছিল, সে হঠাৎ দেখতে পেল তা। যেন পথ চলতে সোনা পেয়ে গেছে, খুশিতে সে তুলে নিল সিগারেটের টুকরোটা। তারপর কষে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

হাসল বাবর।

হাসছেন!

না, তোমাকে নয়। ঐ ছেলেটাকে দেখে।

আপনি আমাকে কী মনে করেন?

বলে এমন করে জাহেদা বাবরের দিকে তাকাল বাবর একটা হালকা উত্তর দিতে যাচ্ছিল; থমকে গেল। একেবারে নতুন লাগছে জাহেদাকে। নতুন চেহারা। অর্থটা যেন ভাল বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু মনের মধ্যে টের পাওয়া যাচ্ছে। ভালবাসা? জাহেদা কি তাকে ভালবেসে ফেলেছে? একটা মানুষের ওপর জীবনের দায় দিলেই এমন দৃষ্টি ফুটে উঠে দু চোখে।

না না। ভালবাসা নয়। আমি কাউকে ভালবাসি না; কাউকে না। ভালবাসা বিশ্বাস করি না। এ হতে পারে না। এ আমি চাই না।

বাবর মাথা দোলাতে লাগল।

অসম্ভব; হতে পারে না।

মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে পড়ে তার।

জাহেদা ফিরে তাকায়। জিগ্যেস করে, কী হতে পারে না?

কিছু নয়। আসলে কী জান, আমার একটা বস্তুর অভাব বড় বেশি! শুনবে?

জাহেদা তাকিয়ে থাকে।

বাবর বলে, ধৈর্যের অভাব। বাবর মনে মনে বলে, না, আমাকে ফেরাতেই হবে। ভালবাসার সেই হাওয়া যদি বইতে থাকে, যদি সে বইতে দেয়, তাহলে তা ঝড় হয়ে দাঁড়াবে। কিছুতেই সে তা হতে দিতে পারে না। তাকে ফেরাতেই হবে।

বাবর ওর হাত ধরল। বলল, চল গাড়িতে যাই।

প্রায় টানতে টানতে গড়িতে এনে বসাল তাকে।

সমস্ত কিছু ভেঙ্গে দেবার আক্রোশ ফুসতে থাকে। বাবরের মনের মধ্যে। গাড়ি চালাতে চালাতে সে কথা খুঁজতে থাকে। এমন কথা, যা গুড়িয়ে দেবে ঐ হৃদয় দিয়ে হৃদয় অনুভব করবার মিথ্যে সাঁকোটা।

বাবর হঠাৎ টের পায়, জাহেদা তার উরুতে একটা হাত রেখেছে। সে হাত আমন্ত্রণের নয়, আশ্রয় সন্ধানের।

আরো শঙ্কিত হয়ে ওঠে বাবর। জাহেদা তাকে ভালবেসে ফেলেছে।

তাই তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে মন্দির দেখা। এখন তার পৃথিবী কেন্দ্রীভূত হয়ে এসেছে বাবরকে ঘিরে। এ কী হলো? এ রকমটা তো সে চায়নি।

মেয়েটা কি আশা করেছে, এখন সে একটা প্রেমের গান গুন গুন করবে, না, রবি ঠাকুরের একটা কবিতা আবৃত্তি করবে, যেমন সব মেয়ে স্বপ্ন দেখে উপন্যাস আর সিনেমার কল্যাণে।

বাবর হঠাৎ বলে, শুনবে একটা কবিতা?

মনে মনে আবছা একটা নিষ্ঠুরতা অনুভব করে বাবর।

শুনবে?

জাহেদা মুখে কোনো উত্তর দেয় না। কিন্তু বোঝা যায়, শুনতে কোনো আপত্তি নেই তার। মনে মনে হাসে বাবর। ঠিকই সে ধরতে পেরেছে। জাহেদা প্রেমে পড়েছে তার। হাঃ।

বাবর বলে, রবি ঠাকুরের শেষের কবিতায়— মনে আছে শেষের কবিতার কথা কাল না। পরশু তোমায় বলছিলাম?

হ্যাঁ।

সেই শেষের কবিতা যে কী করে গেল, কবিতা শোনান হয়ে দাঁড়াল একটা আচার।

আচার?

আরে না, না, আমের, তেঁতুলের আচার নয়। তোমার বাংলা পড়া থাকলে জানতে এ আচার মানে তোমরা যাকে ইংরেজিতে বল রিচুয়াল।

ও।

আচ্ছা, একটা ইংরেজি কবিতাই শোনাই। ইংরেজি মানে ইটালিয়ান ভাষায় লেখা। সিজার পাভিসের। পড়েছি ইংরেজি অনুবাদ। ইংরেজিটা ভাল মনে নেই। বাংলা করে বলি।

খানিক চুপ করে থেকে মনে করে নেয় বাবর। গাড়ির কাচ তুলে দেয় একটু। বাতাস এত জোরে কাটছে যে কথা হারিয়ে যেতে চায়। বলে শোন, সিজার পাভিসের কবিতাটা এ রকম–

সমস্ত কিছুতে হতাশ ঐ বুড়ো লোকটা
তার ঘরের চৌকাঠে বসে

দেখে চনমনে রোদে
মদ্দা আর মাদি একজোড়া কুত্তা–
তারা রক্তের নিয়মে খেলছে।

চোখ কালো করে তাকায় জাহেদা। বলে, কারা খেলছে?

মদ্দা আর মাদি একজোড়া কুত্তা। কুকুর। ডগস। রাগ কোরো না। ভাল কবিতা। আগে শোনাই তো।

মদ্দা আর মাদি একজোড়া কুত্তা–
তারা রক্তের নিয়মে খেলছে।
ভন ভন করে মাছি বুড়োটার ফোকলা মুখে;
বৌটা মারা গেছে বেশ কিছুদিন।
সে, আর দশটা কুক্তির মত,
জানতে চায়নি কিছু,
কিন্তু ছিল তার রক্তের নিয়ম।
বুড়োটা, তখনো তার দাঁতগুলো যায়নি,
এ ব্যাপারে পরম রসিক; রাত এলে বিছানায় যেত তাকে নিয়ে।
রক্তের নিয়ম, বড় সুন্দর।

জাহেদা বলে, থাক, শুনতে চাই না।

শোন, ভাল কবিতা। সিজার পাভিসের নাম শোননি?

কোনো দরকার নেই।

বাবর সে কথার জবাব না দিয়ে মনে মনে অনুবাদ করে মুখে আবার আবৃত্তি করতে থাকে–

কুত্তার জীবনে এই একটা চমৎকার দিক–
অফুরন্ত স্বাধীনতা।
সকাল থেকে সন্ধে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান :
কখনো একটু আহার :
কখনো একটু ঘুম :
কখনো একটা মাদি কুত্তার সওয়ার হলুম–
রাত না দিন, বিয়েই গেল!
শুঁকে দেখার স্বাভাবিকতায় সে চলে;
যা নাকে লাগে তাইই তার হয়ে যায়!

চুপ করুন। জাহেদা চেঁচিয়ে ওঠে না, মিনতি করে।

নিষ্ঠুরতা যেন আরো প্রবল হয়ে ওঠে বাবরের মনের মধ্যে। স্নেহ, দয়া, ভালবাসা। হাঃ! এ কীসের মধ্যে জড়িয়ে ফেলতে চায় তাকে জাহেদা? জানে না, বাবরের জানা আছে কী করে বেরিয়ে আসতে হয়! বেরিয়ে সে আসবেই। ভালবাসার জন্যে জাহেদাকে সে আনেনি। বাবর বাঁচে এক মুহূর্ত থেকে পরের মূহুর্তে। ছেলেবেলায় টেলিগ্রাফের এক খুঁটি থেকে আরেক খুঁটিতে ছুটে যাবার মত। সেই ভাবনাহীন খেলার মত।

বাবর বলল, এখনো কবিতাটা শেষ হয়নি জাহেদা। বাকিটা শোন।

না।

শোন।

না, না।

বেশ, তবে আমি নিজেকেই শোনাচ্ছি। তোমার ইচ্ছে না হয়, তুমি শুন না। তুলো থাকলে কানে দাও।

আমার কাছে তুলো থাকবে কেন?

মেয়েদের ব্যাগে তুলো থাকেই।

ভারি তো জানেন!

হ্যাঁ, মাসে মাসে তোমাদের দরকার হয় যে।

বাবর নিষ্ঠুর গলায় বলে। সব কিছু গুড়িয়ে দিতে চায় সে। তুচ্ছ করতে চায়। মেয়ে নয় তো, একটা চেন বাধা পশুকে যেন খোঁচাচ্ছে সে।

বাবর আবৃত্তি করে–

বুড়োটা ভাবে
একবার সেও ঐ কুত্তার মত
গমক্ষেতে করেছিল দিনের বেলায়।
এখন মনেও নেই কোন কুত্তির সাথে
কিন্তু মনে আছে
চড়া রোদ
দরদর ঘাম
আর অনন্ত অনন্ত পর্যন্ত করে যাবার ইচ্ছেটা।
অবিকল বিছানায় যেমন।
তাকে আবার অতীত ফিরিয়ে দিলে
সে করবে একমাত্র গমক্ষেতে, দিনের বেলায়।

পথ চলতে চলতে
এক মেয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে গেল দেখতে।
মুখ ঘুরিয়ে গেলেন এক পাদ্রী!
রাস্তায় যা খুশি হয়!
এমনকি এক মহিলা–
পুরুষ দেখে চোখ নামান যিনি——
তিনিও দাঁড়িয়ে গেছেন দেখতে।
কিন্তু বালক,
ধৈর্যের অভাববশত
সে ছুঁড়তে লাগল ঢ়িল।
বুড়োটা ক্ষেপে গেল।

আবৃত্তি শেষে হা হা করে হেসে উঠল বাবর। আবার বলল, বুড়োটা ক্ষেপে গেল। কেন ক্ষেপে গেল জান জাহেদা? কারণ, সে বুড়ো হয়েছে, তার নিজের এখন সাধ থাকলেও সাধ্য নেই।

জাহেদা একবার দুহাতে মুখ ঢাকবার চেষ্টা করল নিজের। দুঃখে! কবিতার শৈলী সে জানতে চায় না, বুঝতে চায় না। তার ভীষণ কষ্ট হয়, বাবর কেন বেছে বেছে এই কবিতা শোনাল তাকে।

বাবর বলল, রাস্তায় ঘটনা। কী হচ্ছিল জান? ঐ যে কবিতায়, যা দেখে লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে, এমনকি পাদ্রীটাও! একটা কুত্তা আর একটা—

চুপ করুন।

বাবর একটু থেমে ঘোষণা করল, সিজার পাভিস ওয়াজ এ গ্রেট পোয়েট। আমি কবি হলে ওর সব কবিতা অনুবাদ করে বই বের করতাম।

সাঁ করে গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড় করাল বাবর।

এখানটা নির্জন। দুপাশে আখের খেত। রোদে আকাশ পুড়ে যাচ্ছে। বিশ্বের স্তব্ধতা এখানে উপুড় হয়ে আছে।

গাড়ি থামতে দেখে জাহেদা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কী বলবার জন্য রক্তিম ঠোঁট তার কেঁপে উঠল একবার।

হাঃ।

বাবর তাকে হঠাৎ দুহাতে জড়িয়ে ধরে, শক্ত করে বেঁধে, গ্রাস করে নিল জাহেদার ঠোঁট। আর জাহেদা তাকে দুহাতে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল পাগলের মত।

চিৎকার করতে চাইল। কিন্তু পারল না। তখন চোখ বেয়ে উষ্ণ অশ্রু হঠাৎ অবিরল ধারায় পড়তে লাগল তার।

ঠোঁট দিয়ে সে অশ্রুর স্বাদ নিতে নিতে বলল, চল ডাকবাংলোয় যাই। আমি আরেক বার তোমাকে ভালবাসতে চাই। ইংরেজিতে কথাটার যে আরেক মানে আছে, তাই, তাই আমি চাই।

২২. শুধু ভালবাসব

ঘরে ঢুকেই জাহেদাকে কোলে তুলে নিল বাবর। তারপর সোজা বিছানায় নিয়ে ফেলে দিল তাকে। ধপ করে পড়ল সে গরমকালের পাকা ফলের মত। ব্যথা করে উঠল পিঠে। কিন্তু বাবরের চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন শক্তিশূন্য মনে হলো তার নিজেকে। মনে হলো কোনোদিন এই লোকটাকে সে দেখেনি।

বাবর যেন রাসায়নিক একটা পরীক্ষা করতে চলেছে বকযন্ত্র নিয়ে; কিংবা ডাক্তার সে, এক্ষুণি করবে কারো দেহে অস্ত্রোপচার; অথবা ডাকাত, তোরঙ্গ খুলে লুণ্ঠিত সম্পদ দেখবে।

বাবর শার্টের হাত বোতাম খুলল। গোটাল যেমন খেলোয়াড় মাঠে নামবার আগে গোটায়। সামনের কয়েকটা বোতাম তারপর। পাশে বসল জাহেদার। বসে, জাহেদাকে ঘুরিয়ে উপুড় করে দিল সে।

তীব্র প্রতিবাদ ঠেলে বেরুতে চাইছে জাহেদার ভেতর থেকে। কিন্তু অবাক হয়ে গেল সি নিজেই, একটা কথা বেরুল না। বরং যেন, নিজেকে প্রস্তুত করছে সে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আপন মৃত্যুর জন্যে, ঠিক যেমন হরিণ শিশুর সম্মোহন হয়। অজগরের ধ্বক ধ্বক হাসিহাসি চোখের সামনে।

জাহেদাকে উপুড় করে তার পিঠের বোতামগুলো খুলে ফেলল বাবর। অবিকল সপ্তর্ষির মত কয়েকটা তিল তার পিঠে। বাবর সেই তিলগুলোয় হাত বুলিয়ে দিল একবার। তারপর কাঁধ ধরে তাকে তুলে বসিয়ে জামা খুলে জামাটা ফেলে দিল মেঝোয়। জাহেদা দুহাতে বুক ঢেকে মুখ নিচু করে বসে রইল। বাবর উঠে দাঁড়িয়ে নিজের জামা খুলে ছুঁড়ে মারাল মেঝের পরে। নিজের জামা ঢেকে দিল জাহেদার জামা। তারপর বাবর জাহেদার দুপা ধরে ওপরে তুলে ফেলল এক ঝটাকায়। আর তার টাল সামলাতে না পেরে জাহেদা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। পড়েই সে উপুড় হয়ে গেল বুক ঢাকতে। লোকে যেমন করে মুরগির পা ঝুলিয়ে চামড়া খসিয়ে নেয়, তেমনি করে বাবর একটানে খুলে ফেলল তার পাজামা। পা ছেড়ে দিয়ে এবার পিঠে ছোট জামার হুকে হাত দিল বাবর। হুক খুলে আনবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তাকে সোজা করে দুহাত একে একে ফিতে থেকে মুক্ত করে বাবর নিজের ট্রাউজার খুলল। বেরিয়ে পড়ল নীল অন্তর্বাস। এক বন্ধু বিলেত থেকে এনে দিয়েছিল। হঠাৎ তার কথা মনে পড়ল একবার। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। অন্তর্বাসটা ছুঁড়ে ফেলল সে নিজের বিছানায়।

জাহেদা।

উত্তর দিল না জাহেদা।

জাহেদা বালিশে মুখ ডুবিয়ে উপুড় হয়েই রইল।

জাহেদা।

এবার বাবর তাকে ঘুরিয়ে সোজা করে দিল। কাঁচির মত দুপা করে শুয়ে রইল জাহেদা। একটা হাত চোখের পরে রাখা–কনুয়ের ত্রিভুজ ঠিক ভুরুর মাঝখানে।

আমাকে দ্যাখ জাহেদা।

অপেক্ষা করল বাবর।

আমাকে দ্যাখ।

আরো অপেক্ষা করল সে।

দ্যাখ আমাকে।

বাবর আর অপেক্ষা করল না।

দুহাতে সরিয়ে দিল জাহেদার চোখ থেকে হাতের শাদা ত্রিভুজ।

জাহেদা চোখ বুজল।

তখন তার বুকে হাত রাখল বাবর।

তোমার শরীরে পদ্মকাঁটা দিয়েছে।

বাবর একবার বুক থেকে বাম ঊরু পর্যন্ত হাত বুলিয়ে আনল জাহেদার। আবছা লাল একটা দাগ পড়ে গেল। সেখানে। বাবর তাকিয়ে রইল, কখন মিলিয়ে যায় দাগটা।

মিলিয়ে গেল। তখন বাবর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল নিচে জাহেদার শরীর নিয়ে।

বলল, পাথর হয়ে থেক না।

জাহেদার কানে শুধু বাথরুম থেকে অবিরাম ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়বার শব্দ। বাবরের কথা শুনতে পেল না সে, কিন্তু শরীর যেন শিথিল হয়ে এলো হঠাৎ। বাবর বলল, লক্ষ্মী মেয়ে।

তারপর ভেতরে যেতে যেতে সে আবার বলল, আজ সারা বিকেল সারা রাত আমরা কোথাও যাব না শুধু ভালবাসব।

এবার একেবারে ভেতরে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাবর শুধু বলল, কাল ঢাকা যাব। কাল ভোরে।

২৩. সারাপথ

সারাপথ প্রায় একটা কথাও হয়নি। দুজনের। পীচের পরে মোটরের চাকার শব্দ, বাতাসের শব্দ ফেরিতে জলের ছলছল আর বাজারে মানুষের কোলাহল।

কিন্তু সে স্তব্ধতাও ছিল যেন ভারশূন্য। গাড়ি যতই ঢাকার কাছে আসছে ততই যেন গুরুভার হয়ে উঠছে এই স্তব্ধতা।

নয়ার হাট ফেরি পার হল ওরা।

বাবর বলল, আর ফেরি নেই। এই ছিল শেষ। এবার সোজা ঢাকা।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, সোয়া পাঁচটা বাজে। শীতের ছোট্ট দিন। এরি মধ্যে মলিন হয়ে আসছে বেলা। খেতের পরে এখানে সেখানে ধোয়া আর কুয়াশা দেখা যাচ্ছে। দূরের গাছপালা এরি মধ্যে অস্পষ্ট গম্ভীর।

সত্যি কাল সারা বিকেল সারা সন্ধে বাবর ডাকবাংলো ছেড়ে বেরোয়নি। এমনকি ঘর ছেড়ে পর্যন্ত নয়। চৌকিদার খাবার এসে দিয়েছে। প্রণব বাবু এসেছিলেন একবার। তাকে প্রায় ধুলোপায়েই বিদায় করে দিয়েছে বাবর।

এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম গল্প করে যাই।

জাহেদার শরীরটা ভাল নেই।

বাবর মিছে কথা বলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রণব বাবু বলে উঠেছিলেন, ও তাই বুঝি। সুষমাকে পাঠিয়ে দিই।

না, না, তার দরকার হবে না।

বলেন কী মশাই। আমাদের দেশে এসে অসুখ হবে, সেবাযত্ন পাবে না! ওকী কথা!

অনেক ধন্যবাদ। আপনি কিছু ভাববেন না। কাল দুপুরে আসবেন, মেলা গল্প করা যাবে।

বাবর ভাল করেই জানত, কাল দুপুরে সে থাকবে ঢাকার পথে। বগুড়ার কাছে এসে আজ একবার প্রণব বাবুর কথা মনে হয়েছিল তার। কিন্তু তার চেয়ে বেশি মনে পড়ছিল সুষমার ছায়া-ছায়া মুখখানা।

এরি মধ্যে জাহেদা থেকে অনেক দূরে চলে গেছে বাবর। নতুন কোথাও যাবার জন্যে মনের মধ্যে পাখা ঝাপটাচ্ছে। সুষমার মত কারো জন্যে। সুষমাকে বেশ লেগেছে তার। সুষমার কথা বলতে গেলে সারাদিনই থেকে থেকে মনে পড়েছে তার। শিস দিচ্ছিল প্রায়া সারাটা পথে বাবর।

জাহেদাকে এখন হোস্টেলে ফিরিয়ে দিলে বাঁচে সে।

জাহেদা যে সারা পথ চুপ করে আছে, এটা যেন ভাগ্যের কথা। কথা পর্যন্ত বলতে ইচ্ছে করছে না। আর বাবরের। নিজেকে মনে হচ্ছিল তার ঐ লরী ড্রাইভারদের মত বড় বড় ট্রাকে করে মাল নিয়ে জেলা থেকে জেলা যাচ্ছে খালাস করতে। ফেরিতে বসে পান খাচ্ছে, সস্তা সিগ্রেট টানছে। রোদে পুড়ছে ত্রেপল ঢাকা বস্তার সার, বাক্সের স্তূপ। কোনো আবেগ নেই, ভবিষ্যতের দায় নেই। নিয়ে চল, ফেলে দাও। হাঃ।

কিন্তু এই যে এতক্ষণ সত্যি সত্যি চুপ করে আছে জাহেদা, এটা এখন ধীরে ধীরে অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ভাবছে কী মেয়েটা?

বাবর একবার আড়াচোখে তাকাল জাহেদার দিকে। না, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। যে মেয়েকে সে নিয়ে এসেছিল। সে যেন অন্য কেউ।

সত্যি সত্যি তাকে ভালবেসে ফেলেছে নাকি? ভাবছে নাকি বিয়ের কথা! অত বড় বড় বক্তৃতা দিলাম যাবার পথে, সব পানিতে গেল!

শেষে আর থাকতে পারল না বাবর। নীরবতা ভেঙ্গে বলল, কি, একেবারে চুপ করে আছ যে!

জাহেদা চমকে তাকাল তার দিকে। এতক্ষণ পর শব্দগুলো যেন হাততালি দিয়ে পায়রা উড়িয়ে দিল হঠাৎ।

বাবর আবার বলল, পথে এত সাধাসাধি করলাম কিছু খেলে না পর্যন্ত। কী হয়েছে?

জাহেদা তবু কিছু বলল না।

বেশ, নাই বললে কথা।

বাবর ঘাড় কাত করে গাড়ি চালাতে লাগল। শিস দেবার চেষ্টা করল একবার, কিন্তু হলো না। ভালই লাগল না।

জাহেদা পরেছে। কালো রংয়ের পাজামা, আর শাদা জামা। বোধহয় তারি জন্যে মুখ দেখাচ্ছে কেমন পাণ্ডুর। একবার একটু মায়া করে উঠল বাবরের মনটা। পরক্ষণেই ঝেড়ে ফেলে দিল সে। ঢাকায় গিয়ে বাবলিকে আবার দেখতে হবে। বাবলি রাগ করলেও, রাগ তো আর হিমালয় নয় যে আছেও, থাকবেও।

হঠাৎ জাহেদা তাকে ডাকল, শুনুন।

আমাকে বলছ।

হ্যাঁ।

কী বল। কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?

কেন, ঢাকায়। এই তো এসে গেলাম। আর এক ঘণ্টা। তার পরই তুমি পৌঁছে যাবে তোমার হোস্টেলে। গেট খোলা পাবে তো? কটায় যেন বন্ধ হয়;

না।

কী, না?

হোস্টেলে যাব না।

হেসে উঠল বাবর। বলল, তার মানে?

জাহেদা কোনো জবাব দিল না সে প্রশ্নের।

বাবর আবার জিগ্যেস করল, তাহলে যাবে কোথায়? কোনো বান্ধবীর বাড়িতে? ঠিকানা বল তবে?

না।

কী, না? ঠিকানা বলবে না? না, বান্ধবীর বাড়িতে যাবে না?

কারো বাড়িতে যাব না। দুষ্টুমি করছ?

না।

সত্যি বলছ?

হ্যাঁ।

তাহলে কোথায় যাবে শুনি?

আপনার বাসায়।

আমার বাসায়?

হ্যাঁ, আপনার বাসায়।

ছেলেমানুষ!

কেন?

আমার বাসায় কী করে যাবে?

যে করে আপনার সঙ্গে রংপুর গেলাম।

বলে জাহেদা সরাসরি তাকাল বাবরের দিকে। সে চোখের দৃষ্টি একরোখা নয়, কম্পিত— যেন দৃষ্টি জোড়া পেছনে পালিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। এমন পরিস্থিতিতে আগে কখনো পড়েনি বাবর। কিন্তু কোনোদিন কোনো কিছুই বাবরকে অপ্রস্তুত করতে পারেনি। বাবর কথা খোঁজার সময় নিতে হেসে উঠল। হাসির অবসরে ভাবতে লাগল, কী বলে।

বলল, রংপুরে গিয়েছিলে গাড়ি করে। গাড়ি করে আমার বাড়িতে অবশ্যই ফেরা যায়। কিন্তু ফিরতে পারা আর ফিরে যাওয়া কি এক কথা?

আমি কিছু বুঝি না।

জাহেদা জেদি মেয়ের মত মাথা নাড়তে লাগল ক্রমাগতঃ।

আমি কিছু বুঝি না।

তুমি ছেলেমানুষ।

আমাকে নিতে চান না। আপনার বাড়িতে?

নেব না কেন, যখন খুশি আসতে পার। কিন্তু এখন তুমি যাবে হোস্টেলে।

না।

আমি তোমাকে হোস্টেলে নিয়ে যাচ্ছি।

না।

হ্যাঁ।

না।

সন্ধে হবে এক্ষুণি। ঘরে যাবে, লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘুমিয়ে পড়বে। আর যদি চাইনিজ খেতে চাও, পথে থামতে পারি।

না।

বাববার না বলছ কেন?

আপনি আমাকে ফেলে যাচ্ছেন।

বলেই জাহেদ আর নিজেকে সামলাতে পারল না। মাথা নামিয়ে নিল। ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। তার সারা দেহ। কান্নার শব্দ প্রবল হয়ে উঠল।

গাড়ি চালিয়ে চলল বাবর। সাভারের বাজার পেরিয়ে গেল এক্ষুণি। সট সট করে সরে গেল দোকানের ন্যাংটো বিজলি বাতিগুলো।

জাহেদার কান্না থামল না।

তখন ভীষণ রাগ হলো বাবরের। সে একটা সিগারেট ধরাল। শব্দ করে ফোঁস ফোঁস করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল সে। ইচ্ছে করতে লাগল এখুনি কোথাও নামিয়ে দেয়।

না, কিছুতেই সে প্রশ্রয় দেবে না। তার কেউ নেই। কেউ হবেও না কোনোদিন। মানুষের যত জ্বালা এই মানুষে মানুষে অন্ধ বন্ধন থেকে।

হাঃ। খেলারাম।

চোখে স্পষ্ট দেখতে পায় দেয়ালে সেই অপটু হাতে বড় বড় করে লেখা–খেলারাম খেলে যা।

এই তার দর্শন, এই তার সত্য।

হঠাৎ যেন দম আটকে মরে যাচ্ছে এমনি শব্দ করে উঠল জাহেদা। যাক, মরে যাক।

না, আর পারা যাচ্ছে না। কান্না তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। বাবর সাঁ করে গাড়ি পাশে নিয়ে থামাল।

একদিকে স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ মাঠ। আরেক দিক কাঁঠাল বন। কোথাও কেউ নেই। যেন এ গ্রাম ছেড়ে সমস্ত লোক কোথায় কবে চলে গেছে। এমনি যেন কবে, কোন অতীতে একবার দেখছিল বাবর–এমনি স্তব্ধতার মাঠ বন ভেঙ্গে সে হেঁটে যাচ্ছিল একদিন।

বাবর সিগারেট পিষে ফেলে জিগ্যেস করল, এখন বল, কাঁদছ কেন?

জাহেদা মাথা নাড়ল। সেটা তার কথার উত্তরে নয়, কান্নার অভিঘাতে।

বেশ, তবে কাঁদ। যখন থামবে, তখন বল, পৌঁছে দেব।

আপনাকে দিতে হবে না পৌঁছে।

জাহেদা দাঁড়াম করে গাড়ির দরোজা খুলে বেরুল।

আরে, দেখ, দেখ, পেছনে গাড়ি আসছে কিনা।

কিন্তু ততক্ষণে জাহেদা রাস্তা পেরিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে। বাবরের একবার ইচ্ছে হলো, ফেলেই চলে যায়। জানে সেটা এক অসম্ভব অবাস্তব ভাবনা; কিন্তু মনের মধ্যে তাই নিয়েই খানিক নাড়াচাড়া করল সে।

তারপর সেও বেরুল।যতটা জাহেদাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে, তারচেয়ে বেশি। শরীর হালকা করতে। তার পর রাস্তা পেরিয়ে কাঁঠাল বনে নেবে একটা গাছ পছন্দ করে প্রশ্রাব করল। তারপর যখন শেষ হলো তখন চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে জাহেদা দূরে একটা গাছের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাবর কাছে গিয়ে বলল, মেয়েদের এই সিনেমার ভঙ্গিগুলো আমি একেবারেই পছন্দ করি না।

কী বললেন?

জাহেদা ফিরে তাকাল তার দিকে। না, সে চোখে অশ্রু নেই। কখন সে মুছে ফেলেছে, কিংবা শুকিয়ে গেছে। পড়তি বেলায় ম্লান আলোয় লাল অঙ্গারের মত দেখাচ্ছে সে মুখ। সত্যি কথা শুনবে? বাবর তাকে বলল।

বলুন।

তুমি যা করছি তা ছেলেমানুষেও করে না।

বারবার আমাকে ছেলেমানুষ বলার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে?

বাবরের মনে হলো গালে একটা চড় বসিয়ে দেয় মেয়েটার। কিন্তু তার বদলে সে হেসে ফেলল, অধিকার দেবার প্রশ্ন নয়। প্রমাণ করছ তুমি। নইলে বলতে না যে তোমাকে ফেলে যাচ্ছি। নইলে, এভাবে গাড়ি থেকে নামতে না এখানে।

মনে করেছেন, আমি খুব বিপদে পড়েছি?

না।

ভেবেছেন, আপনি আমাকে কিনে ফেলেছেন?

তাও না।

আমাকে যা খুশি তাই করতে পারেন ভেবেছেন?

তেমন কিছু ইঙ্গিত দিয়েছি কি?

কী হইছে ভাইসাব?

পেছনে হঠাৎ মানুষের গলা শুনে ফিরে তাকায় বাবর। দ্যাখে তিনটে লোক। হাতে লম্বা ছুরি, আর একরাশ কাঁঠাল পাতা। বোধহয় ছাগলের জন্যে কেটে নিয়ে যাচ্ছে।

মাঝখানের যুবক আবার প্রশ্ন করে, হইছে কী ভাইসাব কন না?

কী চাও তোমরা? বাবর জিগ্যেস করে।

কিছু না। একগাল হেসে বাঁ পাশের যুবক বলে, সোর শুইনা মনে করলাম কাইজা লাগছে। তাই জানিবার আইলাম।

কিছু নয়, যাও তোমরা।

তখন ডান পাশের যুবক বলল, আরে, পিকনিকে গেছিল বোধ করি পিরীতের মানুষ লইয়া, ফেরনের পথে আকাম করতে চায়।

মাইয়াডাও না।

বাবর হঠাৎ টের পায় সন্ধে হয়ে গেছে। দূরের কিছু ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। কোথা থেকে আজান ভেসে আসছে। আর সরসর করে বাতাস বইছে কাঁঠাল গাছের পাতায় পাতায়।

বাবর বলল জাহেদাকে, কি যাবে না। এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে?

নারে মাইয়া যাইবার চায় না।

মাঝের যুবককে ঠেলা দিয়ে মন্তব্যটা করল বাঁ পাশের যুবক। তখন সে বলল, হ লাগে যেমুন তাই।

ডান পাশের যুবক বলল, চল যাইগা। শহুরা মানইষের তামশা দেখন লাগবো না।

বাবর বলল জাহেদাকে, চল।

বলে হাত বাড়িয়ে দিল জাহেদার দিকে। হঠাৎ সে হাত ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল বাঁ পাশের যুবক।

কই লইয়া যান। দরকার হয়, ছেড়িরে আমরা পৌঁছাইয়া দিমু।

কিছু বোঝার আগেই বাবরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। বাধা দেবার আগেই গায়ে এসে পুড়ে মারের পর মার। আর অন্যজন চেপে ধরে জাহেদার মুখ। আরেকজন ফিসফিস করে বলে ওঠে, এই শালারে তুই ধইরা রাখা। আমরা কাম সাইরা লই।

বাবরকে যে মার দিচ্ছিল, ততক্ষণে বাবরের ওপর চড়ে বসেছে। সে এবার বলে, আর আমি, আমারে ভাগ দিবি না?

আমরা আগে লই, তারপর তুই লইস।

জাহেদাকে ওরা নিয়ে যায় কোলের মধ্যে ছাগলের বাচ্চার মত। সমস্ত ঘটনা ঘটে মাত্র আধ মিনিটে। কিংবা তারো কম সময়ে। চোখের একটা মাত্র পলকে। এর জন্যে তৈরি ছিল না বাবর। কিন্তু আশর্চয, তার কোনো দুঃখ হচ্ছে না, রাগ হচ্ছে না, বরং মনে হচ্ছে, এই-ই দরকার ছিল। মনে হচ্ছে, জাহেদার হাত থেকে সে এবার অতি সহজে বাচতে পারবে। তার হাসি পেল ভেবে যে লোকটা অহেতুক তাকে এত শক্ত করে ধরে রেখেছে। তাকে ছেড়ে দিলেও, সে চেঁচাবে না, পালটা আক্রমণ করবে না।

যুবক আরো দু চারটে ঘা লাগায় বাবরকে। বুকের ওপর ঘোড়ার মত চড়ে আছে। সে হঠাৎ একটু পাছা আলগা করে আবার সর্বশক্তিতে ধাপ করে বসে পড়ে। ঘোৎ করে

আওয়াজ ওঠে। বাবরের; যুবক বলে, শালা, রসের ছেড়ি লইয়া বাইরইছ। একা খাইয়া বাড়ি যাইবা। ভাগ দিয়া যাইবা না সোনার চান।

আবার একটা ঘুষি লাগায় সে বাবরের গলার নিচে। খ্যাক করে থুতু ফেলে বলে, একটা আওয়াজ করবা কি জবাই কইরা ফালামু! ফিলিম স্টার হুসনার লাহান ছেড়ি পাইছি, ছাইরা দিমু না। সাতবার লমু। সামনে পিছনে সাতবার; একেকজন শালার ব্যাটা শালা। টাউনে তোমরা ফুর্তি করো। আর আমরা শালায় ছাগলের পাতা কাইটা মরি।

আবার একটা ঘুষি বসিয়ে দেয় সে বাবরের কণ্ঠার হাড়ে। তারপর ঘাড়ের গামছা দিয়ে মুখ বাঁধতে থাকে। চোখের সামনে যেন অন্ধকার হয়ে আসে সব বাবরের। সে কোথায় আছে, কেন আছে, সমস্ত বোধ হারিয়ে যেতে থাকে তার। একবাব যেন মনে হয়, জন্ম থেকে অনন্তকাল এমনি করে শুয়ে আছে সুদীর্ঘ শীতের মধ্যে অন্ধকার কাঁঠাল বনে এই লোকটাকে বুকে পাথরের মত নিয়ে।

সমস্ত অন্ধকারটাই যেন পাথরের মত চাপ বেঁধে আসে তাব চারপাশে। ক্রমশ এগিয়ে আসে। হৃদপিণ্ডের শব্দ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে আসে। যেন আর কোনো শব্দ নেই পৃথিবীতে, এই কাছে অথচ দূরে, ভেতরে কিন্তু বাইরে, দেখা তবু না দেখা জীবন স্পন্দনের জয়ঢাকা ছাড়া।

হঠাৎ সমস্ত শব্দ আর অন্ধকার ছিঁড়ে আর্তনাদ ফেটে পড়ে জাহেদার।

বা-বা।

বাবরের মনে হলো, স্পষ্ট সে শুনতে পেল কোনো বালিকা তার ছোট্ট জীবনের কার্নিশে দাঁড়িয়ে অতল গহবরে পড়ে যাওয়া থেকে পায়ের নখে সর্বস্ব আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে একবার ডেকে উঠল।

দা-দা।

কোথা থেকে দানবের মত শক্তি এলো বাবরের। এক ধাক্কায় বুকে চেপে বসে লোকটাকে ফেলে দিয়ে সেই আর্ত চিৎকারের দিকে দৌড়ুল সে। চিৎকার করতে করতে দৌড়ল, হাসুন, হা-স-নু-উ।

দা-দা! আ-আ-আ!

হা-সু। ভয় নেই হাসু–উ।

নিচু গাছের ডালে ডালে ছড়ে যেতে লাগল বাবরের মুখ, হাত, কাঁধ। সে তবু দৌড়ুতে লাগল। আর বুক ফাটা ডাক দিয়ে খুঁজতে লাগল মেয়েটাকে।

বোনকে ফেলে আর কোনোদিন বাড়ি যাবে না বাবর।

তার বাড়ি আছে। বাড়িতে সবাই আছে। হ্যাঁ, সব তার আছে। আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

খুঁজে পায় বাবর। একজন জাহেদার মুখ চেপে ধরে আছে, আরেকজন উলংগ হয়ে জাহেদার শরীরের মধ্যে ঢুকতে চাইছে। বাবর লাফিয়ে পড়ে তাদের ওপর। দু কনুয়ে সরিয়ে দেয় দুজনকে। আর জাহেদার হাত ধরে টানতে টানতে বলে, হা-সু, হা-সু, আয়।

কিন্তু ততক্ষণে পালটা আক্রমণ করে তাকে দুজন। আর ছুটে এসে যোগ দেয় তৃতীয় জন। বাবর চিৎকার করে বলতে থাকে, সরে যা, হাসু, পালিয়ে যা, পালা, পালা! হাসু, তোকে আমি বাঁচাব। ভয় নেই হাসু।

হঠাৎ মনে হয়। পিঠের ভেতর গরম আগুনের হালকা বয়ে গেল। বাবরের শরীর একমুহূর্তের জন্য শিথিল হয়ে আসে। অনেকটা মদ এক ঢোকে খেলে যেমন গা ঘুলিয়ে ওঠে ঝাঁকিয়ে ওঠে, তেমনি করে ওঠে শরীর।

জাহেদা বিস্ফারিত চোখে দেখে, বাবরের পিঠে ওরা ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। সে চিৎকার করে পিছিয়ে যায় একবার, তারপর ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বাবরকে। ছুরিটা টেনে বের করে। আর লোক তিনটে দাঁড়িয়ে থাকে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে।

বাবর জাহেদার হাত ধরে টানতে টানতে দৌড়ুতে দৌড়তে বলে, চল হাসু, চল, চল চলে আয়।

জাহেদা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তাকে মাটির ওপর হেঁচড়ে টেনে নিতে নিতে বাবর বলে, হাসনু আয়। হাসু আয়।

কিন্তু শরীরের সমস্ত শক্তি যেন ফুরিয়ে আসছে। জাহেদাকে আর টানতে পারছে না বাবর। সে তখন কোলে তুলে নেয় তাকে। মুখে চুমো দিয়ে টলতে টলতে ছুটতে ছুটতে বলে, ভয় নেই হাসু, আমি এসে গেছি। হাসু, আমি এসে গেছি।

গাড়ির কাছে এসে পৌঁছায় বাবর।

কোনো রকমে গাড়ির দরোজা খুলে জাহেদার অচেতন দেহটা ভেতরে ছুঁড়ে দিয়ে সে এঞ্জিনের চাবিতে হাত রাখে।

দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

চাবি ঘোরায় বাবর।

লাফিয়ে ওঠে এঞ্জিন। গর্জন করে ওঠে। ক্রুদ্ধ এক শ্বাপদের মত। তারপর ছুটে বেরিয়ে যায় সমুখের দিকে।

বাবার স্বপ্নাবিষ্টের মত বলে, হাসু, তোকে আমি ফিরিয়ে এনেছি। আর ভয় নেই। বাড়ি এসে গেছি।

গাড়ির আলোয় সামনে অন্ধকারে তীব্র চলমান দুটি শুভ্র স্রোতের মধ্যে কখন তার নিজের বাড়ি ঘূর্ণিপাকে নৌকার মত ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে আসবে তারই অধীর অপেক্ষায় গতি আরো বাড়িয়ে দেয় বাবর।

কর্ণ নদীর পুলের ওপর উঠতে মনে হয় আকাশের ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলোর উদ্দেশে সে ধাবিত।

হঠাৎ তার গাড়ি পুলের শেষ থামে ধাক্কা খেয়ে ডান দিকে ঘুরে যায় একবার। তারপর সেই নক্ষত্র প্রতিফলিত নদীতে গড়িয়ে পড়ে জাহেদাকে নিয়ে, বাবরকে নিয়ে। আরো একজন ছিল, সে হাসনু।